চা মাটি মানুষ

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

প্রকাশক। প্রবোধ অধিকারী, কথামালা প্রকাশনী
১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

মুদ্রক। প্রফুল্লকুমার রায়, অগ্রণী প্রেস
১৫৩।৫ অপার সারকুলার রোড, কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ। সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদমুদ্রণ। রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট,
কলকাতা ৬

দাম : ৪·০০

'চা মাটি মানুষ' উপন্যাসটিকে আমি দুই পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে—পটভূমি, ধারাবাহিক ঘটনার মিছিলে চা বাগানের শ্রমিকদের সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কার, উৎসব আনন্দ, জীবনের তিক্ততাবোধ, পাপবোধ, সাহেব ও বাবুদের কথা স্থান পেয়েছে আর দ্বিতীয় পর্বে থাকবে—জীবনটা কি, মানুষই বা কি, মানুষে মানুষে বিভেদ কোথায়, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ।

এই কাহিনীর মূল চরিত্রটি চোদ্দ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে চা বাগানে আসার দিন থেকে দীর্ঘ পয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি পদে পদে যে বেদনাদায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, মানুষের মুখের মধুর ছলনাকে মনের কথার অনাবিল প্রকাশ মনে করে বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে, ভালবাসতে গিয়ে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু ভালবাসার এবং ভাল করবার নেশা ছাড়তে পারেনি—এ তারই জীবনের কাহিনী।

এই কাহিনীর চরিত্রগুলি বাস্তব পটভূমিকায় একান্ত কাল্পনিক। সাদৃশ্য একান্তই আকস্মিক বলে মনে করতে হবে।

বীরেশ্বর বসু

এই লেখকের :

উন্মেষ, রাস, ঘূর্ণীহাওয়া,
মানসলতা, মায়ের গান

এক

ফাল্গুনের প্রথম। আকাশ নির্মেঘ, সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নীল জলের মত শান্ত। হাড় কাঁপানো শীত নেই। শুধু তার জের আছে অল্প অল্প। ঝিরঝিরে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উত্তরের নীলচে পাহাড়ের চুড়োগুলি বরফে ঢাকা। বিকেলের মরা হলদে রোদ মেখে গাছের পাতাগুলো তির তির করে নড়ছে। এই শান্ত স্নিগ্ধ রোদে গা-ঢেলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ভাওনাথ। কেমন উদাস, অলস, নিরাসক্ত ভাব। গতি মন্থর। কোথায় যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পদক্ষেপ অবাধ কিন্তু এলোপাথাড়ি বাতাসের মত এলোমেলো চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে।

বাড়ির সামনে সুপুরি বাড়ি। তারপর চায়ের চাষ, পরে গভীর অরণ্য আর সব শেষে তুরষা নদী। এই তুরষাই বিশাল বিস্তৃত বনানীকে দু'ভাগে ভাগ করে ছুটে চলেছে কোন অজানা সন্ধানে। বাড়ি থেকে দু'পা এগিয়েই সুপুরিবাড়ির ভেতরকার সরু প্রচ্ছন্ন রাস্তাটা ধরে বাগানের মধ্যে এসে পড়ে সে। সোজা হেঁটে চলে বনের বুকচেরা ছোট্ট অপরিসর ঝরেপরা লতাপাতা মোড়া পথ দিয়ে। স্তিমিত আলোয় দুই পাশের অরণ্যবিস্তার যেন একটা জমাট নিস্তব্ধতার পাহাড়। দু'চারটে পাখির কুজন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। দিনের শেষে পাখিরা বাসায় ফিরছে, ডাকছে যে যার সঙ্গীকে নিজের পাশে। সামনেই নদী। সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ভাওনাথ। মনটাতে তখনো ছেঁড়াকাটা নানা সুর ভাঁজছে। নদীর মধ্যে একটা মস্ত বড় পাথর। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দেয়। সমস্ত দেহট ঠাণ্ডা জলে শিরশির করে ওঠে। পাথরটার ওপরে গিয়ে বসে। মৃদুমন্দ বাতাসে নদীর ধারের ফুল সমেত কাশফুলে গাছগুলো দুলছে। ছায়া পড়েছে নদীর স্বচ্ছ স্ফটিক জলে। মনে হয় জল নিতে আসা কোনো কুলবধূর ফুলপাতা ছাপা শাড়ীর আঁচল উড়ছে যেন। শান্ত নীল জলে বিচিত্র লাল নীল সাদা কালো রঙ-বেরঙের নুড়ি

গড়িয়ে চলেছে। মাছগুলো ছুটে ছুটে এসে ঠোকর মারে তাতে। নিরস পাথর। ব্যর্থতায় মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। মাছগুলো আবার আসে। উপরে অনন্ত আকাশ নেমে এসে সারা বনজঙ্গল আর নদীটিকে চক্রাকারে ঘিরে ফেলেছে। অরণ্যের গাছপালায় পোকা-মাকড় পশুপক্ষী, নদীর মাছ শামুক ঝিনুক ভাওনাথ—সব কিছুই ধরা পড়েছে সেই বেড়া-জালের মধ্যে। এই তো পৃথিবী। এখানেই মাটি মানুষের খেলা, মানুষে মানুষে লড়াই। তবুও ভাওনাথের মনে হয় এখানে যেন জীবনটা অনেক খোলা-মেলা, মুক্ত। এখান থেকে সব দেখা যায়, উপভোগ করা যায়। এখানে চিমনির কালো ধোঁয়া নেই, মেসিনের ধারালো দাঁতের দাঁতখামচি নেই। চোখ মেলে চেয়ে দেখবার অফুরন্ত আকাশ আছে এখানে, আছে বুকভরে নেবার অফুরন্ত বাতাস। এ যেন আর এক জগত, আর এক জীবন। প্রকৃতির কোলে বসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ভাওনাথ। একটা নতুন ভাওনাথকে দেখতে পায়।

অন্ধকার আস্তে আস্তে সমস্ত আকাশ, বনজঙ্গল, নদীনালা গাছপালাকে গ্রাস করে ফেলছে। বড় লোলুপ ক্ষুধার্ত এই অন্ধকার। গোটা পৃথিবীটাকে গিলে ফেলবে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। দুর থেকে মচমচ খচখচ আওয়াজ ভেসে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভোটকা গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ। জল খেতে আসছে নদীতে।

ভাওনাথ উঠে দাঁড়ায় এবারে। সামনে বনের এপাশে সেপাশে একবারটা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রাস্তা ধরে। বন আর সুপুরিবাড়ি পার হয়ে গুদোমের কাছে এসে দাঁড়ায়। এখানে কয়লার ছাই আর খরানির ঢেউয়ে আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। ডুবে গেছে চা শিরীষের গাছ, চায়ের গুদোম, অফিস, সাহেবদের কুঠি, বাবুদের আর মজুরদের ঘরবাড়ি। নিকটেই পিলখানা। সেখান থেকে তরঙ্গ ও কলাগাছের ভাজা ঘেসো জলো গন্ধ ভেসে আসছে। মটমট শব্দ হচ্ছে। হাত্তিটা খাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না তবু অনুভব করতে পারে হাঁড়গোড় সব চিবিয়ে চিবিয়ে বেশ আরাম করে খাচ্ছে। শুঁড় দিয়ে এমনিভাবে জড়িয়ে ধরছে যে পিছলে কি ছিটকে

যাওয়ার উপায় নেই। দু'এক ফোটা রস পড়ছে সুঁড় দিয়ে গড়িয়ে। সেইটুকু স্বাক্ষরই শুধু রেখে যাচ্ছে মাটিতে।

নিজের ঘরের কাছে ফিরে এসে ঘরটার দিকে তাকায়। এ-ঘর যেন সে আগে দেখেনি কোনোদিন। ঘরের রূপটা পালটে গেছে। দূরে অতি উঁচু পাহাড়ে আগুন লেগেছে। জঙ্গল জ্বলছে পুড়ছে। ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ হচ্ছে। ওঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে ভাওনাথ। সারা পাহাড়টা লাল হয়ে উঠেছে। আগুনের লাল শিখাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। গাছপালা কাঁপছে। পাহাড়টাও। পাহাড়ের ঘুম ভেঙেছে। আকাশস্পর্শী আগুন পাহাড়ের মাথা ছুঁয়েছে। মাথাটা লাল টকটকে হয়ে গেছে। বহুদূরে ভাওনাথ, তবু এর উত্তাপ অনুভব করে সে। চোখে মুখে, গায়ে অন্তরে। চোখের সামনে দেখতে পায় সারিবাঁধা ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে আঁতুড়ে ঘর। আলো নেই, অনেক আগেই নিবে গেছে। সর্বত্র একটা অসহায় নীরবতা। অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পাচ্ছে অপরিসর ছোট ছোট ঘরগুলোর মেঝে জুড়ে মজুররা তাদের ছোট বড় ছেলে-মেয়ে মা-বোন ভাই নিয়ে শুয়ে আছে। লজ্জা নেই, চিন্তা নেই, নির্বিকার। দেখতে পায় তাদের রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ। বিস্রস্ত বিবর্ণ চুল ; উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দিন দিন এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। আর অন্যদিকে ইন্দ্রতুল্য প্রাসাদ থেকে লাল নীল সবুজ আলোর ঝিকমিক রোশনি আসছে। সেখানে চলছে অবাধ জীবনের স্রোত, আমোদ প্রমোদের রঙীন বিভ্রম। কানে শুনতে পায় তাদের কল্লোল, কাচের গ্লাসের টুংটাং ঝুনঝুন আওয়াজ, দেখতে পায় ফেনায়িত লাল জলের ঝকমকে গ্লাস। গন্ধ পায় নাকে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন জ্বালা করে ওঠে। এলোমেলো অনেক ভাবনা, অনেক জিজ্ঞাসা উদ্বেল হয়ে ওঠে।

এতদিন ধরে যে আদর্শ দেহের ও মনের উত্তাপ আর উত্তেজনা দিয়ে পুষে রেখেছে তা কি একটা হুমকিতে কিংবা অনাহার অত্যাচারের ভয়ে ভেঙে পড়বে? এতো দুর্যোগ বয়ে গেল তার ওপর দিয়ে—বাপ মা মারা গেল বিনা আহারে, বিনা চিকিৎসায়। রুকমিণ মরলো। ঠাকুরমাণও। এসব যখন সে সইতে পেরেছে

তখন আর কিছুই তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারবে না। লক্ষ্য সে ছাড়বে না কিছুতেই। এই দারিদ্র্য প্রপীড়িত লোকগুলোর দেহে তাপ আনতে হবে, মনে আলো জ্বালতে হবে, পথ সুগম করতে হবে, প্রকৃত জীবনের সন্ধান দিতে হবে তবেই তো এই বুভুক্ষা নির্মমতা ও নির্যাতন একটা নতুন দিনের, নতুন পৃথিবীর জন্ম দেবে।

রিক্ততা নিঃস্বতার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো জীবন নেই। বারে বারে এই একই কথা ঘুরে ফিরে মনে জট পাকাচ্ছে ভাওনাথের। সে আজ চোদ্দপনর বছর আগের কথা। এই চোদ্দপনর বছরে কত বিপর্যয় বিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর ঋতুবদল হ'ল কতবার। ভাদ্রের নদীর মত খরতর উচ্ছল হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন, আবার ভাঁটার টানে নিস্তরঙ্গ হয়েছে হেমন্তের হাওয়া লেগে। বসন্তের ফুল ফুটেছিল রূপ রস গন্ধ নিয়ে, ঝরে মরে গেছে চৈতি হাওয়ায়।

মনে পড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য মিছিল, সেই উঁচুনিচু সীমাহীন ঢেউখেলানো মাঠ, শালবনের ছায়া ছায়া পথ, সেই নীল ছোট ছোট পাহাড় দূরে যেখানে আকাশ এসে মিশেছে। মনে পড়ে প্রকৃতির গা-ছোঁওয়া সেই মানুষগুলোকে। কী সরল সুস্থদেহ। কী সহজ সরল জীবনযাত্রা। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, তেলচক্‌চকে মুখ। ওরা চলেছে সারিবেঁধে খামার করতে। ওদের তেল-চোঁয়ানো দেহে সোনালী রোদের মাতামাতি। বাঁশের বাঁশির সুর সারা প্রান্তরটাকে মাতাল করে তুলেছে। শালের বন আরামে দোল খাচ্ছে, দূরে আকাশ মাথা নিচু করে হাসছে। সেই শালপাতাছাওয়া ছোট ছোট মাটি পাথরের ঘর, জোয়ান জোয়ান ছেলে মেয়েদের উচ্ছল উদ্দাম নৃত্য, হাসি গান বাজনা। ভাওনাথ প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করে জীবনের সেই অপূর্ব স্পন্দন সুর, ছন্দ। সেখানে তাল বৈষম্য নেই, আরণ্যক পাশব উল্লাস নেই। তখন বুঝতে পারতো না ভাওনাথ, বোঝবার মত বয়সও হয়নি তার—জীবন কি এবং কি-মশলা দিয়ে এই জীবন গাঁথা, কি তার খোরাক আর কি সে চায়। আজ বুঝতে পারে শুধু চুণ বালি দিয়ে জীবনের গাঁথনি হয় না তার সঙ্গে আরো কিছু সারবত্তাও চাই। চাই মাটি, সিমেণ্ট।

সেদিন ছিল কিনকে-লর হাট। হাট, ওদের বাড়ি থেকে তিন ক্রোশ দূরে। পাহাড়তলির গ্রাম। গ্রামের পরেই মাঠ। মাঠে গরুর ঘাস কাটছিল তার বাবা লেংড়া আর সে। বেলা দশটা তখন। তাড়াতাড়ি করছিল বাপবেটায়। লেংড়াকে হাটে যেতে হবে। এই দশ গাঁয়ের মধ্যে আর দ্বিতীয় হাট নাই। হাট বসে প্রতি মঙ্গলবারে। প্রতি হাটবারে হাটে যাওয়া হয়ে ওঠে না। পয়সাকড়িরও টানা-টানি আবার কাজও অফুরন্ত। গত দুই হাটে যাওয়া হয়নি। আজ যেতেই হবে, অনেক টুক্‌টাক্‌ জিনিসপত্তরের একটা ফিরিস্তি দাখিল করেছে সুখনী। হাটে যাওয়া মানেই একটা দিন নষ্ট। খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে গেলেও দু'ঘণ্টা লাগে শুধু যেতে। এরপর হাটের জিনিসপত্তর কিনে ঘরে ফিরতে কমপক্ষে আরো তিন ঘণ্টা সময় লাগে। ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। তখন তো আর ঘাস কাটার সময় থাকবে না। আর ঘাস না হলে গরু কটিই-বা রাতে খাবে কি?

পাহাড়তলির সব গ্রামগুলিতেই একটা বিরাট হৈচৈ পড়েছে। খবরটা রটিয়েছে ওদের গাঁয়ের রামু বড়াইক। কিনকেলে মেয়ের বাড়ি গিয়েছিল সে। রাতে ফিরেছে।

লেংড়া আর ভাওনাথ সে-খবর জানতে পারেনি আগে, তারা সকালেই বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

ঘাস কাটার খস্‌খস্‌ শব্দের তালে তালে সুর মিলিয়ে চলছিল লেংড়ার চিন্তাধারা। মাঝে এক ফাঁকে ভাওনাথকে বলে, কত জিনিস যে আজ কিনতে হবে। নুন, তেল, পেঁয়াজ, রশুন আরো কত কি। একখানি গামছা একটা মাথাল, আর একটা কাঁচিও কিনতে হবে। কাঁচিটার মাথা ভেঙে থেঁতো হয়ে গেছে, ঠিকমত গাছ নিঙড়ানো যায় না ও দিয়ে। গাছের মূল-শেকড় কেটে যাওয়ার ভয়।

হঠাৎ চমকে ওঠে লেংড়া। কি যেন একটা ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার। ঘাসের মধ্যে ছিল একটা ব্যাঙ। ঘাস নড়াতে ভয় পেয়ে একটা লাফ মেরে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গিয়ে লেংড়ার ঘাড়ে। একটা ভীতিসূচক চীৎকার দিয়ে ওঠে লেংড়া। সেই

আর্তনাদ ভাওনাথও চমকে ওঠে। দু'পা পিছিয়েও গিয়েছিল। হেসে ফেলে সে। ভয় পাওয়া'তো তখনকার বয়সে স্বাভাবিক। সবেমাত্র চোদ্দোয় পা দিয়েছিল সে।

লেংড়া বললো, ডর নখে। ব্যাঙ আহে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে দু'জনে।

কাটা ঘাসগুলোর দিকে একটু চোখ দুটো বুলিয়ে ভাওনাথকে বলে—চল্ আব ঘর যাবু।

কাটা ঘাসের আঁটি বাঁধছিল তারা। হঠাৎ একটা সোরগোল শুনতে পায়। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখতে পায় হৈ-হল্লা করতে করতে দলে দলে লোক চলেছে হাটে। মাঠের মধ্যে হালট, সেইটাই যাতায়াতের পথ। সারা হালটটা লোকে ভরতি। লোকগুলোর চোখেমুখে কেমন একটা খুশির আমেজ!

ব্যাপার কি জানার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে ওরা। লেংড়া এক-পা দু-পা করে অনেকখানি এগিয়ে যায় লোকগুলোর নিকটে। ভাওনাথও বাপের পিছু পিছু যায়। গ্রামের গোপী ঘাসিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, লেংড়া কা ভেলেক জুন?

গোপী অবাক হয় লেংড়ার প্রশ্নে। বলে, চাচা তোয় নেই শোনলেক? আজ হাটে খুব বড় সভা হবে। একজন বাবু এসেছে শহর থেকে। কিসে টাকা পয়সা বেশি কামানো যায় তার উপায় নাকি বাতলিয়ে দেবেন তিনি।

সুখনী ছিল ঘরে। ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে ওঠোনে এসে দাঁড়াল। সামান্য কয় মুঠো ঘাস দেখেই তার চোখ কপালে উঠল। থোতনায় হাত দিয়ে বললে, এতনা ঘাসমে হামকা গোউকা কা হোবে?

লেংড়া সব কথা খুলে বলে সুখনীকে।

ভাওনাথ মনে মনে অনেক কথা ভাবে, অনেক কল্পনার জাল বোনে। বাবুরা কেমন, তারা কি তাদেরই মত—না অন্য কোনো রকম? বাবু বলতে কি বুঝায় আর এর মানেই বা কি?

ভাওনাথ নিজেকে আর চেপে রাখতে পারল না। আবদারের

সুরে লেংড়াকে বলে, মোর হাট যাবু বাপ। বাবু দেখেনি কোনোদিন, তারা কেমন দেখবে সে।

লেংড়া আপত্তি করেনি এতে। সত্যিই তো সে শহরে যায়নি কোনোদিন। শহরে না গেলে বাবু দেখবে কোথেকে? আর শহরও তো কাছে নয়, পুরো দু'দিনের রাস্তা। হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রাস্তায় লোক ধরে না। জনস্রোত খলখল করছে, চলছে বর্ষার নতুন জলের স্রোতের উজান যাওয়া মাছের মত।

লোংড়া বললো, বহুৎ ভিড় হেকে। মোকের সাথ-সাথমে আহো ছোওয়া।

ভাওনাথ হুঁ বলে সম্মতি জানায় কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ভুলে যায় সে-সব কথা। উৎসাহভরে এগিয়ে চলে যায় অনেক দূরে, লোকের ভিড়ের মধ্যে লেংড়া পড়ে থাকে বহু পিছনে।

ভাওনাথ, ভাওনাথ বলে গলা চিরে ডাকে লেংড়া।

—হেঁয়া আহে মুই। একটু জোরে পা চালিয়ে এসো না?

[illegible]লের হাট। অল্প একটু জায়গার মধ্যে ছোট একটা হাট। লোকে লোকারণ্য। পা রাখবার জায়গা নেই। সব চেয়ে বেশি ভিড় শিবু মহাজনের দোকানে। স্টোভে একটা লোক রান্না করছে সেখানে। ভাওনাথের চোখে বড় ভাল লাগলো লোকটাকে। চেহারায় ওদের দেশের লোকের মত কিন্তু হাবভাব অন্য ধরনের। স্টোভটার সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। সেদিকে নজর পড়তেই বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় হয়ে ওঠে। এ আবার কী এক অদ্ভুত জিনিস? আগুন আসছে কোথা দিয়ে? ভাওনাথের কৌতূহলী মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। নিষ্পলক চেয়েছিল স্টোভ আর লোকটার পানে। চোখেমুখে বিস্ময় আর ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। লোকটির কিন্তু ভয় নেই একটুও। আগুন ধরে না যায়। এক ফাঁকে লেংড়ার দিকে তাকায় লোকটা। ঠোঁটের [illegible] আপ্যায়নের মৃদু হাসির রেখা।

লোকটির চোখে চোখ পড়ে ভাওনাথের। কি যেন আছে মানুষটার চোখের দৃষ্টিতে। একবার তাকালে বার বার তাকাবার ইচ্ছা হয়। মানুষটা দেখতে তাদেরই মত, তবু কোথাও মিল নেই যেন তার দেখা মানুষের সঙ্গে। বয়স বেশি নয় ওর। ভাওনাথ আন্দাজ করে—কুড়ি বাইশ কি বড় জোর তেইশ হবে। এর বেশি নয়।

ভাওনাথ হাবার মত চোখ বড় করে কোলার দিকে তাকিয়ে থাকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে ওর কথা শোনার জন্যে।

ভাওনাথ দেখতে পায় কোলার চোখে মুখেও একটা আগ্রহের ইঙ্গিত।

এই সরল গ্রাম্য কিশোরটির মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত পাড় ভেঙে যায় কোলার। নিজে থেকেই বলে ওঠে, এখানে এসে বোস না?

সমস্তই আশ্চর্য লাগছিল ভাওনাথের। এই মানুষটার কথা বলার ঢং, অঙ্গভঙ্গি চলাফেরা সবই যেন ভিন্ন জগতের। আলাপ পরিচয়ে জানতে পারে লোকটির নাম কোলা। আর তার বাবুর নাম জ্ঞানবাবু।

কোলা তার জামার পকেট থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট তাকে দেয়। এইবারে তার জামা কাপড়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে ভাওনাথের। কী পরিষ্কার, সাদা ধবধবে! অনেক টাকা রোজগার করে নিশ্চয়ই?

নিজের ভাষায় জিগ্যেস করে ভাওনাথ, তোকের বাবু কাহা আছে?

বাংলায় উত্তর দেয় কোলা, স্নান করছেন।

ভাওনাথ বুঝতে পারে কোলার কথা। সে তার দিকে ফিরে। দেখতে পায় কোলা বাংলায় কথা বলে যেন গর্ব অনুভব করছে মনে মনে। বাইরে পিয়াল গাছের নিচে ইঁদারা। সে দিকে চোখ দুটো একবারটা বুলিয়ে নেয়। কই কলতলাতে তো বাবু বলতে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কোথায় স্নান করছে? ওখানে তো শুধু কয়েজন হাটুরীয়া হাত পা মুখ ধুচ্ছে।

কৌতূহল জাগে মনে। জিগ্যেস করে, কাহা, [illegible] তো বাবু নখে।

বিচক্ষণের হাসি হেসে কোলা জবাব দেয়, তোয় নেই জানলেক বাবুলেক বাহিরমে গোছল নেই করথে।

ভাওনাথ অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিল কোলার দিকে। ভাবছিল বাবুরা খোলা জায়গায় স্নান করে না কেন, কি হয় এতে ?

ভাত টগবগ করে ফুটছে। কোলা মন দেয় সে-দিকে। ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে খুন্তি দিয়ে কয়েকটা ভাত নিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করে আবার ঢাকনিটা যথাস্থানে হাঁড়ির ওপর রেখে দেয়। ভাত ফুটতে থাকে।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। মনে মনে অনেক কিছু ভাবে ভাওনাথ। তারপর জিগ্যেস করে; তোয় তেনি বহুৎ লেখাপড়া জানোথিস ?

—লেখাপড়া নেই জানেথে মুই। লেখাপড়া জানলে তো বাবু হতে পারতাম। বাবুর কাজ করতাম অফিসে বসে।

অবাক লাগে ভাওনাথের। এ কি বিশ্বাস্য ; কিন্তু কোলাই বা খামোখা মিছে বলবে কেন ? তা হলে এমন দেশও আছে যেখানে লেখাপড়া না জানলেও মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করা যায় ? সেও তো যা হোক অল্প একটু লিখতে পড়তে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই বেশ কিছু উপার্জন করতে পারব। স্কুল তো নেই গাঁয়ে। ভাগ্যিস তার মামা বউ মরার পর তাদের বাড়িতে এসে এক বছর ছিল তাই সে একটু বাংলা ও ইংরেজী হরফ লিখতে পড়তে শিখতে পেরেছে। মামা ছিল নাগপুরে একটা অফিসের পিয়ন। সেইসময় সে আর একজন পিয়নের কাছে লেখাপড়া শিখেছিল। ছেলেপিলে ছিল না তাই সমস্ত মায়াটা পড়েছিল বউয়ের ওপর। বউ মারা যাবার পর চাকরি ছেড়ে দেয়। বলতো : কি হবে আর চাকরি করে, কার জন্য চাকরি করব ?

এতক্ষণে জ্ঞানবাবু স্নান সেরে মাথায় চিরুণি বুলোতে বুলোতে এসে জিগ্যেস করলেন :

—রান্না হয়েছে রে কোলা ?

—হাঁ বাবু, সব তৈরী।

—খেতে দে, বলে ভিতরে চলে গেলেন জ্ঞানবাবু।

দরজা খোলা। ভাওনাথ দেখতে পায় জ্ঞানবাবু সারা গায়ে সাদা গুঁড়োগুঁড়ো কি যেন ছিটিয়ে দিচ্ছেন। সাদা খড়ির মত গুঁড়ো। নির্কাশ করে বাটা। বাতাসে তার মিষ্টি গন্ধ আসছে। আরো একটু গুঁড়ো উড়ে এসে ভাওনাথের চোখেমুখে লাগে। নাক টেনে টেনে গন্ধ শোঁখে বার বার। সকলের অজ্ঞাতসারে আলগোছে মুখে হাত দিয়ে দু'একটা গুঁড়ো এনে পরখ করে। হাতটা খুব মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে। সমস্ত মনটাও মেতে উঠেছে গন্ধে। শুধু কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। এরা আলাদা জগতের লোক, এদের সবই নতুন। হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ভাওনাথের মন পাহাড়তলির গ্রামগুলোর ওপর, তাদের অধিবাসীদের ওপর। সে ভাবতে পারে না এমন মনোরম দেশ থাকতে কেন এই নির্বোধ বর্বর লোকগুলো সেখানে থাকে?

মিনিট মিনিট করে কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। সময়ের যেন ডানা আছে, মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গেছে কোথায়। বেলা তিনটে। লোক ধরে না শিবু মহাজনের দোকানে। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি শুরু হয়েছে। ওরা যেন দেবদর্শনপ্রার্থী। এতো ঠেলাঠেলি, এতো লোক একসঙ্গে এক জায়গায় কোনোদিন দেখেনি ভাওনাথ।

এ-সমস্ত কথা এখন যেন কেমন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় ভাওনাথের। এর অনেক কথাই বিস্মৃতপ্রায় তবুও যে-সব আজ স্মৃতির স্রোত বেয়ে ভেসে আসছে একের পর এক।

জ্ঞানবাবু এসে দাঁড়ালেন সকলের সামনে। লম্বা চওড়া সুঠাম চেহারার মানুষটি। খুব ভাল লাগলো ভাওনাথের। কী চমৎকার ব্যবহার? অত বড় একটি লোক অহঙ্কার বলতে কিছু নেই। এসেই হাসিমুখে হাত দু'টো জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে নরম মিষ্টি অথচ দৃপ্ত গলায় বলতে শুরু করলেন, ভাই সব, তোমরা নিশ্চয়ই শোননি এখনো, আর শুনবেই বা কি করে? কে তোমাদের এ-সব খবর দেবে বল? সকলেই তো নিজের নিয়ে ব্যস্ত। এ-দেশে ইংরেজ এসেছে এ-কথা আর নতুন করে বলার দরকার আছে মনে করিনে। সারা বাংলার উত্তর

অঞ্চলে পাহাড় জঙ্গল কেটে চায়ের চাষ আরম্ভ করেছেন। আগে তো চা বলে কিছু আছে এ কথা এ-দেশের লোকে জানতোই না। চা হতো চীন দেশে। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাঁরা অনেক চা বাগান খুলেছেন। এর মধ্যে তাঁদের টাকায় কত গরীব লোক যে বড়লোক হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করছে তার হিসেব নেই। বাগানে কেউ খেতে না পেয়ে মরে না, কাপড় জামার অভাবে কখনও পড়ে না এখানকার লোক। প্রতিদিনই সাহেবরা খুলছেন নতুন নতুন অনেক বাগান, এই দেশের লোকের জন্য, তোমাদের জন্য, তোমাদের ভাত কাপড়ের জন্য। সেখানে পাবে সরকারী ভাল ঘরবাড়ি, সেখানে পাবে বিনা খাজনায় ক্ষেত-খামার করার জায়গা জমি। অসুখ হ'লে ওষুধ পাবে, পয়সা লাগবে না। সরকারী ডাক্তার আছে, যখন দরকার পাবে। অনেক, অনেক সুবিধা সুযোগ আছে সেখানে। কত রকমের যে সুবিধা তা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না, এবং চোখে না দেখা পর্যন্ত অনেকেই বিশ্বাসও করবে না হয়ত। আমি জোরগলায় শপথ করে বলতে পারি, তোমরা একবার সেখানে গেলে আর ফিরে আসতে চাইবে না, এখানকার কথাও ভুলে যাবে। আমার সঙ্গে গেলে, গাড়িভাড়া, পথের খাওয়া দাওয়ার খরচ কিছুই লাগবে না তোমাদের, বরং আরো পাঁচ টাকা নগদ দেব। তা দিয়ে তোমাদের দরকারি আর আর জিনিসপত্তর কিনতে পারবে। এ-ছাড়া বাগানে যাওয়ার পর আরো টাকা পাবে সেখানে। হাঁ, বলতে ভুলে গেছি, বিনা পায়সায় চা পাবে খেতে। এই চায়ে তোমাদের গায়ে অনেক জোর হবে, কাজে স্ফূর্তি আসবে আর স্ফূর্তিতে অনেক বেশি কাজ করতে পারবে, আর অনেক বেশি কাজ করতে পারলে অনেক টাকা পাবে। চা খেলে কোনো অসুখ হবে না, আর যদি কখনও সর্দি হয় কাশি হয়, এককাপ চা খেয়েও শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে। জ্বর হোক এককাপ চা খাও, সমস্ত শরীরটা ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে। চায়ের অনেক গুণ। বলতে গেলে কথা ফুরোয় না। তাই তো বিলেতের লোকগুলোর গায়ে এত জোর, তাদের অসুখ

করে না কোনোদিন। ওরা চা খায় বলে অত সাহস আর অমন আমুদে।

এরপর লেংড়ার সঙ্গে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে ভাওনাথ। সুখনী তখনও উঠোনে বসে বাঁশের ঝাঁপি তৈরি করছে, সামনে একটা কুপি জ্বলছে। অল্প হাওয়ায় বাতিটা একবার কমছে আবার বাড়ছে।

ওদের দেখতে পেয়ে সুখনী বলে ওঠে: বুধু নাকি নাম লিখিয়ে এল চা বাগানে যাবে বলে?

লেংড়া জবাব দেওয়ার আগেই ভাওনাথ বললে, একলা বুধু কেন? অনেকেই লিখিয়েছে।

সুখনী গর্ব অনুভব করে মনে মনে। হাসতে হাসতে লেংড়াকে বললো, তা হলে এইবার দেখতে পাচ্ছ তোমাকে আমি যা যা বলেছি তা সব ঠিক? সুখনী না থেমে বলতে থাকে, কিইবা এমন কামের লোক আমার ঐ মামাতো ভাই শনচর। ছিপছিপে মরা কাঠ চেহারা, না আছে শক্তি সামর্থ, না আছে বুদ্ধিসুদ্ধি। একটা নিরেট পাথর, ক্যাবলা। দেখেছ তো আজ চার বছর আগে ওর কী ছিল আর এখন কি নেই? দেখলে তো দু'বছর বাদে যখন বউ নিয়ে দেশে ফিরলো বউয়ের গায় কত গয়না? মাথায়, কানে, নাকে, গলায়, কোমরে পায়ে সব জায়গায়, যেখানে যা দরকার। বউয়ের বয়স তো কম নয়, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ই হবে তবু গয়না পরে ফিটফাট থেকে কত সুন্দর দেখায় তাকে। আর তার পাশে আমাকে কত বুড়ি দেখায়।

লেংড়া হাসতে হাসতে বললো, তব চলেক তানি দেখে আইবু।

লেংড়ার কথাতে ভাওনাথের সন্দেহ হয়। সে মনে করে তার মাকে বুঝি ঠাট্টা করছে বাবা। সে সংশয় ভাঙে লেংড়ার পরের কথাতে। লেংড়া বললে: জায়গা ভাল না লাগে ফিরে অ সবো আবার। শনচর তো বলেছিল, না থাকলে সাহেবরা দেশে পাঠিয়ে দেয় আবার।

ভাওনাথ খুব খুশি হয়েছিল বাবার কথাতে। তাকে আর

ধারণা ধরতে হয়নি। আর তার মতের সঙ্গে মা বাবার মতের মিল আছে দেখে নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান ভেবে মনে মনে গৌরবের হাসি হেসেছিল সে। সেই হাসি এখনও ভাওনাথের মনে পড়ে কিন্তু সেই রকম হাসি এখন আর সে হাসতে পারে না। সেই হাসির উৎস কোথায় সে-সন্ধানও জানে না সে।

বাবু দেখেছে আজ এবারে সাহেব দেখবে এই আনন্দেই সে বিভোর। কোলার কাছে শুনেছে সাহেবরা দেখতে নাকি খুব ফর্সা, চুলগুলো সোনালী, চোখেমুখে আলো ঝলমল করছে আর শরীরে অসুরের শক্তি। মনে মনে সাহেবের রূপ কল্পনা করে ভাওনাথ।

পরদিন সকালে লেংড়া আবার কিনকেলে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসে তাদের। এক হপ্তা পার একটা নির্ধারিত দিনে রওনা হতে হবে তাদের। ঐ দিন ক্ষণ সবই ঠিক করে দিয়েছেন জ্ঞানবাবু।

এরপর জ্ঞানবাবুর উপদেশ মত নির্ধারিত দিনে ওরা গিয়ে হাজির হয় তাঁর কাছে। ইতিমধ্যে হালের গরুবাছুর হাঁস, মুরগী যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে দিয়েছে লেংড়া। জলের দামে বিক্রী করতে হয় সব, কারণ ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা এখন বেশি। লতাপাতার তৈরি ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটিতে একজন দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়াকে বসিয়ে যান।

কোলাকে চাপরাশী ডাকতে বলেন জ্ঞানবাবু। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইয়া মোচওয়ালা গাট্টাগোট্টা শক্তসমর্থ চেহারার একটা লোক সঙ্গে করে কোলা ফেরে। লোকটির কোমরে একটা চামড়ার চওড়া পেটি বাঁধা। পেটিতে পিতলের এক চাপরাস। তাতে বড় বড় হরফে লেখা পিওন টি, ডি, এল, এ। এ ছাড়া কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়ি আর একটা সুতীর চওড়া মোটা ব্যাচ ঝুলছে পৈতার মত। তাতেও ঐ কথাগুলো লেখা। মনে মনে একটু ভয় হয়েছিল ভাওনাথের। পুলিশের নাম শুনেছে, তবে কি লোকটা পুলিশ?

এরপর জ্ঞানবাবুর হুকুম মত ঐ ছয় ফুটে বিরাট দৈত্যের মত লোকটি তাদের নিয়ে যায় লোহারডগা। সবই যেন যন্ত্রের মত

চলছে। সেখানে গিয়ে ওরা দেখতে পায় সব তৈরি। পৌঁছান মাত্রই খাওয়া দাওয়া হয়। কোট-প্যাণ্টপরা একজন বাবু এসে হুকুম দেন একটা লোককে, ওদের মালখানায় নিয়ে গিয়ে কাপড়-জামা বাসনপত্তর দিয়ে দাও। লেংড়া একখানি ধুতি, সুখনী একটা লাল পাছা-পেড়ে শাড়ি আর ভাওনাথকেও দেয় একখানা ছোট ধুতি। আর এ-ছাড়া তারা পেল একটা লোহার কড়াইও আর তিনখানা কলাইকরা থালা।

ওরা সকলেই খুব খুশি হয়েছিল পাওনার নমুনা দেখে। তাহলে কিনকেলে বাবুটি যা বলেছেন তা সবই সত্য।

এরপর আর একটা চাপরাশধারী লোকের সঙ্গে ওরা স্টেশনে আসে। সেই লোকটি যে বরাবর তাদের সঙ্গে বাগানে আসবে তা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি ওরা।

ভাওনাথ রেলগাড়ি দেখেনি কোনোদিন। বিস্ময়ের অবধি নেই, মনে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা আর আনন্দ। সব কিছু খুঁটে খুঁটে দেখছে সে। এমন করে দেখার পিপাসা এর আগে তার ছিল না। যত দেখছে তত দেখার সাধ হচ্ছে, জানবার পিপাসা বাড়ছে। তখনো স্টেশনে গাড়ি আসেনি। স্টেশন ঘরটার সামনে মাটিতে কাঠের ওপর বসানো মস্ত বড় সোজা দু'টো লোহা দেখতে পেয়ে লেংড়াকে জিগ্যেস করে জানতে পারে, সে দু'টো রেললাইন, ওর ওপর দিয়েই নাকি গাড়ি চলে। তারপর হঠাৎ একটা খট্‌খট্‌ আওয়াজে চমকে ওঠে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে একজন বাবু এক টুকরো কাঠের ওপর [illegible] একটা কাঠিতে আঙুল ঠুকছে। শব্দ হচ্ছে টরে টক্কা টরে টরে। আশ্চর্য হয় অথচ অদ্ভুত ভাল লাগে ভাওনাথের। লেংড়ার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে বোকার মত চেয়ে থাকে, মুখে একটু হাসি। লেংড়া বুঝতে পারে ভাওনাথের মনের ভাব। সব বুঝিয়ে দেয় তাকে। ভাওনাথের কিন্তু মাথা ঘুলিয়ে যায় এসব ভাবতে। কি করে একটা কাঠ ঠুকলে কথা বেরোয় আর শব্দই বা কতটুকু জোরে হচ্ছে যে তা অতদূরে আর একটা স্টেশনে যাবে। এরপর কুঁক কুঁক শব্দ আর একরাশ কালো ধোঁয়া উড়ে আসে। গাড়ি এসেছে প্লাটফর্মে। দেখতে পায় একটু দূরে

একটা লোক দাঁড়িয়ে সবুজ ঝাণ্ডা উড়াচ্ছে। অদ্ভুত লাগে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর কত কি ভাবছিল সে। লেংড়া একটা ধাক্কা দিয়ে হাত ধরে তাকে গাড়িতে ওঠায়। তখন জিজ্ঞাসা করার অবকাশ পায়নি গাড়িতে উঠে লেংড়াকে জিগ্যেস করে জানতে পারে সব। প্রত্যেকের কাজের সঙ্গে একটা অদ্ভুত যোগাযোগ কেমন করে এসব সম্ভব হয় এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না ভাওনাথ।

গাড়ি চলেছে মেঘের মত কালো কালো ধোঁয়া উড়িয়ে। সেই সঙ্গে রেল লাইনের দু'ধারে ছুটে চলেছে অফুরন্ত সৌন্দর্য ও নানারকম ও নানা নানা চেহারার লোকের মিছিল। কত সবুজ ধানক্ষেত, বিল, নীল টলটলে জল, কত পাখী, নতুন নতুন মুখ, কত গ্রাম, শহর, ঘরবাড়ি, গাছপালা, গাড়িঘোড়া, দোকানপসার সাইনবোর্ড। এ-সব দেখে দেখে মন তন্ময় হয়ে পরে, জীবনের একটা নতুন আস্বাদ পায়।

ছোট ছোট মাছগুলো জল থেকে ওপরে লাফিয়ে ওঠে আবার জলে পড়ে। ভাওনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে জলের দিকে চেয়ে থাকে। মাছগুলোকে খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, ওগুলো যেন হাওয়ার চেয়েও দ্রুত। বকগুলো কী চালাক। চোখেরই বা কী তীব্র দৃষ্টি, চলন নিঃশব্দ অথচ কত দ্রুত, শ্রবণশক্তি কী প্রখর। জলের কিনারে নিতান্ত সভ্য ছেলের মত চুপচাপ বসে আছে আর একটু শব্দ হয়েছে কি লম্বা সরু ঠোঁটটি ডুবিয়ে দেয় জলে। তারপর কি হয় দেখার সুযোগ পায়নি। গাড়ি ছুটে চলে ঝড়ের বেগে।

নজর পড়ে দোকানগুলোর দিকে। অগণতি দোকান। সারবাঁধা। একটার পর আর একটা। কি নেই ওগুলোতে? ওটা কি লেখা? অনেক কষ্টে মনে মনে বানান করে পড়ে ভাওনাথ, প দা ব র ণ। এর মানে কি? এখানে আবার কি পাওয়া যায়? হাঁ, ঐ তো জুতো আঁকা রয়েছে ঐ লেখাটার নিচেয়, তাহলে নিশ্চয়ই জুতোর দোকান। শ্রীচরণেষু। কী অদ্ভুত অদ্ভুত নাম। শ্রীচরণ মানে তো 'পা'। তাহলে এইটে হয়ত পায়ের হাসপাতাল হবে, পা ভেঙে গেলে কি জানি পা জোড়া দেওয়া হয় এখানে? চোখ পড়ে সাইনবোর্ডের নিচের দিকে। এ কি এখানেও জুতো আঁকা?

।নিজের মনে হাসে ভাওনাথ। মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় সারা মুখখানা। মনে করে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখে কিন্তু সে উপায় নেই। গাড়ি যেন কারো অপেক্ষা রাখে না, বাতাসের মত সোঁ সোঁ হু হু করে চলেছে।

মাঝে এক ফাঁকে মনে পড়ে কোলাকে। লোকটাকে বড় ভাল লাগে ভাওনাথের। সে রয়ে গেল। কবে ফিরবে, কে জানে? সে সব জানে, থাকলে সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিত। হঠাৎ মনটা অন্যদিকে বাঁক নেয়। কোলা কিন্তু বড় খরচে। ভাওনাথ অত খরচা করবে না। ওর মার একটাও গয়না নেই। বাবা তো দিতে পারেনি কিন্তু সে দেবে; হাঁসুলি, মল, কানফুল, নাকছাবি। কত দুঃখ কষ্ট অভাবের সংসার ওদের। বড় হয়ে মজুরি খেটে সংসারের সব অভাব দুর করবে সে।

এরপর কাটিহার স্টেশনে এসে চমক ভাঙে। একটা বিরাট হৈচৈ হুড়মুড করে তাদের সঙ্গের ও অন্যান্য গাড়ির লোকগুলো কাঁধে বাঁশের দু'ধারে ঝোলানো পুটলিপত্তর নিয়ে আর একটা গাড়িতে উঠছে, তারাও সেই গাড়িতে ওঠে। এদিকে ফেরিওয়ালারা কাচেঘেরা কাঠের বাক্স মাথায় আর জলের বালতি হাতে, পুরি মেঠাই চাই, পানবিড়ি চাই বলে হাঁক ছেড়ে বেড়াচ্ছে। চা ফেরি করে বেড়াচ্ছে চাওয়ালা, চা খান, অবসাদ দুর হবে, দেহের ক্লান্তি কাটবে যতদুর খুশি যেতে পারবেন। চাই তানসেন গুলি, পিপাসা দুর হবে শরীর ঠাণ্ডা হবে। রস্তাঘাটের পচা ডোবার জল খেয়ে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবেন না। ওরা চা পানি পুরি মেঠাই খায়। তারপর পার্বতিপুরে আবার গাড়ি বদল। কাটিহারের বিরাট হৈ চৈ-এর মধ্যে লাল পাগড়িপরা চাপরাসধারী লোকগুলোকে লক্ষ্য করতে পারেনি ভাওনাথ। এবারে পার্বতিপুরে এসে এই লোকগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মানুষগুলোর চলাফেরা কথাবার্তা শুনলে মনে হয় এরা যেন বিশ্ব জয় করে এসেছে, এদের ওপরেই যেন ইংরেজ সরকার সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এরপর নজর পড়ে চা জলখাবারের দোকানগুলোর দিকে। থাকের ওপর থাক দিয়ে স্তরে স্তরে কি সুন্দর অদ্ভুতভাবে সাজানো এই

বিচিত্র মেঠাইগুলো। হরেক রকমের মেঠাই কোনোটারই নাম জানে না ভাওনাথ। মেঠাইগুলোর সুমিষ্ট গন্ধ পায় নাকে। এরপর লালমণিরহাট পেরিয়ে কুচবিহার। কুচবিহার পার হলেই দেখতে পায় মাটির রং অনেকটা বদলে গেছে। রেলের দুইপাশে যেখান থেকে মাটি কেটে রেল লাইন বসানো হয়েছে সেই সমস্ত গর্তগুলির পাড় লালচে রঙের। মনে হয় কেউ যেন তাতে সিঁদুর লেপে দিয়েছে। এরপর যেই আলিপুরদুয়ার পার হয়েছে অমনি দেখা যায় সেই ঢেউ খেলানো ধানের মাঠ আর সমতল প্রান্তর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখানকার জমি অসমতল, উঁচু-নিচু। মাটি বড় একটা চোখে ধরা পড়ে না শুধু বালি আর পাথরের কুঁচি। মাঝে মাঝে বড় বড় দু'একটা পাথর, ওর ওপর বসে গাঁয়ের ছেলেরা গল্প করছে। আকাশে বাতাসে চিমনির মাথায় কালো কালো অজস্র ধোঁয়া উঠছে। সাদা মেঘগুলো কেমন যেন কালো হয়ে গেছে ঐ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। সূর্যের রশ্মিও যেন ক্ষীণ হয়ে গেছে। শেষে দমনপুর স্টেশন পেরিয়ে গাড়ি এসে থমকে দাঁড়ায় রাজাভাত-খাওয়ায়। আবার একটা তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। তবে এবারকার তাড়াহুড়ো আগের মত জোরালো নয়। ধীরে সুস্থে সকলেই গাড়ি থেকে নামে। তারাও। এখানেই গাড়ির গতি শেষ হয়েছে. আর রেললাইন নেই।

ঘন বনের মধ্য দিয়ে লতাপাতায় ঘেরা প্রচ্ছন্ন সরু পথে ওরা চলতে থাকে উত্তরমুখো পাহাড়ের দিকে। পাহাড়টা হাসছে—চোখেমুখে রোদের ঝিলিমিলি। পথে ডিমা, কালজানি, বাসরা নদী আর গাড়োপাড়া, গাঙ্গুটিয়া, কালচিনি ও হাসিমারা বাগান। তারপর দলমাননগর।

তখন চৈত্রের প্রথম। কিছু দিন আগের কলমকরা চা গাছগুলো ফাল্গুনের মাঝামাঝি একটা বৃষ্টি পেয়ে তার সুঁচলো ডাঁটাগুলোর চারপাশ দিয়ে সমান ভাবে সবুজ কচি পাতা সমেত নতুন ডালপালা লকলকিয়ে উঠেছে। মনে হয় কে যেন সুদূর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, দৃষ্টির বাইরেও, বিরাট একটা সবুজ মখমলের গালিচা পেতে রেখেছে। এই চা গাছগুলির ফাঁকে

ফাঁকে আকাশস্পর্শা সাদাকালো শিরীষ খাকড়ের গাছ। গাছগুলো সারিবদ্ধ ভাবে সোজা আকাশমুখো অনেকদুর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সৌন্‌কর মত চা গাছগুলোকে আগলে আছে। এদের গোড়া থেকে আট দশ হাত উপর পর্যন্ত চুণের ছোপ লাগানো, মনে হচ্ছিল যেন ধোলাই লংক্লথের পায়জামা পরা। এই শিরীষ খাকড় গ্রীষ্মের দহন থেকে বাঁচিয়ে রাখে চা গাছগুলোকে। আর চৈত্রের ঝরা মরা পাতাগুলো বৃষ্টি পেয়ে শেষে সারে পরিণত হয়। সারবাঁধা এই চা শিরীষের গাছগুলোর মাঝে মাঝে জল নিষ্কাশনের নালা আর চা গাছের ডালপালা ঢাকা দু'একটা দেড় দু'ফুট চওড়া রাস্তা। দুরে দু'একটা বড় সড়কও আছে। পথ চলতে চলতে রাস্তা থেকেই নজরে পড়ে ছোট ছোট লতাপাতা খড়কুটো বাঁশখড়ির অজস্র কুঁড়ে ঘর। এর একটু দুরে আরো দু'চারটে লতাপাতা খড়জঙ্গল বাঁশ-খুঁটির তৈরি ঘর। এইগুলির আয়তন একটু বড়। চোখে পড়ে গুদোম ঘরগুলো। কালো পেণ্টকরা আকাশছোঁওয়া কয়েকটা চোঙ উঠেছে। তারপর অনেক দুরে সবুজ বনে ছোট নীলচে পাহাড়ের ওপর দু'তিনটে চোখ ঝলসানো রামধনুক বর্ণ চুরিকরা প্রাসাদতুল্য কুঠি। দেশী বিদেশী লতাপাতা ফুলে ঘেরা। জনবিরল শান্ত, সুস্থ পরিবেশ। এগুলো গুদোম থেকে বেশ খানিকটে দুরে। সেখানে চিমনীর কালো ধোঁয়া পৌঁছোয় না, হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাসের শ্বাসরোধী বেদনার বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই। কোথাও বা কোন কোন বাগানে টুকরি পিঠে বুকে ছেলে নিয়ে পাতি টিপছে কুলিকামিনরা। হাতের কাজ তো নয় যেন মেসিনে কাজ হচ্ছে মনে করে ভাওনাথ। আবার কোথাও বা মরদগুলো সারবেঁধে তালে তালে ফাড়ুয়া করছে। সাদা ইস্পাতের কোদালীগুলোর ওপর রৌদ্রঝলক পড়ে বিদ্যুতের মত ঝলমল করে উঠছে। চোখে ধাঁধা লাগে। এছাড়া অনেক মেয়েদের মাথায় ছোট এক একটা কাঠের বাক্স। এর মধ্যে মাটির মত কি একটা জিনিস। চাপরাসীকে জিগ্যেস কনে জানতে পারে—ওসব মল। পুরনো গোবর। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে একটা করে ছোট সিল ফাড়ুয়া। লেংড়াও তাকে ঐরকম একটা ছোট ফাড়ুয়া কিনে দিয়েছিল তা দিয়ে

ভাওনাথ মাঠে কাজ করতো লেংড়ার সঙ্গে। এর আগে সে কখন কখন, যখন জুতমত বৃষ্টি পাওয়ায় জমি চাষের উপযোগী হতো খুব কাজের চাপ পড়তো তার বাবার, তখন বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেত তার জন্মে। সুখনীই বলেছিল ঐ ফাড়য়া কিনে দিতে—সে আরো বলেছিল এখন থেকে কাজ করার অভ্যাস না করালে ও গতরপোষা হয়ে যাবে। এই সব ছবি দেখে দেখে চারদিন চার রাতের পথের ক্লান্তি ক্ষিধেতেষ্টা সব ভুলে গিয়েছিল ওরা। একটা নতুন আশার আলোক দেখতে পেয়েছিল উত্তরের ঐ নীলচে সবুজ পাহাড়ে। বিশাল বিস্তৃত পাহাড় সারা উত্তর দিকটা আর পুব পশ্চিম কোণ দুটোকে ঘিরে আছে। আকাশটাও নেমে এসেছে সেখানে। এখান থেকে আকাশ যেন বেশি দূরে নয়—পাহাড়ের কোলে উঠে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। বক্সাদুয়ারের উপরে দেখতে পায় বরফজমা সাদা ধবলগিরি চুড়ো। পাহাড়টা যেন একটা সাদা ওড়না মাথায় দিয়ে বসে আছে।

লোহরডগা থেকে চালানের আগেই ঠিক হয় মজুররা কোন সর্দারের অধীনে কাজ করবে কামানে। ওদেরও সর্দার ঠিক হয়। নাম জউরু বড়াইক। ওরা যখন দলমাননগর পৌঁছোয় তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। চাপরাসী বললো—এখন তো অফিস বন্ধ হয়ে গেছে—সাহেব বাবু কেউ নেই, চলো সর্দারের বাড়িতে যাই। বড় সড়ক থেকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে এসে একটা লাইনে পড়ে ওরা। সারবাঁধা অনেক ঘর। সব ঘরগুলোই লতাপাতা খড়জঙ্গলের তৈরি ঠিক যেমন ওরা আসার পথে দেখে এসেছে। এরই একটি ঘর জউরু সর্দারের। জউরু বাড়িতেই ছিল। ওদের দেখে এগিয়ে এসে চাপরাসীকে একটা সেলাম ঠুকে জিগ্যেস করে—কে কার কুলি আছে চাপরাসী সাব? সর্দারনীও সাড়া পেয়ে ঘর থেকে বাইরে আসে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বহু সমাদরে ওদের বসতে দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চা পানি এনে দেয় সর্দারনী। চা পানির সঙ্গে এক এক ডোবা হাঁড়িয়াও ছিল। মহাতৃপ্তির সঙ্গে এক নিশ্বাসে সব শেষ করে

ওরা। তারপর ভাত খাওয়া দাওয়া হয় বেলা তিনটেয়। চারটেয় অফিসে যায় ওরা। ওদের সঙ্গে জউরুও আসে। অফিস যাওয়ার আগে চাপরাসী বক্‌সিস চায় সর্দারের কাছে। সর্দার কোনো ওজর-আপত্তি না করে খুশি মনে আট আনা পয়সা দেয় তাকে।

অফিসের কাছেই গুদোম। অফিসের চারিদিকেই প্রশস্ত বারান্দা আর তার সমস্ত দিকটাই বারমেসে ফুল লতাপাতায় ভরতি। ফুল লতাপাতার মাঝে মাঝে লোক চলাচলের সরু পথ। অফিস ঘরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পুর্ব এই তিনটি দিকই কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আর উত্তরে তো মস্ত বড় গুদোম। উত্তর দিক ছাড়া আর তিন দিকেই বেড়ার পর সাদা কালো লাল নীল কুচি পাথরে মোড়া রাস্তা। অফিস আর গুদোমের মাঝখানে পশ্চিমের বেড়াঘেঁষা একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ।

দুপুরবেলাতে বারান্দাগুলো একরকম নিঝুম থাকে বললেই হয় কিন্তু বিকেল হতে না হতেই লোকে গিজগিজ করে। মুন্সী, কামদারী, চাপরাসী, সর্দার, মজুর অনেকেই জমা হয় ম্যানেজারের কাছে হুকুম, বিচার ও অভিযোগের জন্যে।

ভাওনাথেরা প্রথম যেদিন অফিস যায় সেদিন আরো ভিড় জমেছিল অফিসে। মুন্সী, কামদারী, চাপরাসী, সর্দার তো এসেই ছিল এছাড়া বাগানের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ জমা হয়েছিল। অফিসের চারদিকের বারান্দায় লোক ধরেনি তাই কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে এবং ফুলবাগিচার সরু রাস্তাগুলিতেও তারা ছড়িয়ে পড়ে। ভাওনাথের কেমন একটু ভয় ভয় লেগেছিল এত লোক দেখে, যখন রাস্তা দিয়ে অফিসমুখো আসছিল তারা। দেখতে পায় দলে দলে মেয়েপুরুষ ছেলে বুড়ো ছুটেছে অফিসপানে আবার অনেকে ফিরছে অফিস থেকে মন্থর গতিতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা কইতে কইতে, হিসাব করতে করতে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু টাকা পয়সা। ভাওনাথের ভয় ভাঙে জউরুর কথায়। জউরু লেংড়াকে বললো—তলবকা দিন আহে।

অফিসে গিয়ে জউরু প্রথমে ওদের নিয়ে যায় বড়বাবুর কাছে।

তখন বড়বাবু ছিলেন পিনাকবাবু। নিরঞ্জনবাবু তখনো আসেননি। তিনি আসেন এর চারবছর পরে।

টি. ডি! এলের পিওন যে ওদের সঙ্গে করে এনেছিল সেও গিয়েছিল অফিসে। সে একটা সেলাম ঠুকে ছুটো কাগজ পিনাকবাবুর হাতে দেয়। পিনাকবাবু সেই ছুটো হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বড়সাহেবের কামরায় ঢুকে তাতে তাঁর সই নেন। বড়সাহেব প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাবির তোড়া বের করে তাঁর কাছে দিলেন। পিনাকবাবু পাকা দেওয়ালের গায়ে ফিট করা একটা সিন্দুক থেকে কিছু টাকা বের করেন। বড়সাহেব কি যেন লিখলেন একটা মোটা খাতায়। একটু বাদেই ভাওনাথ বুঝতে পারে যে ঐ টাকাগুলো তাদের দেওয়ার জন্যেই বের করা হয়েছে এবং ওটাকে সেটলিং বোনাস বলে।

এর আগে ভাওনাথ কখনো সাহেব দেখেনি। সাহেবের গায়ের রং ও বিরাট সুস্থ সবল দেহ দেখে অবাক হয় সে। এখানে আসার আগে অনেকবার এঁদের কথা শুনেছে আর আজ চোখে দেখে মুগ্ধনেত্রে অপলক চেয়ে থাকে। সত্যিই সাহেবরা কী সুন্দর! সত্যিই এঁরা খুব ভাল লোক! এমন চেহারার লোক কি খারাপ হতে পারে। এঁদের সম্বন্ধে দেশে থাকাকালীন যা শুনেছে তা সবই সত্য। দেশের লোকে বলে সাহেব দেখতে পাওয়া বহু পুণ্যের ফল। একথা ঠিক। কোলার কথা মনে হয় আবার।

পিনাকবাবু সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে তাদের নাম ধরে ধরে ডেকে ওদের নিজ নিজ হাতে প্রাপ্য টাকা ছুটো দেন।

অফিস থেকে পুবে ছু'শো সওয়া ছু'শো গজ দূরে মাল গুদোম। সেখানে থাকে যত সব প্রয়োজনীয় মালমশলা লোহালক্কড়। বড়বাবু চিঠির মত এক টুকরো কাগজ সর্দারের হাতে দিয়ে সেখানে নিয়ে মালবাবুর নিকট সেটা দিতে বলেন। তাঁকে কাগজের টুকরোটা দিতেই একটা লোহার কড়াই আর লেংড়াকে একটা ফাড়ুয়া, সুখনী ও তাকে দেন ছোট একটা একটা থালি ফাড়ুয়া।

ভাওনাথের মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। সে দেখতে পায়

তার চেয়েও অনেক ছোট ছেলেমেয়ে মুঠো ভরতি তলব নিচ্ছে সাহেববাবুর কাছ থেকে। একজন বাবু একটা খাতা দেখে নাম আর পাওনা টাকার অঙ্ক হাঁকছে আর সাহেব গুনে গুনে টাকা দিচ্ছে। ওঁদের সামনে একটা টেবিল, তার ওপর টাকা, আটআনি, চারআনি, দু'আনি, একআনি, ডবলপয়সা, পয়সা সব পৃথক পৃথক স্তবকে সাজানো। আরো অনেক টাকাপয়সা সিকি দু'আনি বাদামী রঙের কাগজে মোড়া ঐ টেবিলটার ওপর একটা কাঠের ট্রেতে রয়েছে। খোলা টাকাপয়সাগুলো ফুরিয়ে গেলেই ঐ বাণ্ডিলগুলো খুলে আবার শূন্যস্থান পূরণ করে দিচ্ছে একজন চৌকিদার।

এরমাঝে একফাঁকে ভাওনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নানা দেশের নানাভাষী নানা চেহারার লোক। নেপালী, ভুটিয়া, গারো, মেচ, সাঁওতাল, মাদ্রাজী, বিলাসপুরী, নাগপুরী। এদের মধ্যে তাদের দেশের লোকও অনেক আছে কিন্তু তাদের আর এখন চেনা যায় না। তারা তাদের ভোল বদলিয়েছে। পরনে ধরণে কথাবার্তায়। তারা যেন এখন ভিন্ন দেশের লোক। একটা নতুন আলোকে আলোকিত। বেশ খুশি খুশি ভাব, চোখেমুখে একটা গৌরবের দীপ্তি। কাউকে কাউকে বেশ ভাল লাগলো ভাওনাথের আবার অনেককে যেন কেমন কুটিল অহঙ্কারী বলে মনে হলো। ওদের দেখে কেউ হাসছে, কানাকানি করছে আবার কেউ মুখ বেঁকিয়ে চোখ দুটো অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কেমন যেন একটা ঘৃণা ও বিদ্রূপের ভাব। আবার অনেকে তাদের দিকে নিষ্পলক চেয়ে কি যেন ভাবছে, দেখছে, দু'একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এদের চোখেমুখে যেন দয়া, করুণা ও দাক্ষিণ্যের প্রসাদ ভরা।

এরপর ওরা সর্দারের সঙ্গে তার ঘরে ফিরে যায়। সেখানে থাকতে হয় তাদের পুরো তিন দিন তিন রাত্রি। নিজেরা ঘর পায় চারদিনের দিন। ছোট একটা সেই খড়জঙ্গল দিয়ে তৈরী ঘর। আঠারো ফুট লম্বা আর বারো ফুট চওড়া। বেশি উঁচু নয়। ঘরের মাঝখানের তিনটি খুঁটি শুধু বারো ফুট আর দু'পাশের সমস্ত খুঁটিই সাত আট ফুটের। এ থেকে আবার এক ফুটের

ওপর [illegible] পোঁতা হয়েছে। সোজা হয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে মাথা আর ঘরের চালে ঠোকাঠুকি হয়ে রক্তপাত হয়। মেটে পোঁতা। মাটি থেকে নয় দশ ইঞ্চি কি বড় জোর এক ফুট উঁচু। হাওয়া বাতাস ঢোকেনা একটুও। জানালার বালাই নাই। নামমাত্র একটা দরজা। সেটাকে ঠিক দরজা বলা চলে না। বাঁশের বাতা দিয়ে খড়ের তৈরি। ছাউনি ও বেড়া খড়ের। খড় ঠিক নয়—খাগড়া। লাইনের গরুগুলো সুযোগ পেলেই ঐ খড়গুলো খেয়ে জায়গায় জায়গায় ফাঁক করে দেয়। এতেও ওদের মনে অপার আনন্দ, উৎসাহ ও আশা। ওরা বাপেবেটায় মিলে নিকটের জঙ্গল থেকে খড়কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে ঘরটিকে যতটুকু সম্ভব পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। সুখনীর দানও তাতে অনেক। সে রাস্তা থেকে গোবর কুড়িয়ে নিয়ে এসে বেড়াতে গোবরমাটি লেপে দেয় হালকা করে। অল্প দিনের মধ্যেই ওরা বেশ করে গুছিয়ে নেয় ওদের ছোট্ট সংসারটি।

দুই

সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে একটানা। কেউ তাকে রুখতে পারে নি পারবেও না কোনদিন। সময়ের স্রোতের পলিমাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস। সে ইতিহাস মাটির, মানুষের, তার পথ চলার।

সময়ের ইতিহাস রচয়িতা হচ্ছেন মহাকাল, সময়কে চিহ্নিত করে ইতিহাস রচনা করেছে মানুষ।

এই পাহাড় বন জঙ্গলের দেশের ছিল না আজকের এই ইতিহাস। এ দেশ ছিল পাহাড় জঙ্গল ঘেরা একখণ্ড অরণ্যভুমি। সভ্যতার প্রথম পদক্ষেপ হয় এখানে প্রায় দু'শো বছর আগে। তখন এখানে বাস করতো কয়েক জাতীয় আরণ্যক মানুষ। তাদের উপজীবিকা ছিল অরণ্যের পশু শিকার আর অল্প কিছু ক্ষেত খামারের কাজ। এদের বলা হতো মেচ, কোচ, গারো, টোটা। মেচ গারো ও টোটারা এখনো অনেকে বাগানের উপকণ্ঠে বসবাস ও চাষ আবাদ করে আবার যখন নিজেদের ক্ষেতের কাজ থাকে না তখন বাগানের কাজ করে। কুচবিহারের নামটা তো কোচ থেকে হয়েছে। ঐ সময়ে এই জায়গার বিশেষ কোন নাম ছিল না। শুধু মেচপাড়া, কোচপাড়া, গারোপাড়া, টোটাপাড়া বলতো ওরা। যেখানে মেচেরা, গারোরা কিম্বা টোটারা থাকতো সেখানে কোচ থাকতো না, আবার যেখানে কোচেরা থাকতো সেখানে মেচে, গারো, টোটারা থাকতো না। ওরা এক এক জাতি দল বেঁধে থাকতো এক এক জায়গায়। তাই মেচপাড়া টোটাপাড়া নামে এখনো জায়গা আছে এর কাছাকাছি।

দলমাননগর নামটি হলো দলমান তামাং সর্দারের নাম থেকে। দলমান একদিন ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসে এখানে একটি শিকারের পিছু পিছু। এখানে এসে অনেক শিকার পেয়ে এই বনজঙ্গলেই রয়ে যায় তার লোকজন নিয়ে। মেচ, কোচ, গারো, টোটারা ছিল অত্যন্ত ভীরু। ভুটিয়াদের গন্ধ পেয়েই ওরা ছুটে

পালায় অন্য বনে। দলমান তামাং জাঁকিয়ে বসে জায়গাটিকে দলমান বস্তি নাম দিয়ে। এরপর আসে ইংরেজ। তারা এখানকার জমি কিনে নিয়ে চায়ের চাষ শুরু করে দেয়। বাগানের নাম দেয় দলমাননগর।

তারপর বনজঙ্গল কেটে তৈরি হলো ঘরবাড়ি। এলো কত লোক, হলো চায়ের চাষ। পাহাড় ভেদ করে বনের বুক চিরে তৈরি হলো ছোট বড় কত সড়ক রাস্তা—রেল লাইন। কত মজুর দিল কতো রক্ত, কতো জীবন। বাঘ ভালুক হাতি শূয়ারের শিকার হলো অনেকে, জ্বলে পুড়ে মরলো বিষাক্ত সাপের বিষে। তৈরি করলো একতালা, দোতালা, তেতালা কতো গুদোম। তাতে বসালো কতো ইঞ্জিন, বয়লার পাতিকাটা পাতিমলাই, চা শুকানো আরো কত শর্টিং প্যাকিং মেসিন। বয়লারের জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরলো কত জন, গুদোমের চাল থেকে, মাচান থেকে পড়ে মরলো কতো লোক—হাত ভাঙলো, পা ভাঙলো, বুকের পাঁজর ভাঙলো অন্ধ হলো আরো কত জন। আজো তাদের সেই শক্ত হাড় এ-মাটিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজো তাদের রক্তের বীজাণু কিলবিল করছে মাটির মধ্যে। কেন? কি জন্য? কাদের জন্য? দুর ভবিষ্যতের আলো দেখতে পেয়েছিল তারা। পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্য উঠছে।

এ শুধু হয়েছে পেটের তাড়নায়, টাকার জোরে। টাকার লোভ দেখিয়ে, কড়া হুকুম ঝেড়ে। এই শক্তিশালী লোকগুলো নিজেদের রক্ত জল করে যা দিল তার মূল্য কম নয়। কিন্তু কাকে দিল? কে নিয়েছে সেই সম্পদ, বৈভব?

বনের হিংস্রতা ক্রমে লুপ্ত হলো; কিন্তু মানুষের হিংস্রতা আরো বাড়লো, বাড়লো লোভ, পিপাসা, মৃত্যু, জীঘাংসা। পাহাড় আরো উঁচু হলো তাজা রক্ত খেয়ে খেয়ে। নিরেট পাহাড়। নির্ভেজাল। শুধু পাথর আর পাথর, মাটির লেশমাত্র নেই তাতে। দিনে আগুনে বাতাস আর রাতে হিমের কনকনানি।

দলমাননগর বাগানটির উত্তরে, দুই মাইল দুরে সন্তোলা টি-স্টেট। আগে এটা ছিল একটা কমলা বাগান। ইংরেজরা যখন ঐখানে চায়ের চাষ করলেন সেই নাম থেকেই নাম দিলে সন্তোলা টি-স্টেট।

এর গায়ে শৈল তরঙ্গমালা। একটার পর আর একটা পাহাড় উঠে উঠে আকাশ ছুঁয়েছে অনতিদূরে। পাহাড়টির নাম কমলা পাহাড়। এ নাম যে কে এবং কবে দিয়েছে তার হদিশ নেই তবে অনুমান হয় পাহাড়ের নিচেতেই ছিল কমলাবাগান। শীতকালে কমলা পাকলে দূর থেকে পাহাড়ের তলদেশটা কমলা রঙের দেখা যেত হয়ত তাই থেকে এই নাম। দক্ষিণে জীবনপুর চা বাগান, তারপর কালচিনি, ডিমা, চিনসুলা, গাঙ্গুটিয়া, শালবাড়ি আরো কত চা বাগান এবং রিজার্ভ ফরেস্ট শেষে রাজাভাতখাওয়া, দমনপুর, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার। পশ্চিমে বাগানের মধ্যেই হ্যামিল্টনগঞ্জ স্টেশন তারপর চিরযৌবনা তুরষা নদী।

আজ নয় দশ বছর আগে এই দলমাননগরে নিরঞ্জনবাবু আসেন চাকরি নিয়ে। ভাওনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে সেই দিনই। সে গাড়িম্যানের কাজ করতো তখন। সে সময়ে গরু ভইসার গাড়ি ছাড়া আর অন্য কোনো যানবাহন ছিল না। স্টেশনও তখন ছিল না এখানে। স্টেশন ছিল রাজাভাতখাওয়ায়। সেখানে যেতে হলে শুধু বন আর নদী পার হতে হতো। কালজানি, ডিমা, বাসরার কী দুরন্ত স্রোত! এই শুকনো খাঁ খাঁ করছে পরক্ষণেই জলে থৈ থৈ। এর কাছে বাতাসও হার মানে। পাহাড় থেকে কী তীব্রবেগে নেমে আসে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কত গরু ভইসার গাড়ি যে কোথায় ভেসে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই তাই এখনো সকলে পার হওয়ার আগে ডিমা নদীতে পা দিয়েই তাকে প্রণাম করে তবে গাড়ি নামায়। কতো লোক, মালপত্তরও নিখোঁজ হয়েছে। নিরঞ্জনবাবুকে ভাওনাথই তার ভইসা গাড়িতে নিয়ে এসেছিল বাগানে।

এ দেশে পাহাড়ী জ্বরের ভয়ে লোকজন আসতো না তখন। এই শালবনের মধ্যেই নাকি যম থাকতেন। শালের ফুল ফুটতো আষাঢ়ে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হতো অসুখ বিসুখ তারপর মড়ক।

রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে ছিল আর. এন. সা কোম্পানীর একটা বড় মনিহারী দোকান। শুধু মনিহারী বললে উপযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয় না বরং 'হোয়াট নট' বলা ভাল। সাহেবেরা তাদের

যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তর কিনতো ঐ দোকান থেকে। আর. এন. সা কোম্পানী যে কেবলমাত্র টিনের খাবার আর প্রসাধন জিনিস সরবরাহ করতো তা নয়। প্রয়োজনবোধে বাগানের ম্যানেজারেরা তাদের কাছেই ধরনা দিতেন এটা ওটা সেটার জন্তে। কেরানী, বেয়ারা, বাবুর্চি, মশালচি, খিদমতগার সব কিছুই সরবরাহ করতো তারা। আর শুধুই কি এই সব? এছাড়া ওরা জোগাতো আরো অনেক মানুষ, যারা ওদের নির্জন ঠাণ্ডা ঠোঁটে প্রাণকণা ফুটিয়ে তুলতো! কোম্পানীর ম্যানেজার লোক সংগ্রহ করে খবর দিত বাগানের সাহেবকে তারপর তিনি গাড়ি পাঠাতেন। নিরঞ্জনবাবুর বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছিল।

ঐ যে বড় সড়কের চৌমাথার ওপরের বুড়ো অশ্বথ ওর যে বয়স কত তা কেউ বলতে পারে না। ঝুরি নামতে নামতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিয়েছে। দূর থেকে সেগুলো দেখলে একটা একটা স্বতন্ত্র গাছ বলে ভ্রম হয়। অনেক আগের বুড়োরা যাঁরা বেঁচেছিলেন তখন, তারা বলতেন ঐ গাছটিকে নাকি ওরা অমনিই দেখেছেন তবে এখনকার মতো অজস্র ঝুরি নামেনি তখন। আবার এঁদের আগের বুড়োরা বলতেন—আরে ভাই, ঐ বটগাছটির কথা আর বলো না, ও যে কবেকার কেউ বলতে পারেনি!

মানুষ সব ভুলে যায়, মাটি ভোলে না। সকলের সমস্ত স্বাক্ষরই তার বুকে অঙ্কিত থেকে যায়। বীজ থেকে অঙ্কুর তারপর গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ আবার অঙ্কুর। এই বুড়ো বটগাছ তার প্রতীক। সে ইতিহাস রচনা করছে কত যুগ যুগ ধরে—রক্ত মাংস হাড়ের ইতিহাস। ঐ বটগাছের চারিপাশে যেখানে আজ দোকানপসার ওখানটা আগে ছিল খড়জঙ্গল ও জঙ্গলি বাঁশের ঝাড়ে ভরতি।

ঐ যে বটগাছটির লাগোয়া দক্ষিণে যেখানে একটা দোতলা মস্ত বড় ঘর। টিনের ছাউনি, কাঠের দেওয়াল, সানবাঁধা মেঝে ওখানে ছিল একটা ছোট্ট বারো ফুট লম্বা আর আট ফুট চওড়া মেটে ঘর। ওটা এখনও গদিখানা, আগেও তাই ছিল। কত পরিবর্তন?

দিনের পর দিন যেন এগিয়ে চলেছে। মানুষও। আগেকার সেই রূপকথার মত মানুষে আর গাছের বাকল পরে না, গাছতলায় কি গাছের খোড়লে বাস করে না, বন্য পশুপক্ষীর মাংস খেয়ে উদর পূরণ করে না। এখন তারা জানতে পেরেছে তারা কি এবং কি চায়?

এই ঘরে দিনের কত গ্লানি ধুয়েমুছে ফেলতো শ্রমিকেরা। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতো, রক্ত জলকরা পয়সার সদ্ব্যবহার করতো। এই তো ছিল তাদের জীবন। এই জীবন নিয়েই তারা চলেছে যুগের পর যুগ। আর বাংলোতে আরামকেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় থেকে মালিকেরা দূরবীক্ষণ দিয়ে এ-সব দেখতো আর আড়চোখে চেয়ে জয়ের হাসি হাসতো। আর হাসতো ঐ ঢাকের মত পেটওয়ালা বুড়ো লোকটি—রামপ্রসাদ কালোয়ার। আগে কি ওর ভুঁড়ি ছিল ছাই? লোকটি ছিল একটা শুকনো পাতখড়ি। দোকানের মধ্যে কি ছোটাছুটিই না করতো? আর লোকগুলো নেশায় মেতে উঠলে তো কথাই ছিল না। ঘরের কোণে উত্তরে থাকতো হু'টো বড় বড় মেটে জলের জালা। যখন যখন সেই দিকে যেত আর ঐ ছিনে সরু ছিপছিপে লোকটি কী চীৎকারই না করে উঠতো। ওরে, জল নিয়ে আয় জলদি। একটু যদি নজর থাকে তোদের? হাবা শুয়োর কোথাকার।

চৌরাস্তার লাগোয়া পশ্চিমে ঐ যে পাকা বাড়িটা, ওটা পোস্টঅফিস। আগে কি ছাতু পোস্টঅফিস ছিল এ গেরদে কোথাও? ডাকঘর ছিল আলিপুরদুয়ারে। চিঠি পাওয়া যেত সপ্তাহে একদিন। বাগানের পিওন গিয়ে চিঠিপত্তর দিয়ে আর নিয়ে আসতো। ঐ দিন বাগানের হুণ্ডিও নিয়ে আসা হতো। একটা হাতী ছিল বাগানে। সেটায় চড়ে পিওন যেত আর সঙ্গে থাকতো ছোটসাহেব বন্দুক নিয়ে। এরপর সারিবাঁধা ঐ যে ছোট ছোট মেটে বারো হাত লম্বা আট হাত চওড়া ঘর ওগুলো মজুরদের বাড়ি। ঐ একই ঘরে রান্নাবান্না থাকাখাওয়া সব। লোকও থাকে পাঁচ ছয় জন। এ-ছাড়া শীতকালে বর্ষার জন্য লক্‌ড়িও সংগ্রহ করে রাখতে হয় তাতে। এ-ঘর অবশ্য কোম্পানী থেকেই

পাওয়া। কোন কোন ঘরের একপাশে ঐ যে ছোট্ট একটা খুপরি হাত চার পাঁচ লম্বা, আড়াই কি তিন হাত চওড়া আর হাত পাঁচেক উঁচু ওটাতে থাকে গরুবাছুর, ছাগল শুয়োর। খড় কাঠ খুঁটি পাবে কোথায়। তাই গাছের ডালপাতা দিয়েই ওগুলো তৈরি করে নিয়েছে নিজেরা। হাঁস মুরগীও কারো কারো আছে সেগুলো তো শীতকালে ঘরের চালে থাকে আর বর্ষায় সন্ধ্যার আগেই ঐ ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়। এরপর বাবুদের বাসা তারপর অফিস, গুদোম, দাওইখানা। দাওইখানা ওতো নামকা অস্তে। শুধু তিতে জল ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুবে বাজার। ঐ যে পশ্চিম কোণে বড় বড় কয়েকখানি টিনের ঘর—ওগুলো মাড়োয়ারী গিরিধারীলালের। গিরিধারীলাল এসেছিল শুধু ঘটি কম্বল হাতে। রক্তচোষা গিরগিটির মত চেহারা, মাথাটি মোটা, দেহ সরু। মাথা নেড়ে নেড়ে অনেক রক্ত খেয়েছে সে। গিরিধারীলালের দোকানের পরে গভীর বন আর তার নীরব ভয়ার্ত হিংস্রতা। রাতে মাটির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে আসে বনপশুর বিকট চীৎকার। বনের বুকে বাসরা নদী। তারপর পাহাড় আর পাহাড়। শেষে অনেক পাহাড়, আর প্রথমে রায়ডাক পরে সঙ্কোশ নদী পার হয়ে আসাম।

ঠিক বটগাছটির তলাতে লতাপাতার একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে থাকতো সাধু। লোকে তাকে সাধু বলেই জানতো তবে তার আসল নাম ছিল সীতারাম। ছোটখাটো কালো পাহাড়ের মত লোকটি, চোখ দুটো বড় বড়, বড় বড় দাড়ি গোঁফ, চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, পরনে রক্তবস্ত্র আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলে মনে হতো কাপালিক। আবার মিহি মিষ্টি কথা শুনলে সে ভুল ভেঙে যেত। প্রথমে সকলেই মনে করতো গোয়েন্দা। তাই তার কাছে ঘেঁষতো না কেউ।

সেই সময়ে সবেমাত্র জায়গা পরিষ্কার করে চায়ের আবাদ শুরু হয়েছে। মজুরেরা কাজ করতো কাছে কিনারায়, রোদের উত্তাপে পরিশ্রান্ত হলে এই গাছের শীতল হাওয়াই ছিল তাদের প্রাণ। এখানে বসে বিশ্রাম করতো, খইনি খেতো, নিজেদের সুখদুঃখের

কথা হতো। টোকা কেনার পয়সা অনেকেরই ছিল না—বিনা ছাতাতে বৃষ্টির জলে ভিজে, রোদে পুড়ে কাজ করতো। বৃষ্টিকে, দুর্যোগকে তারা কোনো আমলই দিতো না। কিন্তু কাল বৈশাখীর শিলাবৃষ্টির ভয়ে ঐ গাছের নিচেই তাদের আশ্রয় নিতে হতো। সাধু আসার সঙ্গে সঙ্গে সে-সব বন্ধ হয়ে যায়। বাগানের অলিগলি বনেজঙ্গলে কানাঘুষি চলতে থাকে। যাহোক দুটো পয়সা রোজগার করে একবেলা নুন ভাত খাচ্ছিল, এবারে তা হয়ত শিকেয় উঠবে।

এই ঘটনা ঘটে ডবসন্ সাহেবের আমলে। তিনি খবর পেয়ে চিলের মত উড়ে এলেন মোটরে। সকলেই প্রমাদ গণলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সাধুর মুখের নরম মিষ্টি বাণী শুনে তাঁর উদ্ধত চাবুক হাতেতেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

সাধু বললে—সাব্, হামি বাগানে থাকলে আপনার বাগানের উন্নতি হোবে আপ্ আরো বড় হোবে। কালী মাইকার নাম শুনেছেন সাব্—হামি তাঁর পুজা করবে।

ডবসন্ সাহেবের বিশ্বাস হয়েছিল সাধুর কথাগুলো। তিনি বাগানে আসতেই সেই বুড়ো বড় বাবু পিনাকবাবু তাঁকে কালীঘাটের কালীমাতার মাহাত্ম্য বলেছিলেন। কত ব্যবসাদার কালীমায়ের পুজো দিয়ে কত উন্নতি করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা, পরমহংসের কথাও শুনিয়েছিলেন।

স্বামীজির কথা ডবসন্ আগেই বিলেতে শুনেছেন তাই অনেক সংশয় দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মনে মনে মেনে নেন।

এরপর অনেকদিন বাদে সাধুকে বাগান ছেড়ে যেতে হয়। আগুনের হাওয়ায় বটগাছের পাতা পুড়ে ঝরে পড়ে মাটিতে, উড়ে যায় জানা অজানা অনেক জায়গায়। গাছ কিন্তু মরেনি তাতে। সাধুর রক্ত আর শিষ্যদের অশ্রুতে বটগাছের মাটি ভিজলো—আবার পাতা গজালো।

তিন

ভাওনাথের কাজে হাতে খড়ি হয় একটা নতুন আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। প্রথম দিনেই সেই ছোট্ট থালি ফাড়ুয়াখানি নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাগানে যায়। প্রথম প্রথম কাজটা কেমন দুরূহ শক্ত বলেই মনে হয়েছিল তার তবুও এরমধ্যে একটা নতুন স্বাদ ও বড় হওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল তাই যত কঠিন কাজই হোক না কেন অল্পদিনের মধ্যেই সে সব কাজ তার কাছে সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। প্রথম সপ্তাহটা বড় যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল—গা ব্যথা, মাথাধরা তারপর দুর্দান্ত পাহাড়ী জ্বর। সে জ্বর কি বন্ধ হয়? সমানে দু'দিন দু'রাত্রি প্রলাপ বকে শেষে তিনদিনের মাথায় প্রবল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এখন আর গা-ব্যথা হয় না, মাথা ধরে না। অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, নিজের ধাতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে দেখে গর্ব অনুভব করে মনে মনে। কাজ করতে করতে এখন আর আগের মত জবুথবু হয়ে পড়ে না, পরিশ্রান্ত হয়ে থেকে থেকে হাই ছাড়ে না, চোখ দুটোও ঝিমিয়ে আসে না। এখন নিজেকে একটা নতুন ছাঁচে তৈরি করে নিয়েছে। আজকাল অবিরাম, অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করে যায় যন্ত্রের মত।

এক বছরের মধ্যেই কাজেকর্মে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সর্দার কামদারী, চাপরাসী ও মুন্সীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের প্রীতিভাজন হয়।

সকলেই তার কাজে খুশি। ফাঁকি নেই—আন্তরিকতা আছে ষোল আনা। সমস্ত কাজটাকেই সে নিজের কাজ বলে মনে করে তাই কামদারী, সর্দার চাপরাসীরা সন্তুষ্ট হয়ে ছোট সাহেবের কাছে তাকে মরদের কাজে উন্নীত করার জন্যে অনুরোধ জানায়। বড় সাহেব ছোট সাহেবের কথা মেনে নেন। সেই থেকে অপরিণত বয়সেই মরদের কাজ করতে থাকে ভাওনাথ। এও তার পক্ষে একটা গর্ব।

এরমধ্যে সে দেখতে পায়—চা কামান শহর বা গ্রামের বিভিন্ন

ধারাতে নিবদ্ধ নয়। এর ধারা স্বতন্ত্র। এখানকার প্রত্যেকের জীবনযাত্রা শুধু একটামাত্র ছন্দে বাঁধা এবং সকলকেই কামানের নির্দেশ অনুযায়ী চলাফেরা, কাজকর্ম করতে হয়। বয়স বাড়ে সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বাড়ে। চোখের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। এরকম জীবনযাত্রায় যেন সুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবন তো নয় যেন একটা যন্ত্র।

সকালে যখন কাজে যায় মজুররা তার অনেক আগেই বুধু এসে তার পান বিড়ি সিগ্রেটের দোকান খুলে বসে। দু'একজন কুলি কামিন তো বুধুর দোকান খোলার আগেই এসে বসে থাকে। তাদের লোভ একটা বিড়ি কিম্বা সিগারেটের ওপর। কারণ এই কুলিকামিনীদের মধ্যে কেউ না কেউ তার দোকানের সামনেটা ঝাড়ু দেয় যার বিনিময়ে একটা বিড়ি অথবা সিগ্রেট পায়।

সকালে সিটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে বুধুর তৎপরতাও বেড়ে যায়। জড়তামাখা ঘুমের চোখেও উজ্জ্বল, মুখর দেখা যায় তাকে। তরল হাসি-ঠাট্টা-বটকেরার ঢেউ খেলতে থাকে। অন্যদিকে কাজ চলছে, বটগাছ তলায় দোকান। সারা রাতদিন ধরে ঝরা মরা পাতাপুতি পড়ে, কাক চিল বকগুলো বাহ্যিপ্রস্রাব করে। বসার তেলচিটে বেঞ্চখানা ময়লাতে সাদা কালো রঙে রঞ্জিত হয়। সেটাকেও পরিষ্কার করিয়ে নেয় ওদের দিয়ে তা না হলে খদ্দের লক্ষীরা বসবে কোথায়? মাঝে মাঝে পথের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ধরে, মনের মধ্যে স্বপ্নের বিচিত্র ছবি আঁকতে থাকে।

লেংড়া ও সুখনীর বুক স্ফীত হয়ে ওঠে সরস কলাগাছের মত তাদের প্রিয়তম পুত্রের কৃতিত্বতে। ওদের মনে বসন্তের দোল দেয়, বিচিত্র ফুলে, গন্ধে, রঙে মন ভরে ওঠে। ভাওনাথের চোখেও বিচিত্র দীপ্তির সমাবেশ। সেই আলোকে সে দেখতে পায় বহু দূর, বহু দেশ, অনেক মানুষের জীবন বৈচিত্র্য ও তাদের মন।

বাগানে মরদের কাজ করতে করতে প্রয়োজনবোধে যখন রাত্রে গুদোমে কাজ করার জন্যে লোকের দরকার হয় সে সেখানেও কাজ করে। গুদোমের সর্দারবাবুরাও খুশি হয় তার কাজকর্মে। এ নিয়ে রাস্তাঘাটে আলোচনাও হয়।

গুদোমের বাবু সর্দারদের যেরকম নকনজর ভাওনাথের ওপর তা দেখে বাগানের মুন্সী চাপরাসীরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা ভাবল, হয়ত শেষ পর্যন্ত এইরকম একজন কর্মী বেহাত হয়ে যাবে তাই তারা ছোটসাহেবের কাছে সুপারিশ করে যাতে তাকে কামদারী করে নেওয়া হয়।

এই দফাদারের কাজে থাকে সে একবছর। এ কাজ তার আদৌ পছন্দ হয়নি। এ যেন কেমন একটা অলস, অসাড় জীবনী শক্তিহীন কাজ, এতে শক্তি হারিয়ে ফেলে মানুষে। তারপর নিরীহ গোবেচারা কুলিদের ওপর হুকুম চালান, অকারণে গালাগাল দেওয়া এ যেন সে তার ধাতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এ কাজ সে চায় না। কাজ ছেড়ে দেয়।

বাবা ও মায়ের খুব গর্ব হয়েছিল ছেলে দফাদার হয়েছে দেখে। দফাদারী ছেড়ে দেওয়াতে তারা রীতিমত রুষ্ট হয় তার ওপরে। কারণ চৌকিদারী, দফাদারী পাওয়া তখনকার দিনে এতো সোজা ছিল না।

এই সময়ে ভাওনাথের একটি বন্ধু জোটে। নাম, বড়কা। কাজ করে গুদোমে—রোলিং মেসিনে। বড়কাই গুদোমবাবুকে বলে একটা কাজ জুটিয়ে দেয় তাকে। রঙ ঘরের কাজ। রং ঘর থেকে রং বয়ে নিয়ে আসতে হয় শুকলাই ঘরে। এ-কাজে তেমন কিছু মগজের প্রয়োজন নেই—এ শুধু ধোপার কাপড়জামার বোঝা বহন করার গাধার কাজ। কেবলমাত্র গায়ের মেহনত লাগে। এই অমানুষিক পরিশ্রমে গায়ের রক্ত ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসে। শক্তিক্ষয় হয়। সারাদেহ ঘামে জবজবে। রংয়ের ভারে মাংসপেশিল দেহের গিঁটগুলো ফট ফট করে বেজে ওঠে। হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কাজ করে। একটু বসবার জো নেই। বসলেই বাবু সর্দারদের হুমকি, অকথ্য গালি-গালাজ মাবোন ভুলে। তাদের যেন মা বোন নেই—মা বোনের মর্যাদাও বোঝে না। ভাওনাথের দেহ ছিল নিরেট প্রস্তর খণ্ডের মত শক্ত, জীবনীশক্তিভরা তাই নিজের নির্ধারিত কর্ম ছাড়াও ওভারটাইম করে সে। অল্পকালের মধ্যে এ কাজেও বেশ সুনাম অর্জন করে ভাওনাথ। আবার এর ফাঁকে

ফাঁকে ঘানী ও শুকলাইয়ের কাজও দেখেশুনে অনেকটা শিখে নিয়েছে। হাতে কলমে অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি তবে দু'একজন সঙ্গীকে কখন কখন একটু আধটু সাহায্য করেছে।

নিজের কাজ সেরে প্রতিদিনই সে তার বন্ধু বড়কার জন্য অপেক্ষা করতো। বড়কা তার মত দ্রুত কাজ করতে পারে না। তাই মাঝে মধ্যে তার কাজে সাহায্য করতো সে। এমনি করে সে রোংলিএর কাজও অনেকটা আয়ত্ব করে। আগে তো রোলিং মেসিনে হাত গলিয়ে দিতে ভয় খেত। এখন আর ভয় পায় না। মেসিনের সুর তাল ছন্দের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অনায়াসেই কাজ করে যায়। হাতে কাজ, মুখে কথার তুবড়ি তবু একটুও অসাবধানতা নেই। এই দেখে গুদোমবাবু শেষ পর্যন্ত তাকে রোলিংএ নিয়ে এলেন। এ কাজেও সে তার দক্ষতার পরিচয় দেয়। সাথীসঙ্গীরা হিংসা করে মনে মনে। এই কাজ রং বয়ে আনার চেয়েতে অনেকটা হালকা বটে তবে একটু মাথা খাটাতে হয়। আর বিপদও আছে যথেষ্ট। একটু অসতর্ক হলেই হাত পা কেটে নুলো হয়ে যাবার ভয়। তাই একাজে একটু কায়দাকলম শিক্ষার আছে।

রাজমন এই কাজে তার গুরু হয়। সে নেপালী, মংগর। এই কাজ করছে সে দশ বছরের বেশি। সেই তাকে শিখিয়ে দেয় কেমন করে বেশ আঁটোসাঁটো করে পরণের ধুতিটা কোমরে জড়িয়ে নিতে হয়। একটুও যেন কোথাও আলগা না থাকে সেটা। ঘানিতে যদি কোনক্রমে কাপড়ের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ ঢোকে তাহলে কাপড় তো কাপড় তাকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে তার ক্ষুধিত জঠরে। এছাড়া আরো বিপদ আছে গ্যালারির দুধারের কাঠের ওপর কেমন করে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে, দেহ বাঁকাতে হবে আবার পা গলিয়ে দিয়ে কেমন করে পাতিগুলো ঘানিতে গেঁদে দিতে হবে।

গুদোম বলতে শুধু একটা ঘর নয়। বড় গুদোম বলতে বোঝায় ফ্যাক্টরী যেখানে নিচের তালাতে ইঞ্জিন, কলকারখানা, পাতি মলাই; পাতিকাটা, শুকলাই, চা চালাই চা ওজন ও প্যাকিং করা হয়। এই গুদোমটা তিনতালা। আর দুটো তালাতে কাঠের ফ্রেম করে লোহার তার বসানো সরলরেখার মত তাকের পর তাক।

সেই তাকগুলোতে বাগান থেকে পাতি এনে সেইগুলোকে বিছিয়ে দেওয়া হয় শুকোনোর জন্যে। যেখানে এই পাতি শুকোনো হয় তাকে বলে পাতিগুদোম বা নরম ঘর। এছাড়া এই বড় গুদোমের লাগোয়া আরো তিনটি বড় বড় নরম গুদোম আছে। এগুলোও তিনতালা। কিন্তু এগুলোর সমস্ত তালাগুলোতেই শুধু পাতি শুকোনো হয়। এখানে অন্য কোন কাজ হয় না। এই বড়গুদোমে ভাগ ভাগ করা অনেকগুলো ঘর। গুদোমের উত্তরের শেষপ্রান্তে পাতিমলাই বা রোলিং ঘর। এই ঘরের একপাশে পাতিকাটাইও হয়। এর দক্ষিণে শুকলাই ঘর। এই শুকলাই ঘরটির পুবে ইঞ্জিন, বয়লার ঘর আর পশ্চিমে চা চালনি ঘর। এই চা চালনি ঘরের একপাশে চা ওজন ও প্যাকিং হয়। রোলিং ঘর থেকে রঙ ঘর বেশি দূরে নয়। এ'দুটো ঘর কাছাকাছিই। কারণ পাতি মলাই শেষ হলে সেটাকে রঙ ঘরে দিতে হয়। রঙ ঘর অর্থাৎ ফার-মেণ্টেসন হাউস। রঙ ঘর থেকে মাল এনে আবার মলাই করা হয়। তারপর সেটা যায় শুকলাই ঘরে। আর সবশেষে সেখান থেকে মাল পাঠান হয় চালনি ঘরে, চালনি ঘরে ভিন্ন ভিন্ন তারের ফাঁক দিয়ে যে মালটা বের হয় তা থেকেই চায়ের গ্রেড্ বা কোয়ালিটি নির্ণয় হয়। গুদোমের কোন ঘরেই মেয়েদের করার মত কোন কাজ নেই। শুধু আছে এই চালনি ঘরটিতে। এখানে তারা চায়ের ডাণ্টি চুনাই করে।

মেন গেট দিয়ে প্রথম গুদোমে ঢুকতেই শুকলাই ঘর। তাই চালনি ঘর, রোলিং ঘর, ইঞ্জিন বয়লার ঘরে যেতে হলে শুকলাই ঘরের বুকের ওপর দিয়ে যেতে হবে।

রোলিংএ কাজ করবার সময়েই হঠাৎ শুকলাই সর্দার ফুলচাঁদ মারা যায়। তার কাজে বহাল হয় তারই সহকারী বিরং তামাং। বিরংএর পদটি খালি হয় এতে বড় গুদোমবাবু তাকে এনে সেই শূন্যস্থান পুরণ করেন। শুকলাই ঘরের কাজ বড় শক্ত। খুব শক্ত বা পরিশ্রমের নয় সত্য কিন্তু আগুনের তাওয়ার মুখে একটানা আট ঘণ্টা থেকে সারা দেহটা কেমন যেন অবশ, অলস, নিস্পৃহ ও ঝিমিয়ে পড়ে। এই টানাপড়েন, জীবন-মরণের মধ্যে থেকেও লোকগুলো

আনন্দ পায়। ভাওনাথও পেয়েছিল, শুকলাই আর চুনাই ঘরের মাঝে পার্টিশন দেয়ালের দুধারে দুটো বড় বড় দরজা। এই দরজা দুটোর ফাঁক দিয়ে শুকলাই আর চুনাই ঘরের লোকগুলো পরস্পরকে দেখতে পায়। শুকলাইয়ের জোয়ান জোয়ান মরদগুলো প্রতিদিনই প্রতিক্ষণে দেখতে পায় ভাদরের কুল ছাপানো জল ছলছলে দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে যুবতীরা চা থেকে ডান্টি বেছে পৃথক করে রাখে। ওদের সারা দেহ, কাপড়জামা সবই রক্তহীন ফিকে হলুদের গুড়ো মাখা। এগুলো চায়েরই গুড়ো ধুলো। ঘামে ভিজে দেহে ও কাপড়জামায় ওগুলো আঠার মত লেগে আছে। ঘাম আর চায়ের গন্ধ এই দুয়ে মিশে তাদের গা থেকে এক অপরূপ গন্ধ ভেসে আসে। পুরুষগুলো নাক টেনে টেনে সে গন্ধ শুকে, প্রাণটা অপুর্ব রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। তারা মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েরাও ফাঁকে ফাঁকে লজ্জার আড়ালে মাদকতার চোখে পুরুষগুলোর দিকে চায়। মরদগুলো নিস্পলক চেয়ে থাকে নেশা খোরের মত মেয়েদের ঐ কুলোর মত বিরাট বিস্তৃত নিতম্বের দিকে। উভয়ের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, ঠোঁটের ডগায় আবেদনের কত কথা ভেসে ওঠে। সারা দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা আকস্মিক কামনার উত্তাপ টঙ্কার দিয়ে ওঠে। হঠাৎ বাবু কি সর্দারের ধমকানিতে চমক ভাঙে তাদের।

ভাওনাথের বেলাতেও ঐরকম একটা ঘটনা ঘটে। সে শুকলাই ঘরে কাজ করতে করতেই একটা নতুন আস্বাদ পায় জীবনের। ঘাম আর চায়ের গন্ধ মাখা গন্ধ পায় নাকে। একটা নতুন অনুভূতিতে সমস্ত দেহটা মাতঙ্গের মত গর্জে ওঠে।

এরমধ্যে সিফ্‌টিং ও সর্টিং সর্দারের টি, বি হওয়াতে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে সে। তার পদটি খালি হয়। গুদোমবাবু তাকেই ঠিক করেন এই কাজের জন্যে। অনেকেই এ কাজ দিতে চেয়েছিলেন গুদোমবাবু কিন্তু ময়লা চায়ের ধুলোর মধ্যে চাকরি করে কামান সিংএর মত জীবন হারাতে রাজী হয়নি তারা। কামান-সিং কেশে কেশে রক্তবমন করে মারা যায়। একথা ভাওনাথও জানতো কিন্তু তাকে একটা নতুন নেশায় পেয়ে বসেছিল তাই সে গুদোমবাবুর একটা কথাতেই রাজী হয়।

এখন চা শিফটিং ও শর্টিং মেসিনের কাজ দেখাশুনা করে ভাওনাথ। এই মেসিনগুলোর গোড়াতেই পাঁচ ছয় রকম চায়ের ঢিপ। এই শিফটিং এবং শর্টিং মেসিনগুলোর পৃথক পৃথক গেজের অয়ার নেটিং দিয়েই বেরিয়েছে ঐ পিকো, সুশং, ফেনিং, ডাষ্ট, প্রভৃতি চাগুলো। মেসিনের বিভিন্ন গেজের তলাতে এক একটা কাঠের বাক্স—চাগুলো শর্টিং হয়ে ঐ বাক্সের মধ্যে পড়ে। এই চায়ের সঙ্গে দু'চারটে ডাল্টিও পড়ে। সেইগুলোই চুনাই করে ঐ মেয়েরা। অপরাপর মেয়েদের মত রুকমিনও সেই কাজ করতো। এই থেকেই রুকমিনের সঙ্গে ভাব হয় ভাওনাথের। একথা অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সারা গুদোমে তারপর বাগানে। গুদোমবাবু ও অন্য অন্য সর্দাররা অনেক শাসিয়েছিল ভাওনাথকে, কিন্তু তাকে যে নেশায় পেয়েছিল তা ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার মত বয়সের একজন জোয়ান সুস্থ সবল দেহীর পক্ষে এ নেশার মোহ কাটিয়ে ওঠা সহজও ছিল না। রুকমিন যখন তার যৌবনপুষ্ট দেহ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত, ভাওনাথ ত্রিসংসারের কথা ভুলে যেত, সমস্ত লজ্জা ভয়ের মাথা খেয়ে শিব হয়েছিল সে। ভবিষ্যৎ বলে কোন কিছু আছে সে বোধ তখন তার ছিল না—বর্তমানই তখন তার কাছে সর্বস্ব। এজন্য শেষ পর্যন্ত অনেক দুর্ভোগ সইতে হয় তাকে। বড় গুদোমবাবু অনেক আশা দিয়েছিলেন—গুদোমের হেড সর্দার করে দেবেন। এইতো মাত্র আর একবছর বাদেই হেড সর্দার বিসুন রিটায়ার করবে। এ আর কটা দিন? এ তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। সে-সমস্ত কথা তার আদৌ স্মরণ ছিল না। সে জানে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যেই জীবন। সে যা চায় তা পেলেই তার বরাবরের জীবনধারা সেই একই সূত্রে চলবে। চলমান জীবন বলতে শুধু সে এই কথাই জানতো।

রুকমিনের পিছনে পিছনে ঘুরে কাজের যে একটু আধটু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছিল সে-কথা অস্বীকার করতে পারে না ভাওনাথ। অথচ ওরা কেউ কাউকে ছোঁয়নি তখনো তবু মন যেন একটা নিশ্চিত স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের মধ্যে ঘুরপাক খায়। এজন্য একদিন গুদোম থেকে তাকে তাড়িয়ে দেন গুদোমবাবু। এই সামান্য

অপরাধে যে চাকরিটা খতম হবে একথা সে-সময়ে ভাবতেই পারেনি ভাওনাথ। তার গুদোমের চাকরি নেই এ-কথা সর্দার, কুলি মজুর সকলেরই মুখে মুখে। রুকমিনকে দেখে অনেকেই মুচকে হাসে। কথায় কথায় একদিন গুদোমের বড়সর্দার রুকমিনকে বলে—হলো তো এখন? এবারে রাজী হয়ে যা বেটী। এ-কথা হয় ভাওনাথের গুদোম ছেড়ে যাওয়ার পরের দিন। এরপর থেকে রুকমনিও ত্যাগ করে গুদোম ঘর। তিন চার দিন বাদে তার চাকরি যাওয়ার মুখ্য কারণ জানতে পারে রুকমিনের কাছে। রুকমিন বলেছিল—বড় গুদোমবাবু খুব পছন্দ করতেন তাকে। এমন কি অনেক টাকা পয়সা জামাকাপড় প্রশাধনের লোভ দেখিয়ে ছিলেন বিস্নুন সর্দারের মাধ্যমে। তাঁর গোপন ইচ্ছার কথাও জানিয়ে ছিলেন অনেক রকম অঙ্গভঙ্গি ও চোখের ইসারা করে। কিন্তু রুকমিন রাজী হয়নি কোন কিছুতেই।

চাকরি যাওয়ার পর হঠাৎ কেমন একটু অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে পড়ে ভাওনাথ। আজ মর্মে মর্মে অনুভব করে ভাল নিরীহ হওয়ার একটা সীমা আছে, সেটাকে ডিঙ্গিয়ে গেলে যেন পৌরুষ ব্যাহত হয়। মা বাপের চোখের দিকে তাকাতে পারে না সে। চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে জলে। সেই জলে ভাসে তাদের ঐ ছোট্ট জংলী খড়কুটোর ঘরখানি। লেংড়া ও সুখনীর আশা ভরসা সব যেন মুহুর্তের মধ্যে স্বপ্নের অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

এরপর অনেক চিন্তা, দ্বন্দ্বের সঙ্গে লড়াই করে করে সে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে। বাগানে ও গুদোমে কাজ করার সময়ে প্রতি মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিল সে। সেই সঞ্চয় আজ কাজে লাগবে। আর বাগানে কি গুদোমে কাজ করবে না—অন্য যা হয় একটা কিছু করবে। একটা ভয়সা গাড়ি কেনে শেষ পর্যন্ত।

এবারে মেঘ কেটে যায়। শরতের শান্ত মধুর সকালের আলোতে ঝক্‌ঝক্ চক্‌মক্ করে ওঠে উত্তরের নীলচে পাহাড় আর সেই সঙ্গে ছোট্ট সেই আঠারো ফুটে ঘরখানা। আঠারো ফুটে ঘরটা আজ যেন একটা অনন্ত আকাশ। আকাশ হাসছে, ঘর হাসছে, হাসছে ঘরের লোকগুলো।

কিছুদিন বাদেই রুকমিনকে নিয়ে আসে ঘরে। সেদিন সর্দারের ঘরে ছিল করম পুজো। ভাল নাচতে পারতো রুকমিন বাগানের আদিবাসী সমস্ত মেয়েদের মধ্যে সেই ছিল প্রথম।

ভাওনাথও মাদল বাজায় ভাল।

পুজো হচ্ছে সর্দারের বাড়ির ওঠোনে। মেয়েরা নাচগান করছে সেখানে, আর পুরুষে বাজাচ্ছে মাদল। ভাল নাচিয়ে আর গাইয়ে পেয়ে মেতে উঠেছিল ভাওনাথ। ওর মাদলে যেন কথা কইছিল। আজও সেই গানের কলিগুলো তার মনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে কখন কখন। অজ্ঞাতসারে গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে—

"কিয়া তো ভাইল : মন বইঠলি আঙ্গনওয়া।
নহি আলে, হামর সাজন নন্দলাল, নহি আলে॥
পানি বরষি গেল, যমুনা ভৈরি গেল।
নহি আলে হামর সাজন নন্দলাল নহি আলে॥
পানি ছুটিয়ে গেল যমুনা শুকিয়ে গেল॥
আয় গেলে হামর সাজন নন্দলাল আয় গেলে॥"

রুকমিন গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে ঢলে পড়ে মাঝে মাঝে। সুর ছিঁড়ে যায়, তাল কেটে যায়। আবার সামলিয়ে নেয়।

ওদের চোখ চারটে যেন মনের কথা বলে দেয়। উভয়েই পরস্পরকে অনেকটা চিনে নিয়েছিল আগে আর বাকিটুকু যা ছিল তাও হয়ে গেল এই একটা সুক্ষ্মতম মুহূর্তে।

দশ দিন বাদে পুজো শেষ হয়। ওরা গিয়েছিল তুরষা নদীতে করম গোঁসাইকে বিসর্জন দিতে। নদীতে স্নান সেরে এক ফাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ওরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেখানে একটা করঞ্জি গাছের তলে ওদের মিলন হয়—রুকমিনকে সিঁদুর লাগিয়ে দেয় ভাওনাথ। অনেক হুলুস্থুলু বাঁধে এ-নিয়ে। পঞ্চায়েৎ বসলো। বিচারে সাব্যস্থ হয় ভাওনাথকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে রুকমিনের বাবাকে।

ওদের বিয়ে কিন্তু হয় দু'বছর বাদে—সুকুরমণির জন্মের পরে। তখন সুকুরমণি প্রায় দেড় বছরের।

রুকমিনকে ঘরে এনে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল ভাওনাথ

যাতে ঘরখানিকে একটুখানি বাড়িয়ে একটা খড়ের পার্টিশন করে দেন বড়সাহেব। বড়বাবুকে ও অনুরোধ করেছিল কিন্তু সব বৃথা। কোনই ফল হয়নি বরং বিদ্রূপ আর গালাগালি ভোগ করতে হয়েছিল তাকে। বড়সাহেব ইংরেজিতে হাসতে হাসতে বড়বাবুকে কি বলেছিলেন তা সে বুঝতে পারেনি তবে বড়বাবুর কথাগুলো আজো তার মনে গাঁথা আছে। কী অকথ্য অভদ্র কথা বলতে গেলে জিভ সরে না। তিনি বলেছিলেন—পাছাভারি মাগ নিয়ে বুঝি পৃথক ঘর না হলে পিরিত জমে না? এই কথার ওপর আর দ্বিতীয় কথা বলতে ঘৃণা বোধ করে ভাওনাথ। সে মুখ নিচু করে একটা অশান্ত মন নিয়ে ঘরে ফেরে।

কিছুদিনের মধ্যেই সাধু বেশ জাঁকিয়ে বসে। সন্ধ্যা না হতেই বটগাছ তলায় তার ধুনি জ্বলে। শিষ্য সাকরেদ ও অনেক জুটেছে। কাছের জঙ্গল থেকে তারাই জ্বালানি কাঠ খড়ি সংগ্রহ করে আনে।

মজুরের দল সমস্ত ব্যাপারেই সাধুর পরামর্শ চায়। হিসেব রাখতে জানে না তারা। রাতে কাজ থেকে ফিরে গিয়ে দিনের হিসেব রাখবার জন্যে পোড়াকাঠের কালির দাগ কাটে ঘরে। পয়লা তারিখে একটা দাগ তিরিশ দিনে তিরিশটা জমে ওঠে। প্রথমে প্রথমে পোড়াকাঠ দিয়ে সাধু তাদের এক, দুই, তিন, চার লেখা শেখাতো তারপর মজুররাই স্লেট পেন্সিল কিনে আনে। এই ভাবে ধীরে ধীরে খাতা, পেন্সিল, কাগজ, কলম কেতাবপত্তর সবই হয়। সাধুর ধুনি জ্বলতে থাকে—ওরা সেই আলোতে বসে লেখাপড়া করে।

সাধুর মুখখানা আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ নতুন জীবনের নতুন মানুষের ছবি দেখতে পায় তাদের মধ্যে। আবার সে ছবি ঢেকে যায়। একটা রক্ত মাংস শূন্য বুভুক্ষু কঙ্কাল অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে ওঠে সাধুর চোখ। সঙ্গে সঙ্গে সেই চোখ দুটোই সে বেশ করে বুলিয়ে নেয় সারা চা বাগানের ওপর দিয়ে।

আর আর সকলের মত ভাওনাথও রোজ সন্ধ্যায় সাধুর কাছে আসে—তার হিতোপদেশ মন দিয়ে শোনে।

আজকাল আর সাধুকে ওদের ভয় হয় না। সব কথাই নির্ভয়ে বলে তাকে।

সাধু সকলকে বোঝায়, মানুষে মানুষে প্রভেদ নেই। মানুষকে আলাদা করেছে মানুষেই। তোমরা ঐ মানুষগুলোর কথা বিশ্বাস কর?

একটু একটু ভাবে ওরা। অন্ততঃ ভাবতে চেষ্টা করে।

সুদূরের পথ দেখে আঁতকে ওঠে কখন কখন। অসংখ্য খাত আর আলকাতরার মত অন্ধকার। সাধু প্রভাতের সূর্যের লাল আভা দেখায়। পূবে সূর্য উঠছে। ওরা আশ্বস্ত হয়—এগিয়ে চলে।

মজুরের কাজ করে সাধারণতঃ দু'জাতের লোক। নেপালী, ভুটিয়া আর আদিবাসী। ওদের প্রত্যেকের আদল আর জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধারা। অবশ্য নেপালী আর ভুটিয়াদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই কিন্তু আদিবাসীদের সঙ্গে ওদের বিভেদ লক্ষ্য হয় প্রতি পদে পদে কিবা চেহারায়, আচার ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া অথবা পরন পরিচ্ছদে। কেউ কারো ছোঁয়া খায় না এরা তাই কাজের বেলাতেও নেপালী ভুটিয়াদের জন্য নেপালী অথবা ভুটিয়া পানিওয়ালা আর আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী পানিওয়ালা। এদের লাইনও পৃথক।

পাহাড়ীরা আদিবাসীদিগকে ঘৃণা করে দেখলে নাক সিঁটকায়, মুখ ভেঙচায়, বিদ্রূপ করে। এরা সাহসী, পাহাড় পর্বত বনে জঙ্গলে থাকতে থাকতে তাদের মতই শক্ত, উগ্র ও বন্য হয়েছে। আদিবাসীরা ভীরু, শান্তিপ্রিয়। তারা নির্বাকে পাহাড়ীদের সব অত্যাচার মেনে নেয়।

সাধুর কিন্তু দু জাতের শিষ্যই আছে। তার কোন বাদবিচার নেই, সকলের হাতেই খায়। জিগ্যেস করলে বলে সাধুর আবার জাত কি? কেউ তো আর জাত নিয়ে জন্মেনি। জাতভেদ তো করেছে মানুষেই।

উভয় জাতের বামুনেরাই সাধুর ওপর বড় চটা। অনেক রকম কুৎসা অপবাদ রটিয়েছে তার নামে। তারা বলে জাত ধর্ম সব গেল। পুজো পার্বণ সব শিকেয় উঠবে এবারে।

সাধু সকলকে বলে কাজ করে যাও তোমরা, কাজের মধ্যেই ভগবানকে পাবে। একা যেও না সকলকেই সঙ্গে নিয়ে যেও। মা-বাবা কি শুধু একটি ছেলে কি মেয়েকেই দেখতে চান? কানা খোঁড়া সবাইকে নিয়ে যাও তবেই তো তিনি শান্তি পাবেন। কানা হোক্ খোঁড়া হোক্, বোবা কি বোকা হোক্ সবই যে তাঁর সন্তান?

সাধুর ছোঁওয়া কিন্তু পাহাড়ীরা খায় না। তারা বলে সাধু মদেশীয়া, ওর ছোঁওয়া খেলে ওদের জাত যাবে, জাতে উঠতে

আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, লোকজন ডেকে খাওয়াতে হবে, নারায়ণের পুজো দিতে হবে। এ-সব অনেক ঝামেলা আর পয়সা খরচের ব্যাপার।

সাধু আদৌ বিব্রত হয়নি। সে জানে এ ধরনের কথা ওঠা ভাল, এ-সব কথা তো আগে উঠতো না এখন উঠছে এতে বোঝা যায় প্রাণে একটা সাড়া জেগেছে। মনের ভিতরে দ্বন্দ্ব চলবে, শেষে একদিন অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে আসবে। সাধু হাসতে হাসতে বলে—জাত কি কর্পুর যে উবে যাবে? হাটের জিনিসও নয় যে পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যাবে।

সাধুর কথার কোন প্রতিবাদ করে না শিষ্যেরা তবে নিতান্ত অসহায় একটা হাসি হাসে।

প্রেমপ্রকাশ ছোকরাটি ভালো। তেইশ চব্বিশ বয়স হবে। বলিষ্ঠ, সুঠাম দেহ—অসীম ক্ষমতা রাখে গায়ে। সে বলে—আমরা ছোকরার দল তো এ-সব বাঁধন ভেঙে ফেলতে চাই কিন্তু বুড়োরা যে নাছোড়!

ভাওনাথও সায় দেয় প্রেমপ্রকাশের কথায়। আর আর ছোকরারা জোর গলায় বলে ওঠে—ভেঙে নতুন করে সাজো। কল্কের অন্তসারশূন্য পোড়া ছাই ফেলে দিয়ে ভাল টাটকা তামাক দিয়ে সাজো।

সাধুর মুখে এক ঝলক রোদ এসে পড়ে। তাকে অপুর্ব দেখায় তখন। সে শান্ত ধীর গলায় বলে—চীৎকার করো না। ঘরের খুঁটিরও কান আছে। বটগাছের পাতার হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে যাবে সব কথা।

সাধু মনে মনে মতলব ভাঁজে। সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় দিন গোনে। সুযোগ এসে যায় একদিন সত্যি। সেদিন ছিল ঘোর অমাবস্যা। তার ওপর শনিবার। সাধু কালীমায়ের পুজোর আয়োজন করে। নেপালী, ভুটিয়া, আদিবাসী সকল শ্রেণীর শ্রমিকই কালীমায়ের ভক্ত। মায়ের নামে ভয় করে, হাত জোড় করে প্রণাম করে। তাজা রক্ত খেগো দেবতাকে কে না ভয় খায়? এই শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই কালীপুজো

দেখেনি আগে। এমন কি কালীমায়ের যে কী রূপ তাও ধারণা করতে পারে না তারা। এ-দেশে তখনও কালীপুজোর চলন হয়নি, তাই শুধু সাধুর শিষ্যেরা নয় জাতি-নির্বিশেষে বাগানের সকলেই উপস্থিত থাকে সেখানে। স্ত্রী, পুরুষ, ছেলেবুড়ো সবাই।

সাধুর কাছে একখানি কালীমার ফটো ছিল। সেখানাকে বটগাছের গোড়ায় শিকড়ে হেলান দিয়ে মাটির বেদীতে স্থাপন করে সে। তাতে সিঁদুর চন্দনের ফোঁটা কাটে। আগের সিঁদুর চন্দনের ফোঁটার দাগও ছিল সেটাতে। ধূপধুনা ফুল চন্দন দিয়ে পুজো আরম্ভ করে সাধু। শিষ্যসাবুদেরা ফুল বেলপাতা দূর্বা সমস্ত উপকরণই তার আদেশ মত সংগ্রহ করে এনেছিল।

সাধুকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। রক্তচন্দনের বড় ফোঁটাটা কপালে জ্বলজ্বল করছে, সারাদেহের লোমগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেহটা যেন আগের চেয়ে অনেক বড় ও মোটা হয়েছে, চোখ দুটো দিয়ে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। ভয় ও ভক্তি এই দুয়ের সমন্বয়ে একটা অপূর্ব ভাল লাগার নেশায় পেয়েছে সকলের।

এরপর পুজো শেষ করে সাধু বললো—এবারে সকলে মায়ের কাছে দীক্ষা নেও। বড় শুভ লগ্ন। মায়ের চরণপদ্মে লাল জবার বদলে এক এক ফোঁটা বুকের গাঢ় রক্ত দাও। রক্তই রক্ত আনবে। যেমন টিউব অয়েলে জল ঢাললে জল আসে। অনেক রক্ত, অনেক জীবন।

একটা বিস্মিত মুহূর্ত। বুড়ো অশ্বত্থটি স্তব্ধ হয়ে যায়। এক ঝলক মৃদু বাতাসের স্পর্শে সব ভুলে যাওয়া—নতুন পাতা, নতুন গান, নতুন স্পন্দন।

বুড়ো লোকগুলো নির্বাক নিষ্পন্দ—ভীতি বিহ্বল ভাব। একদিকে সাধুর উদ্ধত খড়্গ, অভিশাপ আর অন্যদিকে এক আশ্চর্য মিলনোৎসব।

প্রসাদ বিতরণ করছে মেয়েরা।

হঠাৎ জিতনী চেঁচিয়ে ওঠে—এই নানকি, তোয় কা করলেক মা[illegible] ছোঁয় দেলেক?

নানকি থমকে দাঁড়ায়, জিভ কাটে লজ্জা ও ভয়ে। কেমন যেন বিব্রত, অপ্রতিভ হয়ে পড়ে—কি হবে তা হলে?

মাতলা মুখ নিচু করে আছে। চোখেমুখে কালো কালির ছোপ। লোকে কি মনে করবে? নানকি জালপার বউ। জালপা যে তার মিতে।

একটা থমথমে মুহূর্ত। কয়েকজন লোক নীরবে জায়গা ছেড়ে চলে গেল। রাগত আগুনে চোখ তাতে ঘৃণা ও প্রতিকারের দৃঢ়তা।

সাধুর চোখ এড়াতে পারে না কেউ। ত্রিশূলের বুকে সিঁদুরের দাগ কাটে সাধু। নিস্তব্ধ রজনীর বুক ভেদ করে ফুটে ওঠে আলোর ঝলসানি। এই তো সঙ্কেত! ভুলে যাওয়ার পরেই তো সন্ধান পাওয়া, অন্ধকারের পর আলো।

এতক্ষণের তরল আবহাওয়াটা হঠাৎ তিক্ত ও গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে। কানাঘুষো সুরু হয়ে গেছে। মতিয়া বুড়ি মুখ বেঁকিয়ে বলে—ছুঁড়িটা যেন আহ্লাদে ডগবগ হুঁস নেই কোন তাতে। মরদের বন্ধুকে যে ছুঁতে নেই এ যেন ও জানে না?

জোমনি বললে—হুঁস থাকবে না কেন? অনেকদিন ধরেই জমেছে দেখলি নে ছুঁড়ির আঁড় চোখের চাউনি! এরপর একদিন শুনবি দু'জনেই ভেগে গেছে বাগান থেকে। কালে কালে কত দেখবো, শুনবো? আমরা বুড়োরা এর আগে সরে পড়তে পারলেই বাঁচি। যাই বলিস, আগের দিনই ভালো ছিল। এই সব যন্ত্রণা ছিল না তখন, ভাগতেও পারতো না, এমন সব অলক্ষুণে ঘটনাও ঘটতো না।

—সত্যি কথাই বলেছিস শনচরের মা!

—সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলে না বিরশা সর্দারের মেয়ে।

ভাওনাথ চুপচাপ ভাবছিল এতক্ষণ। ঘরে দুর্যোগ, দুরের পথ। দুর্যোগ না কাটিয়ে, আলো না জেলে কেমন করে দুরের পথে যাবে?

শেষে সকলেই নিস্তব্ধ হলো ভাওনাথের একটি কথায়।

ডালিমফুল পাহাড়নী। উঠন্ত বয়স। প্রসাদ পরিবেশন করছে পাহাড়ীদের।

ভাওনাথ নেপালী ভাষায় বললে, মেরো পনি প্রসাদ দিনু ডালিম-ফুল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় সে।

সকলের চোখই ভাওনাথের দিকে। পাগল হলো নাকি লোকটা?

ডালিমফুল অবাক নিস্পন্দ চেয়ে আছে ভাওনাথের দিকে।

ভাওনাথ বললো—দাও ডালিমফুল, প্রসাদ দাও। আমার মাথা খারাপ হয়নি, আমি প্রকৃতিস্থই আছি।

ডালিমফুলের হাত সরছে না। অতি সন্তর্পণে একটু প্রসাদ উঁচু করে ফেলে দিতে যায় ভাওনাথের হাতে যাতে ছোঁওয়া না লাগে।

—ভয় করো না ডালিমফুল। প্রসাদ দাও, ছুঁয়েই দাও আমাকে। তোমার কিছুই হবেনা এতে আমারই জাত যাবে। আমি পতিত হয়েই থাকতে চাই সমাজে। জাত ভাইদের মদ খাইয়ে জাতে উঠবো না নিশ্চয়ই ? নতুন জাতের সৃষ্টি চাই।

প্রেমপ্রকাশ এতক্ষণ ভাওনাথের কথা শুনছিল। তার খুব ভাল লাগে ভাওনাথের কথাগুলো। সত্যিই নতুন জাতের সৃষ্টি করতে চায় তারা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে সে—মেরো পনি প্রসাদ দিনু হোস ডালিমফুল। নয়া জাতকো জনম দিনছু হামি হেরো।

সাধুর চোখে মুখে এক অপূর্ব আলোকরশ্মি। হুংকার দিয়ে ওঠে সে—জয় কালীমাই কী জয়। সেই তালে তাল দিয়ে সুর মিলিয়ে বটগাছের তক্ষকটা ডেকে ওঠে তোক্ষ, তোক্ষ, তোক্ষ। মনে হয় একটি অশরিরি বাণী—ঠিক, ঠিক, ঠিক।

ছেলে ছোকরারা সকলেই সমস্বরে সাধুর কথার পুনরাবৃত্তি করে—জয় কালীমাই কী জয়।

সাধু সবাইকে আশীর্বাদ করে। ত্রিশূল থেকে সিঁদুরের টিপ নিয়ে ওদের ললাটে জয়ের তিলক কেটে দেয়।

একটা ভাবগম্ভীর মুহূর্ত। সকলের দেহই রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। একটা অজ্ঞাত, অননুভূতপূর্ব শক্তি যেন তাদের প্রতি রক্তবিন্দুতে সঞ্চরণ করছে।

পাঁচ

খবর যেন বাতাসে বাতাসে উড়ে চলে। সেদিনকার ঘটনা—ডালিম ফুলের ছোঁওয়া প্রসাদ খেয়েছিল ভাওনাথ তা একদিনের মধ্যেই বাগানের সমস্ত লাইনে, কাজের মেলাতে, গুদোমে, রাস্তাঘাটে, বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ ভাওনাথ তখনও সে বিষয় ভাল করে ভেবে দেখবার সময় পায়নি। ভাওনাথের মা বাবা মুষড়ে পড়ে এতে। টুকটাক অনেক কথাই উঠেছে সমাজে। ওদের জাত গেছে। দুই একদিনের মধ্যেই মিটিং বসবে, বিচার হবে।

সত্যিই মিটিং বসে বাগানের সমাজপতিদের নিয়ে। নিকটের বাগানগুলোর অনেক গণ্যমান্য জাত ভাইয়েরাও এই মিটিংএ উপস্থিত। বড়সাহেব ডবসন আর বড়বাবু পিনাকবাবুকেও এসংবাদ আগেই দিয়েছে তারা। তাদের অনুমোদন ছাড়া তো একপাও কারো নড়াচড়ার জো নেই। মিটিংএ ভাওনাথকে সমাজ তহবিলে পঁচিশ টাকা আর সমাজের লোকগুলোকে গোস্ হাঁড়িয়াপানি খাইয়ে জাতে ওঠার ব্যবস্থা দেয় সমাজপতিরা। টাকা দাখিল করার সময় দেয় তিন দিন।

সে-এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা। বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে বাপ মা ছেলে ছেলের বৌ অন্ধকার ঘরে বসে আকাশপাতাল ভাবছে। হাতে একটা কানাকড়িও নেই। যা জমিয়েছিল তা দিয়ে ভয়সা গাড়ি কিনেছে। তারপর বাকি যা ছিল তা দিতে হয়েছে রুকমিনের বাবাকে। আর একটি তামার পয়সাও নেই যা দিয়ে এই মাথার ঘা ঠেকাবে। সর্দারের কাছে হাত পেতেছিল কিন্তু খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। সরকার থেকে পেসকি পাইয়ে দেওয়ার জন্তে গিয়েছিল বড়বাবুর কাছে। তিনি বলেছেন—পঁচিশটি টাকা পাইয়ে দিতে পারেন তবে তাঁকে দশ টাকা দিতে হবে। তাঁকে দশ টাকা দিয়ে মাত্র পনরটি টাকা থাকে তাতে তাদের মাথার ঘা ঠেকান যাবে না বরং ঘা আরো জোরে পড়বে। লেংড়া পাঁচ টাকা

দিতে চেয়েছিল কিন্তু বড়বাবু রাজী হননি তাতে। এ নিয়ে একটু আধটু বচসা হয় ওদের মধ্যে। বচসা ঠিক নয়। এক তরফা কথা। বেশ দু'চারটে কটু কথা শুনতে হয়েছিল ভাওনাথকে তার মার কাছে। বাপে অবশ্য তেমন কিছু বলেনি, সে গুম হয়ে বসেছিল। তার হাবভাব দেখে সত্যি সত্যিই বড় দুঃখ লেগেছিল ভাওনাথের মনে। কিন্তু মা বলে—একটা অলক্ষুণে বউ এনেছিস ঘরে। গুদোমের সর্দারী গেল, জাত গেল।

ভাওনাথ চুপচাপ এ-সব নির্যাতন সহ্য করে। রুকমিনকে প্রবোধ দেয়—দশা চলছে এখন। এটা কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এজন্য ভেবো না।

রুকমিন বুঝতো সব তবু তার মনটা সময়ে সময়ে কেমন উদাস হয়ে উঠতো। ভাওনাথকে জিগ্যেস করতো—তোয় তানি কা ভাবলেক ?

ভাওনাথ জবাব দেয়—তা মনে করলে আর তোমাকে ঘরে আনতাম না। এজন্য কিছু মনে করো না—সবই নিয়তি। যার যা কপালে আছে তা তাকে ভোগ করতেই হবে। মা অবুঝ, তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই তাই যা মনে হয় তাই আবেগভরে বলে বসে।

প্রেমপ্রকাশকেও ঐ একই বিচারে হাজির হতে হয়। তাদের সমাজের সমাজপতিরাই বিচার করে। প্রেমপ্রকাশ জাতিতে লোহার তাই ভাওনাথদের সমাজপতিদের দ্বারা তার বিচার হয়নি। তবে তারাও উপস্থিত ছিল। এর কারণ একই দিনে একই পুজোতে এই ঘটনা ঘটে এবং এই মিটিং-এ যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই সেই পুজোতেও ছিলেন। একটা খোলা মাঠের মধ্যেই মিটিংটা হয়।

প্রেমপ্রকাশের বাবা বাগানে চাপরাসীর কাজ করে। চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে চাপরাসীর কাজ বেশ সম্মানের। মাইনেও ভালো। তারপর চাপরাসীদের অনেকেরই সর্দারী আছে তাতেও বেশ দু'পয়সা কমিশন পায়। এছাড়া আরো দু'পয়সা হয় মজুরদের তলব থেকে। ওরা তো ঠিক মত হিসেবপত্তর রাখতে পারে না। প্রেমপ্রকাশের বাবাকে তাই একটুও ভাবতে হয়নি। কচকচে চকমকে ব্যাঙ্কের অনেকগুলো নতুন টাকা গেঁজেয় বেঁধে

নিয়ে এসেছিল সে। সমাজপতিরা বিচারের রায় দিতে না দিতেই সে গেঁজে থেকে খুলে কচকচে টাকা পঁচিশটি গুনে দেয় আর জাতে ওঠার জন্যে জাতভাইকে খাইয়ে দেবে তু'দিনের মধ্যেই।

প্রেমপ্রকাশ একটা কথাও বলেনি মিটিংএ। একদম নীরব ছিল। মনে হলো সে তার অন্যায় মেনে নিয়েছে। তু'একবার ভাওনাথের দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু ভাওনাথ চোখ ঘুরিয়ে নেয় রাগে, ক্ষোভে ও তুঃখে।

ছেলে-ছোকরার মধ্যে যারা সেদিনকার পুজোতে উপস্থিত ছিল তারাও মিটিংএ এসেছিল। তাদের ভাওনাথ নিজের দলের ছেলে বলেই জানতো কিন্তু কী আশ্চর্য, তারা সকলেই চুপচাপ। তারা ভুলে গেছে তাদের সেই পণ, নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছে।

ভাওনাথ কিন্তু বিচারে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—সমাজের এই এক তরফা বিচার মেনে নিতে রাজি নয়। নতুন স্থষ্টি করতে হলে, নতুন মানুষ তৈরি করতে হলে নতুন পথে চলতে হবে। সে পথে তুঃখ আছে কষ্ট আছে সে কথা সে ভাল করেই জানে। সে আরো বলে—জাত যায় না রামবিরিজের হাতের তৈরি চাপাটি মোরব্বা মিঠাই খেলে, জাত যায় না গদিওয়ালা কালোয়ারের হাতের জল মিশানো দারু খেলে। আর জাত যায় অন্য জাতের ছোঁওয়া পুজোর প্রসাদ খেলে। রাগত লাল চোখে জল ছলছলিয়ে ওঠে ভাওনাথের। হঠাৎ নজর পড়ে তার বাবার দিকে। লেংড়ার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলের পানে। চোখ তুটো যেন শাসাচ্ছিল তাকে আবার পরক্ষণেই মিনতি জানিয়ে বলছে—ওছান নেই করবে ছোওয়া। এই আমাদের সমাজ, এই তার রীতি—এ আমাদের মেনে চলতেই হবে। আমাদের বাপঠাকুরদারাও মেনে গেছে এসব।

লেংড়ার চোখমুখের চেহারা দেখে আর তার কথাগুলো শুনে ভাওনাথের সেই তুর্জয় সাহস ও মনের দৃঢ়তা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। শিউরে ওঠে সে। কেমন যেন ছন্নছাড়া, পাগলা পাগলা ভাবের মত দেখাচ্ছে লেংড়াকে। তবে কি সে পাগল হয়ে যাবে? ভীরু পায়ে একপা তু'পা করে বাপের দিকে এগিয়ে যায় ভাওনাথ।

লেংড়া জড়িয়ে ধরে তাকে। অনেকটা সাহস পায় এবারে। চিন্তা করবার ফুরসৎ ছিল না—হাতে যে একটি টাকাও নেই তবু সে অঙ্গীকার করে তিন দিনের মধ্যে যে করেই হোক টাকা দেবে।

ভাওনাথের দুর্বলতায় কে যেন আঘাত হানলো। সে মধ্যে বাপের স্নেহশৃঙ্খল মোচন করে এক লাফে সরে যায় বেশ অনেকটা দূরে। দৃপ্তকণ্ঠে বলে—না। তা হতে দেবে না সে, শাস্তিই মেনে নেবে। জাত যায় যাক্, এরকম জাত চায় না সে যা মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করে না। এই বলেই মিটিং ঘর থেকে প্রায় এক দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

শেষপর্যন্ত তার বাবা জরিমানা দিয়ে দেয়। অনেকের কাছে হাত পেতেছিল কিন্তু কারো কাছে একটা পয়সাও পায়নি। পরে সুখনীর যা দু' একখানা গয়না ছিল তাই গিরিধারীলালের দোকানে চড়া হারে বাঁধা রেখে টাকা ধার নেয়। ভাওনাথকে একথা তারা জানতে দেয়নি কারণ জানতে পারলে নিশ্চয়ই একটা অনর্থ ঘটাবে। অবশ্য একদিন বাদেই সে জানতে পারে সব। গিরিধারীলালই বলেছিল—কাহে এইসা করতা হায় ভাওনাথ? এ-সব ছোড় দাও। নকরি কর, প্রেমছে খাও দাও ঘুমকে বেড়াও।

ভাওনাথ খুশী হয়নি গিরিধারীলালের এই অযাচিত উপদেশে। একটা ম্লান হাসি হেসে নির্বাকে এড়িয়ে চলে যায়।

সারা বাগানটিতেই কেমন একটা থমথমে অথচ ভেতরে ভেতরে চাঞ্চল্যকর ভাব। সাধুর আস্তানাতে আর বড় একটা কেউ আসে না, আড্ডাও বসে না। আখড়া শূন্য। লোকজনের সোরগোলে যা গমগম করত তা আজ একেবারে ফাঁকা। সেখানে লোক যাতায়াত নেই বললেই চলে, অল্প দু'একজন যারা ঐ পথ দিয়ে চল ফেরা করে তারা যেন শুধু মজা দেখতেই আসে। সেখানে কি হচ্ছে, সাধুর শিষ্যসাবুদরা যাতায়াত করছে কি না আর সাধুরই বা কি অবস্থা? তারা তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি না দিয়ে আঁড়চোখে চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে। সাধু কিন্তু সরলভাবেই তাদের দিকে চায়, দু'একটা কাজ-অকাজের কথা ও জিগ্যেস করে। কেউ উত্তর দেয়, কেউ দেয় না।

এই ঘটনার পর ছয় সাত দিন সাধুর আখড়া মাড়ায়নি ভাওনাথ। বাগানের অনেকেরই ধারণা জন্মেছে যে ঐ সাধুর জন্তেই জোয়ান জোয়ান ছেলেমেয়েগুলো বিগড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বুড়োরাই এ-কথা ভাবে। ভাওনাথকে তারা প্রচুর উপদেশ দেয় দেখা হলেই। বড়োরা আর আর ছেলেগুলোকেও সামলে রাখছে। সমাজপতিরা ভাবেন—দাওয়াইএ কাজ করছে। তবে ভাওনাথের দৃঢ়তার তারিফও করে যখন তারা নিজেরা বসে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা করে।

সত্যই ভাওনাথ অসম্ভবরকম গম্ভীর হয়ে পড়েছে। একে এই একটা দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে তার ওপর আর ক'টা মাস বাদেই রুকমিনের ছেলে হবে। নয়া জন্মে বেশ কিছু খরচ। ভবিষ্যতও তার কাছে বর্তমানের মত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নয়। এর মাঝে একটা মুহূর্তে মনে পড়ে করমপুজোর কথা। ভাদর মাস। এই তো আর ক'টা দিন পরেই পুজো। এই সেই পুজো, সেই আনন্দমুখর রাত, নাচগান বাজনা, নদীতে স্নান, কুলের কাঁশবন আর গভীর অরণ্যের মধ্যকার সেই করঞ্জ গাছ। সব কিছুই ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে তবুও দুরাগত এই আনন্দচিত্র যেন আজ তার কাছে অন্ধকারে ঢাকা। সে ভাবতে পারে না এতে কোনদিন আলো ছিল, সুখ ছিল। তার মুখে আর হাসি-ঠাট্টা নেই, প্রাণে সেই আনন্দ উৎসও নেই। তার আজকালকার চেহারা দেখলে মনে হয় না যে সে কোনদিন হাসিঠাট্টা জানতো। সারাদিন কাজেকর্মে ভুলে থাকে কিন্তু সন্ধ্যা হলেই একটানা একটার পর আর একটা করে করে অনেকগুলো দুঃখভার এসে গলা টিপে দম আটকে মারতে চায় তাকে। ঘুম আসতো না অনেক রাত পর্যন্ত। রুকমিন পাশে শুয়ে অনেক কথা বলে তার মনটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তার নরম হাত ধীরে ধীরে গায়ে, চুলে বুলিয়ে দেয়। কখনো বা বুকে টেনে নিয়ে আদর করে। মাঝে মাঝে তার কণ্ঠও যেন রোধ করে দিত কে। সে ঢোক গিলতো, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তো। অন্ধকার ঘরে ভাওনাথ তা দেখতে পেত না সত্য কিন্তু কানে শুনতে পেত

সে-সব শব্দ, অনুভব করতো তার হৃদয়ের দ্রুততর স্পন্দন। তারপর বহু সাধ্যসাধনার পর ঘুম আসতে না আসতেই গুদোমের সিটি বেজে উঠতো। ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে যখন উঠতো মনে হতো বুকে যেন একটা পাষাণ চাপা রয়েছে। ইচ্ছা হতো আবার শুয়ে পড়ে কিন্তু সে উপায় নেই। অনিচ্ছা সত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

লেংড়া সুখনীর গয়না বন্ধক রেখে মাত্র চল্লিশটি টাকা পায়। তা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে হাতে থাকে শুধু পনর টাকা। জাতভাইদের খানাপিনা দিতে কমসে কম পঁচিশ ত্রিশ টাকার দরকার। বাকি দশ পনর টাকা আর সংগ্রহ করতে না পারায় তাদের খানাপিনা দেওয়া হয়ে ওঠে না। ভেবেছিল আর দশ দিন বাদেই তো তলব পাবে—চারজনের তলব। তার নিজের, সুখনীর, রুকমিনের আর ভাওনাথের। চারজনের তলব থেকে বিশ টাকা বাঁচাতে পারবে নিশ্চয়ই। এ তেমন একটা অসম্ভব নয়। কারণ সুখনী খুব হিসেবী—বাজার থেকে আনাজ না কিনে কাঁটা শাক, সজনে শাক কুড়িয়ে সিদ্ধ করে দেবে। তাতেই তারা মহাতৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেতে পারবে। এ-রকম খাওয়া খেয়ে বেশ থাকতে পারে তারা। কোন কষ্ট হবে না। অভ্যাস আছে। আজকাল না হয় এটা সেটা ভাল মন্দ খায়, দু'টো পয়সা কড়িরও মুখ দেখেছে। আগে তো ঐ-সব খেয়েই থাকতো। দু'হপ্তা বাদে আবার করমপুজো। এতেও কিছু খরচ হবে। নতুন কাপড়জামা না হয় এবারে কেনা নাই বা হলো, পাঁচ টাকার মধ্যে সারবে।

মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার মূলে কে যেন কুঠার হানলো। দশ দিন পার হয়ে গেল। তলব হলো না। দিন পিছিয়ে গেল। বড় মেমসাহেব মিসেস ডবসনের খুব অসুখ তাই তাঁকে নিয়ে কলকাতা গিয়েছেন বড়সাহেব। তলব হবে করমপুজোর পরে। এই খবর বাগানের শ্রমিকদের মনে একটা অসন্তোষের ভাব আনে। নিজেদের গতরখাটা টাকা তাও সময় মত পাবে না তারা। একজন লোকের জন্য এতগুলো

লোকের কী দুর্দশা। মনের ঝড় মনেতেই বয় বাইরে তা প্রকাশ করার মত মনবল তাদের নেই।

ভাওনাথও তলবের খবর রাখে। তার ইচ্ছে ছিল এবারকার তলব থেকে সে রুকমিনকে একখানা ভাল রঙচঙে পাটের শাড়ি কিনে দেবে। রুকমিনকে এনেছে একবছর হলো কিন্তু এ পর্যন্ত একটার পর আর একটা ঝামেলা লেগে থাকায় নিজ হাতে করে কোন কিছুই দিতে পারেনি তাকে। এবারে দেবে। অবশ্য এ-কথা সে জানতো যে আসছে তলব থেকে টাকা নিয়ে শাড়ি কেনা সম্ভব হবে না। সে আরো জানতো তার বাবার পরিকল্পনা। তবুও আশার একটা ক্ষীণ রেখা জ্বলতো তার মনে। তলব হবে না এই সংবাদ জানতে পেরে তার বিদ্রোহী ক্ষিপ্ত মনের তাপমাত্রা আরো বেড়ে যায়।

এদিকে পুজোর দিন ঘনিয়ে এলো অথচ তলবের খোঁজ নেই। তলব পাওয়া যায়নি বলে তো আর পুজো বসে থাকবে না। তার তারিখ, দিন ক্ষণের কোন অদলবদল হবে না। কারো প্রতীক্ষা রাখে না সে। পুজোর আয়োজন হয় জউরু সর্দারের ঘরে। আয়োজনের ঘটা দেখে মনে হয় না সমারোহ আগের চেয়ে কিছু কম। অবশ্য এই পুজোতে তেমন কিছু সাতপাঁচ লাগে না। একটুকরো নতুন মার্কিন কি লংক্লথ, বন জঙ্গলের কিছু ফুল, ফল, বাসি ভাত আর শাক। আর যারা পারে নতুন জামাকাপড় পরে। সবরকম ব্যবস্থাই আছে। পুজো তো আর শুধু ধনীর জন্য নয়। সবার জন্য। মনকে সান্ত্বনা দেয় সকলে। ভাওনাথের মনটাতে তবুও কিন্তু কাঁটার খোঁচা লাগে। তার মনে জাগে—রঙচঙে একখানা পাটের শাড়ির কথা। রুকমিন যে সেখানা পরে করমগোঁসাইয়ের কাছে শসাকুমড়ার পুজো দেবে। শসাকুমড়ার পুজো দিলে যে সুসন্তান লাভ হয়। এই তো ভরা মাস তার। পেটের ছেলেটি আজ হয় কি কাল হয়।

শেষ পর্যন্ত তলব না পেয়েও পুজোর একটা ব্যবস্থা করেছিল লেংড়া। একটুকরো নতুন কোরা মার্কিন কাপড়ও জোগাড় করেছিল গিরিধারীলালের নিকট থেকে। সেই সিকি গজ সস্তা দামের

জালজাল মাকিনেই তাদের পুজো হবে। সুখনী বলেছিল তাই এক পয়সা দিয়ে একটা ছোট শসাও কিনে এনেছিল সে। শসার পুজো দেবে রুকমিন।

পুজো আর দিতে হয়নি রুকমিনের। পুজো চলে দশদিন ধরে। এগার দিনে বিসর্জন। পুজোর প্রথম দিনেই উত্তরের পাহাড়টা যেন কালো হয়ে নেমে আসে ওদের বুকে, আকাশটা ভেঙে পড়ে মাথায়। একটা বাঁশের চ্যাঙারিতে অল্প কয়েকটা ফুল ফল সংগ্রহ করে রেখেছিল সুখনী আগের দিন রাতে। সব ঠিক, তৎপরতার অন্ত নেই, সকালে খুব ভোরেই সূর্য উদয়ের আগে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে সেটাকে নিয়ে পুজোর আখড়ায় যাবে সে। এদিকে সূর্য ওঠে, বেলা বাড়ে বিকেল হয় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় তারপর রাত ঘন অন্ধকার কিন্তু তবু সর্দারের বাড়ি থেকে কোন নিমন্ত্রণ আসে না। অথচ বাড়ির লাগোয়া অন্য সব বাড়িগুলোর ছেলেমেয়ে বুড়োগুড়ো সকলেই সেজে-গুজে সর্দারের বাড়ি যাচ্ছে সেই কোন ভোর থেকে। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। শেষে জানতে পারে এক ঘরে হয়েছে তারা। জাত ভাইদের খানাপিনা না দেওয়া পর্যন্ত তারা আর জাতে উঠতে পারবে না। উৎসব আয়োজনেও তাদের স্থান হবে না। একথা ওদের কারো মনে জাগেনি আগে। তারা তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে খানাপিনা দেবে আর জরিমানার টাকা তো আগেই দিয়েছে।

ভাওনাথের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সমাজপতিদের মাথা মুড়ো চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। দাঁতে দাঁত চেপে কড়মড় করে ওঠে। সমাজ কাকে বলে, কি নিয়ে সমাজ, সমাজের কর্তব্য কি তাই জানে না অথচ তারা সমাজপতি। তাদের শাসন, অনুশাসন সমস্তই ভগবানের আদেশ বলে মেনে নিতে হবে। কেন, কি জন্য? তা হলে পুজো দিতে পারবে না রুকমিন? তার দিকে তাকাতে পারে না ভাওনাথ। সে যে তার পেটের সন্তানের মঙ্গল কামনা করে শসাপুজো দিতে চেয়েছিল? তার সমস্ত আশায় যে ছাই ছিঁটিয়ে দিল এই বর্বর জানোয়ারগুলো। করম গোঁসাই কেন এই ধূর্তদের শাস্তি দেবেন না? বিদ্রোহী মন মাঝে মাঝে চঞ্চল

ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে রাশ টেনে সামলিয়ে নেয়। তার একার কতটুকু ক্ষমতা, কি করতে পারে তাদের সে? মনে অনেক জিজ্ঞাসা। বাপের ওপর রাগ হয় তার। কেন, কি জন্য, কাদের ভয়ে এই পাষণ্ড বর্বরগুলোর কথা মেনে চলবে তারা? না, না, আর না। খানাপিনা আর কিছুতেই দিতে দেবে না সে। এইরকম একটা দুর্জন পশু পরিবেশের মধ্যে থাকার চেয়ে একা একা থাকা অনেক ভাল। তারা তাই থাকবে। লেংড়ার নিকটে ছুটে যায় দ্রুতপদে।

লেংড়া তখন একদৃষ্টে পথের পানে চেয়ে চেয়ে কি জানি ভাগ্য বিপর্যয়ের কথাই ভাবছিল। কাছে ছোট একটা কাঠের পিঁড়িতে বসে সুখনী। তার মুখখানাও ভার ভার। বা-হাতের তালুতে খানিকটে খইনি। কি জানি অনেকক্ষণ আগেই তা তৈরি করেছে কিন্তু স্বামীর মুখের হাবভাব দেখে আর সেটা মুখে দিতে হাত সরেনি।

বাপমায়ের মুখের ঐ রকম একটা করুণ ভাব দেখতে পেয়ে এক'পা পিছিয়ে থমকে দাঁড়ায় ভাওনাথ। যা বলবে বলে এসেছিল সে-সব ভুলিয়ে যায়। নতমুখে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরপদে চোরের মত সরে আসে।

পথে যেতে যেতে স্থির করে ভাওনাথ সাধুর কাছেই যাবে সে। ফুল, ধুপধুনা ও মিষ্টি মিঠাইয়ের গন্ধে সারা রাস্তাটা থই থই করছে। এই পথ দিয়েই মেয়েরা পুজো দিতে গেছে। আমোদ আহ্লাদ নাচগান বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। কে যেন ভাওনাথের পা দুটো ধরে দাঁড় করিয়ে দেয় পথের ওপর।

অল্পক্ষণ বাদে সাধুর কাছে গিয়ে হাজির হয় ভাওনাথ। তার কাছে এই সে প্রথম আসে সে রাত্রের ঘটনার পর। মুখ দেখাতে লজ্জা করেছে এতদিন। কি বলে মুখ দেখাবে? সাধু যে তাকে দুর্বল চিত্ত, ক্ষীণকায় ভাবছে—অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস তার নেই। কিন্তু তাই কি? ভাওনাথ তো দুর্বল নয়—দুর্বল হলে কি গুদোমের এত শক্ত ঝামেলার কাজগুলো তার কাছে সহজসাধ্য হতো? শক্তি-সামর্থ না থাকলে কি করে

সে গুদোমের সর্দার, বাবুর চোখ রাঙানি, হুমকিকে উপেক্ষা না করে রুকামনকে নিয়ে এলো ?

সাধুর কাছে এসে তার সমস্ত ভ্রান্তির ঘোর কেটে যায়। সাধু হেসে বললো, কাহা রইলি এতনা দিন ? সন্ধ্যার আবছা আলোতেও সে সাধুর মুখখানা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বলতর দেখতে পায়। একটুকুও ম্লান হয়নি। সেই দীপ্তি, সেই দৃঢ়তা, নিশঙ্কতা, নির্ভীকতা আজো তার চোখেমুখে দৃপ্ত। ভাওনাথের মনের কথাগুলো সবই যেন জানে সাধু। জড়তাহীন সুস্থ স্বচ্ছন্দ গলায় বলে, ভাবনা কিসের ? জানিস, অমঙ্গলই মঙ্গল আনে। প্রথমে বীজ তারপর অঙ্কুর পরে গাছ। বিদ্রোহের জন্মও তেমনি প্রথমটায় মনের মধ্যে জন্ম নেয় শেষে তার ব্যাপ্তি হয় ধীরে ধীরে পরে একদিন সমস্ত বাধাবিপত্তিকে চুরমার করে ভেঙে বেরিয়ে আসে। সাড়া এসেছে মনে। বিদ্রোহের জন্ম নিয়েছে তার। এবারে তা ছড়িয়ে পড়বে এক মন থেকে অন্য মনে। রক্তের বীজাণুর মত এক রক্ত থেকে অন্য রক্তে সঞ্চারিত হবে।

ভাওনাথ চুপ করে সাধুর কথা শুনছিল এতক্ষণ। রক্তে তার আগুনের ঢেউ খেলছে। অনুভব করে সে তা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, জরিমানার টাকা যা দেওয়া হয়ে গেছে তাতো আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না তবে আমি কিছুতেই জাতভাইদের খানাপিনা দেব না।

সাধু বুঝতে পারেনি ভাওনাথের কথা। সে বিস্মিত স্বরে জিগ্যেস করে—কা ভেলেক ফিন ?

—সময় মত তলব পাইনি বলে জাতভাইদের খানাপিনা দিতে পারিনি তাই করমপুজোতে সর্দারের ঘরে নিমন্ত্রণ হয়নি আমাদের। জাত গিয়েছে। ভাওনাথের চোখে জল ছলছল করে।

সাধু কিন্তু একটুও বিষণ্ণ কিম্বা ম্লানবদনার ভাব দেখালো না সে সহজ সরল স্বাভাবিক গলায় হেসে বলল, কালে গোসা করলেক ? এ তো চিরকেলে পুরনো কথা। তোর আমার চোদ্দপুরুষ সয়ে আসছে এই অবিচার, অত্যাচার। আমাদেরও সইতে হবে কিন্তু এমন দিন আসবে যখন এই জুলুম আর অত্যাচার থাকবে না।

নতুন দিন আসবে, নতুন আলো, নতুন লোক, নতুন পৃথিবী। ভগবান এ-সহ্য কর বন না। ওরা যে তাঁকে হাতের পুতুল করে রাখতে চায়। কি দরকার ওখানে গিয়ে পুজো দেওয়ার? বাড়িতে নিজেদের পুজো নিজেরাই করগে। এতে করমগোঁসাই খুশী হবেন। মনে তৃপ্তি পাবি অনেক। নিজের কাজ কি অপরকে দিয়ে ভাল হয়? আর পুজো ত তোদের কলা হয়। মনের আকুলতা দিয়ে যাঁকে তোরা এত করে ডাকলি তিনি কি আর না দেখা দিয়ে থাকতে পারেন? যারা তোদের দূরে সরিয়ে রাখলে তোদের চোখের জল গিয়ে তাদেরই গায়ে পড়বে। আগুন হয়ে জ্বলবে তাদের অন্তরে সমস্ত দেহে।

ভাওনাথ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে পারছে সাধুর ওপর কি যেন একটা ভর করেছে। তার মন ও দেহের যাবতীয় শক্তি ফুটে উঠেছে চোখে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

ভাওনাথ যখন বাড়ি ফেরে বেশ রাত হয়েছে তখন। সাধুর কাথাগুলো শুনে মন কতকটা শান্ত হয়েছিল যাহোক্ কিন্তু বাড়িতে এসে সারা বাড়িটা শোক ও ক্ষোভের ম্রিয়মাণ ছায়া দেখতে পেয়ে আবার আগুন জ্বলে ওঠে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিতান্ত অসহায় ভাবে। দুর্বল মনে আরো অন্ধকার বিভীষিকার ছায়াপাত হয়। সেই অন্ধকারে তার ঘড় বাড়ি, সংসার সব তলিয়ে হায়।

এক হপ্তা বাদে তলব পায় তারা। মনে ফের বিদ্রোহ ঘোষণা করা সত্বেও মা বাবার মতের প্রতিবাদ করতে পারেনি। ভাওনাথ। তাদের চোখের দিকে তাকাতেই ওর সমস্ত দৃঢ়তার গ্রন্থি কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়। জাত ভাইদের খানাপিনা দেওয়া হয়। জাতে ওঠে ওরা। আবার হেসে ওঠে মানুষগুলি, তাদের ঘরবাড়ি, সংসার।

ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন এলো। আশ্বিনের প্রথম ভাগেই সুকুরমণির জন্ম হয়। ভাওনাথের বড় ভয় ছিল পাতির মেলাতে কাজ করতে করতে প্রসব না হয়। দুই বছর আগে সে যা নি ভর চোখে

দেখেছে সেই দৃশ্য আজো মনে আছে তার। তা ভাবতে শিউরে ওঠে সে। করমলালের স্ত্রীর একটি ছেলে হয় বাগানে কাজ করতে করতে। কী দুর্দশাই না হয়েছিল ঐ শিশু আর তার মার। মাখনের মত নরম তুলতুলে দেহ হাওয়া বাতাস পেয়ে একটুও শক্ত হয়নি তখন সেই অবস্থায় দেহের কয়েকটা জায়গায় ছাল যায়, কেটে যায় চৈত্রের সন্ত কলমকরা চা গাছের ছুঁচলো শক্ত ডালে। ভাগ্যিস চোখ দুটোতে লাগেনি তা হলে তো জন্মের মত অন্ধ হয়ে থাকতো। সেই ভয় কেটে গেছে তার। এ-ভয় আরো রুঢ় হয়ে দেখা দিত করমপুজোর কথা মনে হলেই। যা হোক এখন আর সে-ভাবনা নেই। রুকমিনের প্রসব নিরাপদেই হয়েছে বাড়িতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে ভাওনাথ। কয়দিন বাদেই তো জিতিয়া পুজো এই পুজোটা ভালভাবেই করতে হবে যাতে করমপুজো না দিতে পারার দোষটা খণ্ডন হয়। তবে আশু সমস্যা হচ্ছে নয়া জনমের খরচপত্তর নিয়ে। নয়া জনমের খরচ তো নিতান্ত কম নয়। অথচ হাতে একটি পয়সাও নেই। আবার তলব পেতে আরো দশ বারো দিন দেরি। আর ছয় দিনের মধ্যে যে করেই হোক আচার রীতি নীতি পালন করতেই হবে।

পাত্তির সময়ে সপ্তাহে একদিন পাত্তির পয়সা দেওয়া হয়। এপাওনাটা ঠিকার ওপরে উপরি পাওয়া। হপ্তা ধরে অত্যন্ত বৃষ্টিবাদল হওয়ায় বাসরা নদীর বাঁধ ভেঙে তার জল বাগানের মধ্যে বিপুল ভাবে ঢুকে পড়ায় কেউ ঠিকমত কাজ করতে পারেনি তাই পাত্তির উপরি পয়সা তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না।

এই একমাস আগে বৃষ্টি হয় না বলে সকলেই খুব ভাবনায় পড়েছিল। ভাবনা যে শুধু শ্রমিকদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তা নয়। সব চেয়ে বেশি চিন্তায় পড়েছিলেন ম্যানেজার। বেশি চা তৈরি করে ভাল কাজ না দেখাতে পারলে কোম্পানীর কাছে বদনাম হবে উন্নতিও হবে না। তার ওপর কমিশনের অঙ্কটা হয়ত শূন্যের ঘরে আটক পড়বে। এতে কোন ভয়ভীতি বা চিন্তা ছিল না ছোটসাহেব আর বাবুদের। তারা বরং মনে মনে খুশিই হয়েছিল। আগের মত পান চিবিয়ে সিগ্রেট ফুঁকে বেড়াও

সব সময়। শ্রমিক কামিনদের চিন্তা বাড়ে। কারণ তারা যে পাতির এই উপরি পাওনাটা দিয়ে তাদের মনের সখ মিটায়। সস্তা দামের সাবান, গন্ধ তেল, অটো দিলবাহার, শাড়ি জ্যাকেট ইত্যাদি কেনে। বাগানের দিকে তাকাতেই ওদের মনটা খিঁচিয়ে ওঠে ভগবানের ওপর, নিজেদের ভাগ্যের ওপর। গরীব দুঃখীর ফুটো কপালে কিছুই এগোয় না। ভাবে এক, হয় আর এক। পুরো একটি মাস বৃষ্টি হয়নি। এতে চা গাছের কচিকচি ডগাগুলো যা আগের সামান্য একটু বৃষ্টিতে লকলকিয়ে উঠেছিল তা সব শুকিয়ে খাক হয়ে গেছে। কচি পাতা—দুটি পাতা একটি কুড়ি রোদে পুড়ে আগুনে পোড়ানো ছোট সিঙি মাছের মত কালো চিমসে হয়ে গেছে। আসমানের জলের জন্য মেয়েরা পুজো করে। লাইনে লাইনে প্রতি ঘরে ঘরে তেল সিঁদুরের ফোঁটাকাটা জল ভরতি পিতলের ঘটির মধ্যে আমের নবপত্রযুক্ত শাখাগ্র ও দু'চারটে ফুল দিয়ে ঘুরে ঘুরে ভিখ মাগে। প্রত্যেক মেয়ের হাতেই ঐ-রকম এক একটা ঘটি। ওরা বাবুদের বাসায় ও সাহেবের কাছে অফিসে যায়। ওরা প্রতি বছরেই যখন এই পুজো করে এরকম করে থাকে। বাবুদের বাসায় বাবুয়ানিরা ঐ ঘটিগুলোর মধ্যে দু'চার পয়সা ছুঁড়ে ফেলে আর অফিসে বড় সাহের দেয় প্রতি ঘটিতে আট আনা করে। আগে চার আনা দিতেন—এখন জিনিস পত্রের দর বেশি হওয়ায় মেয়েদের অনুরোধ রক্ষা করে আট আনা দেন। অন্যান্য সকলের মত রুকমিনও এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। সে ও তাদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি, বাবুদের বাসা আর অফিসে যায়। বৃষ্টি হলো পুজোর দু'দিন বাদেই। বাগানটা হেসে ওঠে আবার, নতুন পাতি গজায় গাছে। গাছগুলোর যৌবনের দেহ রসে টলটলে চক্‌চকে। কিন্তু হঠাৎ এমন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হয় যে তার মধ্যে পাতি টিপা আদৌ সম্ভব নয়। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে বড়সাহেবের। হাবিলদার পুরনসিংহকে হাতী দিয়ে লাইনে লাইনে পাঠিয়ে অনেক বাড়ি, ঘরদুয়োর ভেঙে তছনছ করেন। ঘরে খাবার নেই—জঙ্গলের শাকপাতা কচু ঘেঁচু কান্দা কুড়িয়ে খেয়ে জীবন বাঁচায়। একটা টু শব্দ পর্যন্ত করেনি কেউ।

তারা জানে এটা তাদের প্রাপ্য। এ-রকম প্রতিবন্ধ রেহ দু'একবার ঘটে থাকে। এতে নতুন কিছু নেই।

নিরঞ্জনবাবু লোকটিকে খুব ভাল লাগে ভাওনাথের। তাঁর সঙ্গে পথে অনেক কথা হয়েছিল প্রথম দিনেই যেদিন তিনি তার ভয়সা গাড়িতে বাগানে আসেন। দরদমাখা মন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করেছিলেন তাকে। এই অসময়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতলে নিশ্চয়ই খালি হাতে ফিরে আসতে হবেনা তাকে এ বিশ্বাস তার আছে। সন্ধ্যার পর আশায় আশায় তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হয় ভাওনাথ। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। বাচ্চা চাকরটি গেছে ডাক্তারবাবুর কাছে ওষুধ আনতে। জ্বরে হাঁসফাঁস করছেন শুয়ে শুয়ে। ভাওনাথ 'বাবু' বলে ডাক দিতেই বিছানা থেকে জ্বরো কাঁপা গলায় সাড়া দেন। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢোকে ভাওনাথ। এই তার প্রথম, একজন বাবুর ঘরে ঢুকল। বাবুরা সাধারণত বাইরের কুলি মজুরকে ঘরে ঢুকতে দেন না। ঘরে ঢোকা তো দূরের কথা একটু কাছে গেলেই অনেক কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়। এমন কি ভাগ্য অপ্রসন্ন থাকলে পিঠে দু'একটা কিল চড় ও পড়ে। এরকম দু'চারটে ঘটনা তার জানা আছে। তার নিজের বেলাতেও এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য কিল, চড় লাথি গুঁতো খায়নি সে। তবে গালিগালাজ অনেক শুনেছিল কিরনবাবুর কাছে। পাতি ওজন করছিলেন তিনি। তাঁর বাঁ ধারে টুকরিটা রেখে প্রায় গা ঘেষে দাঁড়িয়েছিল সে এই তার অপরাধ। আর কিছুই নয়। তাঁর গায়ে গাও লাগেনি এতেই অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন আর হাত দিয়ে একটা ধাক্কা মেরেছিলেন। ভাগ্যিস কাছেই পাতিভরতি টুকরিটা ছিল না তা হলে হুমড়ি খেয়ে সানবাঁধা প্রস্তরে পড়ে দাঁত মুখ ভাঙতো আর কি! নিরঞ্জনবাবুর এই অপ্রত্যাশিত আচরণে ভাওনাথের মনটা অনেক খুশির ঢেউয়ে স্নান করে ওঠে। সেলামটা পর্যন্ত দিতে ভুলে যায়। এই থেকে ঐ লোকটির ওপর তার ধারনা আরো দৃঢ়তর হয়। শ্রদ্ধা ও ভা[illegible]তে মাথা নুয়ে পড়ে।

নিরঞ্জনবাবু বললেন—বহুৎ পিয়াস লাগা। থোড়াসে পানি দাও ভাওনাথ।

ঘরের এক কোণে ছোট একটি টেবিলের ওপর একটা সবুজ রঙের কাচের জার। তাতে জল। তার কাছেই একটা কাচের গ্লাস। ভাওনাথ জার থেকে গ্লাসে জল গলিয়ে নিরঞ্জনবাবুর কাছে ধরে।

ভাওনাথ জিগ্যেস করে—মুড় দরদ করোথে? মাথাটা টিপে দেব কি?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান নিরঞ্জনবাবু।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা টিপছে ভাওনাথ। নিরঞ্জনবাবুর শিয়রেই একটা কাঠের টুল। চোখ ইসারা করে সেটাতে বসতে বলেন তিনি।

ভাওনাথের বিস্ময় লাগে। বিস্ময় লাগার কথাও বটে। কারণ কোন বাবু কুলিকে টুলের ওপর বসতে দেয়না এবং এ কানেও শোনেনি সে চোখেও দেখেনি। অবাক চোখে নিরঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে ছিল।

নিরঞ্জনবাবু তার মনের ভাব বুঝতে পারেন। বললেন—ঠিক হায়, বইঠো টুলমে।

ছোকরা চাকর ওষুধ নিয়ে ফিরলো প্রায় এক ঘণ্টা পরে। এর মধ্যে কপালে জলপটি আর পাখার হাওয়া করায় মাথার যন্ত্রণাটা অনেকখানি কমেছিল নিরঞ্জনবাবুর। চোখমুখের লাল ভাব কেটে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। তিনি বললেন—যেমন বাঘ ভালুকের দেশ তেমনি তার জ্বর?

একথার উত্তরে ভাওনাথ বলে—তোমরা তো মানবে না বাবু—এদেশে বাস করতে হলে একটু আধটু হাড়িয়া কি মদ খাওয়া ভাল। একটু মদ কি হাড়িয়া খেলে আর এতটা ঘায়েল করতে পারে না জ্বরে। গা-গতর ব্যথাও হয় না। দেখ না আর আর বাবুরা তোমার মত অসুখে ভোগে না।

ভাওনাথের কথায় একটু হাসেন নিরঞ্জনবাবু। তিনি জানেন আর আর সকল বাবুরাই অল্পবিস্তর মদ খান। এই জন্য ওঁদের

সঙ্গে ওঁর যেন কেমন একটা ছাড়ছাড় ভাব। ওঁদের সঙ্গে সরল ভাবে মিশতেও পারেন না। ভয় ভয় লাগে তারপর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ভাল হয়ে উঠি শেষে তোর মদ খাওয়ার কথা শুনবো।

এতক্ষণ জ্বরের ঘোরে নিরঞ্জনবাবুর কি জানি খেয়াল ছিল না, জিগ্যেসও করেননি ভাওনাথকে কি জন্য এসেছে সে। এবারে জিগ্যেস করেন, কুছ কাম হায় ভাওনাথ ?

ভাওনাথ থতমত খায় প্রথমটায়। লোকটা জ্বরে ধুকছে কি করে তাকে তার আবেদন জানায়। হয়ত রেগে উঠবেন অথবা অসন্তুষ্ট হবেন। কি ভাববেন নিরঞ্জনবাবু। নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারে না ভাওনাথ। বললে, দশটা টাকা ধার দেবেন বাবু ?

হাঁ, না কিছুই না বলে নিরঞ্জনবাবু শিয়রের বালিশটার তলা থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে ভাওনাথের দিকে এগিয়ে ধরেন।

নোটটা নিতে ভাওনাথের দুর্বল হাতটা আনন্দ ও আতিশয্যে কেঁপে ওঠে। চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে জলে।

ঐ টাকা দিয়ে নয়া জনমের দায় থেকে মুক্ত হয় ভাওনাথ। তবুও একটা তীব্র বেদনা তার মনটাকে অহরহ কুরে কুরে খায়।

আশ্বিনের মাঝামাঝি জিতিয়া পুজো। আর মাত্র এক হপ্তা বাকি আছে। জোরতালে কাজ করলে এখন বেশ তু'পয়সা কামাই করা যাবে। বাগানে পাতির মরসুম পড়েছে। পাতি তো সব সময় সমানে থাকে না। মাসে সাধারণত তু'হপ্তা জোর থাকে আবার বাকি তু'হপ্তা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। ভাওনাথও অমানুষিক ভাবে কাজ করছে। তার মা বাপ ও স্ত্রীও করছে। নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে ধার করা টাকাটা যে-করেই হোক শোধ করতে হবে। রাতে বৃষ্টি আর দিনে রোদ পেয়ে অসম্ভব রকম পাতি এসেছে আর এই সঙ্গে গাছের গোড়াতে গজিয়েছে অজস্র জঙ্গল। যেমন পাতিটা সব টিপতে হবে আবার তেমনি ঐ আগাছা জঙ্গলগুলোও পরিষ্কার করতে হবে তা না হলে যারা পাতি তুলবে তারা তো গাছের কাছে ঘেষতে পারবে না। তাই দিনে পাতি তোলা আর রাতে ঝুরনি করার ব্যবস্থা করেছেন ম্যানেজার। রাত থাকতে মজুররা অনেকেই এই রাত ফাড়ুয়া বা ঝুরনিতে যায় আবার সুর্যোদয়ের আগেই ঘরে ফিরে তু'টো পান্তা ভাত মুখে দিয়ে আবার ছোটে পাতি টিপতে। এই রাত ফাড়ুয়া ও ঝুরনি শুধু মরদেই করে। মেয়েরা নয়। ভাওনাথ ও আর আর অনেকের মত রাত ঝুরনিতে যায় আবার ঘরে এসে চা পানি আর বাসি ভাত খেয়ে পাতি তুলতে দৌড়োয়।

বর্ষায় গাড়ির বেশি কাজ থাকে না বাগানে। গাড়ির কাজ শীতে। চৈইলি, খড়, বাঁশ, ঘরের খুঁটি ঢোলাই সবই শীতে। তখন গাড়ির কাজের অভাব থাকে না। এখন গাড়ির কাজ বলতে শুধু মাঝে মাঝে বাগানে পাতি ওজন হলে পাতিগুলো গুদোমে পৌঁছে দেওয়া। আর হয়ত কোন সময় তু'চারখানা গাড়ির দরকার হয় সে কেবল গন্ধক ভরা বড় বড় চোং বইবার জন্তে। এই গন্ধক-জল রোগাক্রান্ত গাছে ও পাতায় ছিঁটোয়। আর তু'একটা

গাড়ি যা লাগে তাও গাড়ি-চাপরাশির মর্জির ওপর নির্ভর করে। এজন্য অনেক গাড়িম্যানরা তার ফাইফরমাস খাটে। ভাওনাথ তা পারে না। আগে পারত। এখন যেন তার মন বদলে গেছে। তাই গাড়িটা খুলেখালে ঘরের এককোণে রেখে দিয়েছে যাতে বৃষ্টির জল পেয়ে পঁচে না যায়। আবার কার্তিকের শেষাশেষি কি অঘ্রাণে সেটাকে জুড়ে জুতে ঠিক করে নেবে।

দেখতে দেখতে জিতিয়ার দিন এগিয়ে এল। ভাওনাথ রাতের ঝুরনি সেরে পাতির মেলায় নিয়ে পাতি টিপছে। মনটা অনেকদিন বাদে কেমন একটা খুশির আমেজের ঢেউ খেলছে। মাসের তলবটা কাল পাওয়া গেছে। অন্য মাসের তুলনায় এমাসের তলবের অঙ্কটা বেশ ভারি। কাল পাতির পয়সা পাওয়া যাবে। এই উপরিটা তলবের চেয়েও বেশি হবে। ভাওনাথ কর গুনে হিসেব করে। কাল পর্যন্ত আট টাকা এগারো আনা তিন পয়সা পাওনা হয়েছে। এ পাঁচ দিনের কামাই। তাহলে দিনে গড়পরতায় পড়ছে গিয়ে প্রায় এক টাকা বারো আনা। আজকার কামাইটা এক টাকা বারো আনা না হলেও এক টাকা চার আনা এক পয়সা নিশ্চয়ই হবে। তাহলেই তো দশ টাকা হয়ে গেল। নিরঞ্জনবাবুকে এই দশ টাকা দিয়ে দেবে। আর তলবের টাকাতে জিতিয়া পুজোর সব খরচ ভাল ভাবেই হয়ে যাবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। কাল উপবাস। রুকমিনের উপোস করতে হবে। নতুন একটা কাপড় আর চোলো লাগবে। তা তো কাল তলব পেয়েই কিনেছি। আতপ চালও কেনা হয়েছে। রুকমিনকে যে পরশুদিন দশমীর দিনে স্নান করে নতুন কাপড় জামা পরে এক ঠোঙা আতপ চালের ভাত খেতে হবে। যাদের সন্তান মারা গেছে তারা তো একটা জীবন্ত মাছ গিলে খাবে। রুকমিনের সে-সব প্রয়োজন নেই। তবে একটা তাজা মাছ কিনতে হবে, সেটা জিতিয়া পুজোর জায়গায় একটা গর্ত করে সেই জলে ছেড়ে দিতে হবে। জিতিয়া পিপুল গাছের একটা ডালও সংগ্রহ করতে হবে। সেইটে পুতেই তো জিতবাহনের পুজো। ফুল বেলপাতা আর যা লাগবে সে-সব তো রুকমিনই জোগাড় করবে।

তন্ময়তা কাটে একটা শব্দে। কামদারি, চাপরাশি প্রভৃতি সবাই চেয়ে আছে রাস্তার দিকে। বড়সাহেব মোটর হাঁকিয়ে আসছেন। ভাওনাথ জীবনে এই প্রথম মোটর দেখতে পায়। শুধু ভাওনাথ কেন বাগানে হাজারে একজন তার আগে মোটর দেখেছে বলে মনে হয় না। আর দেখবে কেমন করে? মফস্বল শহরগুলোতেই তখন মোটরের আমদানি হয়নি তার চা বাগানে। এই জঙ্গলে, পাহাড়ে উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা রাস্তায়। আর রাস্তা-ঘাটই বা কোথায়? সাহেব মেমেরা সবাই টমটমে চড়ে। ঘোড়ার রাশ ধরে টমটমের ছাদের ওপরে বসে থাকে দাড়িওয়ালা সহিস। ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্‌ আর সহিসের চাবুকের সপ্‌সপ্‌ শব্দ এসে লাগে নিরীহ গোবেচারিগুলোর বুকে। কে কোথায় পালাবে তার দিশে পায় না। কেউ বা একটু ভয়ে ভয়ে সাহসে ভর করে এগিয়ে যায় সামনে। তবে চাবুকের সীমানার বাইরে। মাটির সঙ্গে মাথা নুয়ে সেলাম ঠোকে। কাঁপা গলায় বলে, সেলাম মেমসাহেব, সেলাম বড়সাহের, সেলাম হুজুর। আবার সহিসের দিকে চেয়ে দেখে তার উদ্ধত চাবুকের গতি কোন দিকে। টমটমের ভেতর থেকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ আর বিদ্রূপের হাসির রেশ আসে তবু বুকখানি ফুলে ওঠে গর্বে, নিজেকে ধন্য চরিতার্থ মনে করে। শত পুরুষের পুণ্য একদিনে। দেব দর্শন।

এক বছর হয় রিটায়ার করেছেন ডবসন সাহেব। তাঁরই জায়গায় এসেছেন মঙ্ক সাহেব। বড় সৌখীন সাহেব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পোষাক বদলি করেন পাঁচবার। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ এগিয়ে দেওয়া, জুতো পায়ে পরিয়ে ফিতে বেঁধে দেওয়ার জন্য আছে একটি চাকর। তাকে 'বয়' বলে ডাকেন তিনি। সকাল সাতটায় কুঠী থেকে জামা জুতো পরে আসেন মঙ্ক আবার বাগান ঘুরে এসে সেটা ছেড়ে ফেলেন এগারোটায়। বিকেল তিনটেয় আসেন আবার চারটেয় বাগান ঘুরে এসে বদলি করেন।

বিরাট একটা দৈত্যের মত গুরুগম্ভীর চেহারার লোক মঙ্ক। হেঁটে যান মাটি কাঁপে। হাত পাগুলো যেন লোহা। চোখ দুটো ইয়া বড় বড় ঘোলাটে শ্বেতপাথরের মার্বলের মতো। চোখের

মণি ঘুরলে ভয় হয়, এই বুঝি ছুটে এসে গিলে খাবে। সবাই বলে রাক্ষুসে সাহেব। গুমড়োমুখো। কিন্তু এই লোকের মুখেও হাসি ফুটতো কখনো কখনো। সে হাসি এক পদমমায়া ছাড়া অপর কেউ দেখতে পায়নি।

এই মন্ধ সাহেবই সকলের আগে এই জঙ্গলের দেশে মোটরকার আনেন, জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি তিনিই করেছেন প্রথম। এজন্য বহু অর্থব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে। স্টেশন থেকে বাগান অনেক দূরে। পথে ঘন বন। বনের ভয়সাগাড়ি যাতায়াতের রাস্তাগুলোর প্রায় সমস্ত জায়গাতেই খড়কুটো পেতে আর গর্তগুলোকে নদী থেকে বালু নুড়ি পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বুজোতে হয়েছে। এ কেবলমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল কারণ তিনি ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ভাগনে। বাগানে এসেই রিপোর্ট দেন যে রাস্তাঘাট তৈরি করা নিতান্ত প্রয়োজন, তার পরেই না এই রাস্তাঘাট আর মোটরের ছড়াছড়ি। এখন তো মোটরে মোটরে ছেয়ে গেছে এ দেশে।

এখানে কি স্টেশন ছিল আগে? এই স্টেশন তো হলো সেদিন। এখনো পুরো দশ বছর হয়নি। কর গুনে হিসাব করে ভাওনাথ। হাঁ, দশ বছর হলো। এখানে ছিল বনজঙ্গল, হিংস্র পশুর বাস। দিন দুপুরে চরতো বাঘ, ভালুক, হাতী, শুয়োর। এই বনের ধারেই ছিল মজুরদের কতকগুলো ঘর। ঘর নয় কুঁড়ে। প্রতি বছর বর্ষার সময় হাতীর কি উপদ্রব হতো। কত মজুর ঘর ছাড়া হতো আবার অনেকের জীবন হাতীর শুঁড়ে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে শেষে পায়ের তলে পিষে যেত। কে খোঁজ রাখত এসব?

এই স্টেশনের নাম করণ নিয়ে কি কম লড়াই হয়েছে? লড়াইটা হয় এই বাগান থেকে তিন মাইল দূরে জীবনপুর বাগানের ম্যানেজার মিঃ ফারলং আর দলমাননগরের তদানীন্তন ম্যানেজার উড্‌থ্রোপের মধ্যে। একদিন তো ক্লাবে দু'জনেই মদ খেয়ে সোডার বোতল ছোঁড়াছুড়ি করেন। শেষ পর্যন্ত মিঃ ফারলং-এর জয় হয়। স্টেশনের নাম হলো ফারলংপোত।

এই স্টেশনের রেললাইন দলমাননগরেরই বুকের ওপর দিয়ে গিয়েছে। রেললাইনের দু'ধারেই সারবাঁধা চায়ের চাষ আর তার লাগোয়া কুলিমজুরের ঘর। তার একটু দুরে বাবুদের বাসা তারপর আরো অনেকটা দুরে সবুজ বনে ছোট নীলচে পাহাড়ের উপরে দুই একটি ইন্দ্রভবন। এগুলি সাহেবদের বাংলো। রেললাইনের ধারেই স্কুল। দিনে গাড়ি যায় আসে ছ'বার। ছটা, আটটা, এগারোটা, দুটো, চারটে আর সাড়ে পাঁচটায়। ছেলেগুলো গাড়ি দেখে চীৎকার করে ওঠে। গাড়ির লোকগুলোকে মুখ ভেঙচায়, কিল, চড় ঘুঁষি দেখায়। মাষ্টার ছেলেগুলোকে শাসায়। অস্ফুট ভাষায় বিড়বিড় করে বলে, এগুলো যে কবে মানুষ হবে। কবে এরা নিজেদের ভাগ বুঝবে, হিসেব শিখবে? কবে সত্যিই সুস্থ হয়ে দেশ হাসবে, চিরে চৌচির হবে পাষাণের বুক, পাহাড় ধ্বসে পড়বে!

তলব ও পাতির ডবলি পয়সা পেয়ে নিরঞ্জনবাবুর কাছে যায় ভাওনাথ। টাকা ধার লওয়ার পর থেকে সে প্রায়ই যায় সেখানে। তাঁর সঙ্গটা খুব ভাল লাগে ভাওনাথের। মজুরদের দুঃখদৈন্য সত্যিই তিনি অন্তরে অন্তরে আন্তরিকভাবে অনুভব করেন কিন্তু টু শব্দটিও করতে পারেন না। কতকটা অভাবে আর ভয়ে। নিরঞ্জনবাবু কলে হাতমুখে জল দিচ্ছিলেন তখন তাই কোমর থেকে সরু মুখওলা একটা কাঠের খৈনির ডিবে বার করে বাঁ হাতের তালুতে খানিকটে চুণ মিশানো তামাকের গুড়ো পাতা ঢেলে নিয়ে ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটু ডলে সেটাতে দু তিনটে থাবড়া মেরে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে মারে। তারপর সেটা আবার কোমরে গুজে রাখল। এরমধ্যে নিরঞ্জনবাবু এলেন। দশ টাকার নোটটা আগেই হাতের মুঠোয় রেখেছিল তাই তিনি আসতেই একটা সেলাম ঠুকে সেটা তাঁর দিকে ধরে।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, কি দরকার অতগুলো টাকা একসঙ্গে দেওয়ার? মাসে মাসে দু'এক টাকা করে দিস ভাওনাথ তাতে তোর গায়ে লাগবে না। সব একসঙ্গে দিলে খাবি কি তোরা? কিই বা তলব পাস?

ভাওনাথ সত্যিই খুব আনন্দ পায় এসব কথা ভাবতে। তাহলে নিরঞ্জনবাবু নিশ্চয়ই তাদের কথা ভেবে থাকেন। সত্যি, ওরা কি এমন তলব পায় ? পুরো দুবেলার কাজে পুরুষে চার আনা, স্ত্রীলোকে তিন আনা আর ছেলেমেয়েরা ছ'পয়সা। এতে তো পেটের ভাতই জোটে না। এছাড়া আরো অনেক অপরিহার্য খরচ খরচা আছে সেগুলো চলে কি করে ? পাতি তো আর বারোমাস টিপা হয় না। পাতি টিপা হয় বছরে আট মাস। তবে এই আটমাসেই ডবলি পয়সা পাওয়া যায় না। এটা পাওয়া যায় ছ'মাস। এই ডবলি পয়সাটা পেয়েই যাহোক ঘরের ছেলেমেয়েগুলো তাদের সখ মেটায়। দুটো রেশমি কাঁচের চুড়ি, সস্তা গন্ধ তেল একটা আধটা জামা বা পাটের শাড়ি।

ভাওনাথ বলল, লাগে পরে নেব আবার। এবারকার মত রেখে দেও।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। কি যেন ভাবছিলেন নিরঞ্জনবাবু।

ভাওনাথ বলে ওঠে, আচ্ছা বাবু, আপনি কি আমাদের কথা ভাবেন ?

নিরঞ্জনবাবু একটু হেসে বললেন, ভাবি বৈকি ? ভাবি তোদের কথা, আমরা এই তথাকথিত বাবুদের কথা, সাহেবদের কথা, এমন কি দেশের কথাও। জানিস ভাওনাথ, লোকগুলোর কেবল ভয় আর ভয়। আর দু'একজন যাঁদের ভয় নেই বা ভয় করবার মত কোন কারণ নেই তাঁরাও দেখান যেন কত ভয় তাঁদের এর মানে অন্য কিছু নয় তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে চান না। একই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কতো বিভিন্ন ভাব। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ হাসায় আবার কেউ কাঁদায়।

কথাগুলো কেমন যেন বেমানান হয়েছে। হয়ত এগুলো ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে তাতে তার সমুহ ক্ষতি। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে নেন অন্য কথা দিয়ে। বললেন—আচ্ছা, ভুটকা কি করে তার বউকে মেরেছিল ভাওনাথ ?

—ভুটকার খুব রাগ ছিল তার বউয়ের ওপর আগে থেকেই। বড়বাবুর সঙ্গে তার ঘন অন্তরঙ্গতা ছিল। একথা সবাই জানতো।

ভাওনাথও জানতো। ভুটকা অনেকদিন বারণ করেছিল তার জিরুয়াকে কিন্তু জিরুয়া মানেনি বরং দৃঢ়তরভাবে অস্বীকার করে। ভুটকা তলে তলে হাতেনাতে তাকে ধরার জন্যে চেষ্টা করে। সেদিন হঠাৎ ঠিক সন্ধ্যাবেলাটায় তার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপে। সে জিরুয়াকে বললো, খবর পেলাম চাচার অসুখ। তাকে দেখতি যাচ্ছি জীবনপুরে। আজ আর ফিরবো না, কাল সকালে এসে কাজে যাব। অথচ তার চাচার কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি আর সেও যায়নি সেখানে। সে গিয়েছিল জটু লাইনে তার বন্ধু পোকোর বাড়ি। খুব করে মদ খায় সেখানে। তারপর ঘরে ফেরে রাত এগারোটায়। তখন ঘন অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ঘরে এসে দেখতে পায় ঘর বাইরে থেকে তালা বন্ধ। অতি সন্তর্পনে সুড়সুড় করে হেঁটে যায় উত্তরের নরম গুদোমের দিকে। নরম গুদোমের কাছেই হাবিলদারের ঘর। হাবিলদারের ঘরের নিকটে যেতে না যেতেই দেখতে পায়, নরম গুদোম থেকে দুটো লোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

নিরঞ্জনবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ভাওনাথ তা বুঝতে পেরে বললো—আর বলেন কেন বাবু, এই উত্তরের নরম গুদোমটা হয়েছে যত সব প্রেমিক প্রেমিকার গোপন আমোদ প্রমোদের রঙমহল। এখানে অনেকরকম অভিনয় হয়, কত যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে তার ইয়ত্তা নেই।

নিরঞ্জনবাবু কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়েন—ভাবেন, এই কুলিদিগকে সাহেববাবু সকলেই নোংরা, অপরিষ্কার ও কুৎসিত বলে ঘৃণা করে, কাছে ঘেঁষতে দেয় না অথচ প্রেম করবার বেলায় সে-সব কথা তাদের মনে থাকে না। অদ্ভুত প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির এই লোকগুলো। এদের কথা ভাবতে নিরঞ্জনবাবু কেমন অস্বস্তি অনুভব করেন। তার চোখেমুখেই-এর ছায়া ফুটে উঠেছিল।

ভাওনাথ বলে চলে—ভুটকা ওদের দেখতে পেয়ে হাবিলদারের ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। এরমধ্যে বড়বাবু ও জিরুয়া বেরিয়ে যে যার পথে চলে যায়। ভুটকা জিরুয়ার পিছু পিছু আসে। জিরুয়া দেখতে পায়নি তাকে। তালা খুলছে জিরুয়া। সেই

অবস্থায় ভুটকা পিছন থেকে গিয়ে ঘুঁষা বসিয়ে দেয় তাকে। এ-নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বচসা চলতে থাকে। জিরুয়া প্রমাণ করতে চাইছিল যে বাইরে পায়খানাতে গিয়েছিল সে। জানেন তো আপনি, কুলিরা বড় একটা জল নিয়ে পায়খানায় যায় না। তারা গাছের পাতাপুতি দিয়েই ময়লাটা পুছে ফেলে। সুতরাং একথার অন্য কোন প্রমাণ হবে না তাই ভেবেই জিরুয়া এই কথা বলেছিল তাকে। কিন্তু ভুটকা যে নিজে চোখে দেখেছে তা জানতো না সে। ভুটকা খুব রেগে যায় এই মিথ্যে কথায়। জিরুয়ার কাপড়টা ধরে টান মেরে তাকে উলঙ্গ করে ফেলে। কাপড়টা টান মারাতে ঝনঝন শব্দ হয়। ভুটকা অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায় পাঁচটা টাকা। রূপোর টাকা, চক্‌চক্‌ করছে। এবারে আর দ্বিতীয় কথা জিগ্যেস না করেই ভুটকা তার বুকে একটা ঘুষি মারে। ঘুষি খেয়ে জিরুয়া মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং আর জ্ঞান ফেরেনি তার।

একটুক্ষণ বাদেই ভাওনাথ বুঝতে পারে যে জিরুয়ার মৃত্যুরহস্য সবই তাঁর জানা আছে। তাঁর এ-প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য কি তা এবারে স্পষ্ট করে জানতে পারে ভাওনাথ।

নিরঞ্জনবাবু একটু দম নিয়ে ধীর সুস্থ ভাবে হেসে বললেন, তাহলে তুই বুঝলি যে মদ খেয়ে মানুষ অনেক সময়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার মধ্যে একটা দৈত্যের আবির্ভাব হয়। সে তখন আর মানুষ থাকে না জানোয়ার হয়ে যায়। তবে কেন তুই আমাকে সেদিন মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিস? আর মদ খেলে মানুষ যখন জানোয়ার হয়ে যায় তখন তা জেনে শুনে তোরাই বা খাস কেন ওটা?

ভাওনাথের সেদিন থেকেই মাঝে মাঝে কেমন অশান্ত হয়ে উঠতো মনটা। মদ খাওয়া সম্বন্ধে নিরঞ্জনবাবু যা বলেছেন তা সবই ঠিক। এ-সমস্তই তার জানা ছিল তবু এতটা তলিয়ে দেখবার মত মনোবৃত্তি তার এর আগে জন্মেনি। এবারে মনে পড়ে গোদার মরার কথা। সেও এমনি করে মদ খেয়ে মারামারি করে প্রাণ হারায়। ফাল্গুন মাস। ফাগুয়ার জন্যে বাগানের ছুটি ছিল সেদিন। কুলিদের বিশেষ করে আদিবাসীদের এ একটা বড়

পরব। এই পরবে সর্দারেরা তাদের নিজ নিজ পার্টির কুলিদের গোস হাঁড়িয়া পানি খাওয়ায়। কারণ সর্দারের তাদের কাজের প্রতি হাজরির ওপর এক পয়সা কমিশন পায় তাই বছরের দুটো দিন অর্থাৎ এই ফাগুয়া আর বড়পুজোতে তারা তাদের কুলিদের নিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ করে।

রাগদা আর গোদা দুজনেই এই পরবে ঝগরন সর্দারের বাড়িতে আর আর সকলের সঙ্গে মদ খেয়ে নাচগান করছিল। মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বৃত্ত আকারে তালে তালে নাচছে, গাইছে আর মরদগুলো কেউ মাদল বাজাচ্ছিল আবার অনেকে তাদের তালে তাল মিলিয়ে মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে এ-ওর গায়ে ঢুলে পড়ছে। রাগদা মাদল বাজাচ্ছিল আর গোদা নেশার ঘোরে বেতাল তাল দিচ্ছিল। এদের দু'জনের মধ্যে আগে থেকেই একটা গরমিল ছিল কি জানি তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে গোদাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এর কারণ জিগ্যেস করলে সকলকে সে বলেছিল, গোদা তার হাতে আর পায়ে বেতাল তাল ঠুকে ঠুকে তার ছন্দ কেটে দিচ্ছিল। এতে গোদা রেগে রাগদাকে একটা চড় মারে। তারপরই বীরবিক্রমে রাগদা গোদাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকে আঘাত করে। বুকের আঘাতটা বোধ হয় খুব জোরেই লেগেছিল তাই এতেই তার মরণ হয়।

এ-সব ভাবতেই মনে মনে পণ করে ভাওনাথ—মদ খাওয়া ছাড়তে হবে তাকে, সমাজের লোকগুলোকেও বুঝিয়ে দিতে হবে এর কুফল।

এরপর সত্য সত্যই অল্পদিনের মধ্যে মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় ভাওনাথ। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। হাঁড়িয়ার গন্ধ তাকে পাগল করে তুলতো। ঘরে ঘরে হাঁড়িয়ার ধুমধাম চলতো মনটা কুঁক কুঁক করে উঠতো, ইচ্ছা হতো ছুটে যায় সেখানে কিন্তু তক্ষুনি মনটাকে দৃঢ় করে অন্যদিকে সরে পড়তো যেখান থেকে হাঁড়িয়ার গন্ধ পাওয়া যায় না। রুকমিনকেও মদ ছাড়িয়েছিল সে। মা ও বাবাকে ও প্রায় ছাড়ো ছাড়ো করে এনেছিল হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যেই তারাও ছেড়ে দিত কিন্তু তাদের কষ্ট করে

ছাড়তে হয় না। এর ব্যবস্থা এক এক করে নিষ্ঠুর নিয়তিই করে দেয়।

এতদিন কেমন যেন শীতের রোদের মত মনমরা হয়ে পড়েছিল রুকমিন। এবারে জিতিয়া পুজো হয়ে গেছে ভালভাবেই তাই তার মনটাও শান্ত, সুস্থ হয়েছে। করম পুজো নানা গণ্ডগোলে করতে পারেনি। মনে মনে ভয় ছিল পাছে এই করম আর জিতিয়া পুজোর মাঝখানেই একটা কিছু অমঙ্গল না ঘটে।

এরপর বড়পুজো এল। চা বাগানে কোথাও এ-পুজো হয় না। শতকরা নিরনব্বই ভাগেরও বেশি শ্রমিক এই পুজো দেখেনি কখনো। দু'একজন যারা দেখেছে তারা কুচবিহার রাজবাড়ি গিয়ে দেখে এসেছে। রুকমিনের খুব ইচ্ছে এই পুজো দেখবার। এবারে নানা ঝামেলার জন্য তার সাধ মেটেনি। সাধ মিটেছিল এর অনেক পরে।

পুজোর কথা মনে হতেই আবার নিরঞ্জনবাবুর কথা জাগে মনে। এখন তো অনেক বাগানেই পুজো হয়। কিন্তু বাগানে পুজোর গোড়াপত্তন করেন এই নিরঞ্জনবাবু। তিনিই সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন, কিইবা এমন একটা খরচ লাগবে অথচ কুলিরা তোমার উপর খুব খুশি হবে এতে। সারা ডুয়ার্সে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যায়। সেই থেকে নিরঞ্জনবাবুকে সকলেই চিনলো। বাগানের মজুররা সত্যিই খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল নিরঞ্জনবাবুর ওপর। চারদিন রাত দিন সমানে আমোদ আহ্লাদে কাটিয়াছে ছেলে-মেয়েগুলো। পুজোর মণ্ডপের সামনে খোলা জায়গায় মেলা বসিয়েছিলেন তিনি। সেই মেলা থেকেই রুকমিন তার নিজের জন্য কানের ঝুমকো আর সুকুমণির জন্য রেশমি চুড়ি, একটা বাঁশি আর একটা কড়ে পুতুল কিনেছিল।

নিরঞ্জনবাবু লোকটা অনেক কিছুই করেছেন মজুরদের জন্যে। এই যে প্রাইমারি স্কুলটা এটাও তাঁরই করা। আগে তো আর কোন স্কুল ছিল না চা বাগানে। স্কুলের কথা উঠলেই সাহেবরা বলতেন, মজুরদের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখলেই তো যতসব গোলমালের সৃষ্টি করবে।

এছাড়া ঐ যে রেলের ফটকটা ওটাও তো তাঁর জন্য হয়েছে। বাগানের বুকচিরে রেললাইন বসানো। তার একটা জায়গায় দু'ধারেই মজুরদের ঘর। মা বাপ যায় কাজে। ছেলেগুলো সেখান গিয়ে হুড়োহুড়ি করে বেড়ায়। এর ফলে দুদিন দুটো ছেলে রেলে কাটা যায়। তাতেও ফটক তৈরি হয়নি কিম্বা বাগানের ম্যানেজারও এজন্য কোন মাথা ঘামাননি। তারপর নিরঞ্জনবাবুই না ফটকটা করালেন। কলমের জোর ছিল খুব। লেখাপড়াও জানতেন ভাল। তখনকার দিনে তো আর ভাল লেখাপড়া জানা বাবু এই বাঘ ভালুকের দেশে আসতো না। তবে নিরঞ্জনবাবু তাঁদের ব্যতিক্রম। ম্যানেজারকে বলেছিলেন গাড়ির যাতায়াতের সময় ক্রসিংটাতে চৌকিদার রাখতে কিন্তু ম্যানেজার মানেননি তাই রেলের সঙ্গে অনেকদিন ধরে লেখাপড়া করে তবে সফল হন।

রুকমিনের ইচ্ছে হয়েছিল সেবারকার পুজোটা নিজেদের বাড়িতেই করে। মাকে বলেছিল সে-কথা। মাও খুশি হয়েছিল। বলেছিল, ভাল কথা ; যে দশা লেগে আছে জিতবাহনের পুজো বাড়িতে ভালভাবে করলে নিশ্চয়ই ঝড়ঝাপটা আপদ বিপদগুলো কেটে যাবে। একটু খরচ বেশি হবে এই যা। তা হোক গে। দশায় পড়ে যে টাকা ঝড়ের মত উড়ে যাচ্ছে তার চেয়েতে বেশি হবে না ঠিক।

জিতিয়া পুজো ভালভাবেই হয়ে গেল। নবমীর দিনে পুরো উপবাস করেছিল রুকমিন। মাও করেছিল। লাইনের আরও অনেকে করেছিল। ভাওনাথ জিতিয়া পিপুল গাছের একটা ডাল এনে দিয়েছিল একটা জায়গা পরিষ্কার করে গর্ত খুঁড়ে ঐ ডালটা পোতে রুকমিন। পুজো করে। শেষে জিতিয়া কাহিনী শোনায় সবাইকে, দশমীতে স্নান করে একধোওয়া আতপ চালের ভাত খায়। যাদের ছেলেমেয়ে মারা গিয়েছে তারা ছোট একটা করে তাজা মাছ গিলে খেল। সারারাত নাচগান হরিহল্লা চলে।

> "রিমিঝিমি রিমিঝিমি পাইন বরিষে
> যখন পাইন বরিষে
> গোই ঝটনীকা বুন্দা তরে পাইন লটকে,
> গোই ঝটনীকা বুন্দা তরে পাইন লটকে॥"

শেষে ভোর না হতেই সকলে জিতবাহনকে নিয়ে নদীতে গিয়ে বিসর্জন দেয়। যারা উপবাস করে তারা ঘরে ফিরে শসার বিচি গিলে খায়। সেটা খেয়ে নিজেই জিগ্যেস করে কি খেলে ? সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেই জবাব দেয়—(নিজের ছেলেমেয়ের নাম ধরে) ফলনার রোগ ভোগ গিলে খেলাম। রুকমিনও করেছিল সে-সব। ভাতের মাড় জিতিয়ার গোড়ায় ঢেলে দিয়েছিল। ভাত ডাল তরি-তরকারি রান্না করে পাড়াপড়শিকে খাইয়েছিল।

পুজোর পর সত্যিই বাড়ির সকলের মন শান্ত ও সুস্থ হয়। অনেকদিন পরে যেন বাড়িতে আবার সূর্যের মুখ দেখতে পায় ওরা।

একমাস যেতে না যেতেই কালীপুজো এল। পুজো অবশ্য বাগানে কোথাও হয় না। কিন্তু এই পুজোর রাতে আর তার পরবর্তী দিনটাও বেশ একটু আমোদ আহ্লাদ করে কাটায় মজুরেরা বিশেষত পাহাড়ী মেয়েগুলো। আদিবাসীরা অবশ্য পুজো উপলক্ষ্য করে নাচগান করেনা তবে চা কামানের ছুটী থাকে বলে ওরাও হাঁড়িয়া পান করে নাচগান করে। পাহাড়ী মেয়েগুলো পুজোর রাতে দল বেঁধে বাবুদের বাসায়, সাহেবদের কুঠীতে যায়, নাচগান করে, বকশিস চেয়ে নেয়। এই পুজোর রাতটাকে মেয়েরা সত্যই মুখর করে তোলে। সকলেই অল্পবিস্তর রকশি খেয়ে নেয়। এ রাতে তাদের অবাধ গতি এবং এজন্য তাদের বুড়োরা (স্বামী) কোন ওজর আপত্তি করে না। "রকশি" এরা নিজেদের ঘরেই তৈরি করে। এ কাজ খুব গোপনে করতে হয়। চারিদিকে সরকারের চর ঘোরে। কামানের মধ্যেই তাদের মাইনেকরা লোক আছে। আর এ ছাড়া এসব খবর রাখত ঐ ভুঁড়িওয়ালা রামপ্রসাদ কালোয়ার। সে সদরে গিয়ে টুক করে লাগিয়ে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে আবগারি পুলিশ এসে ওদের হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে নতুবা ম্যানেজার সাহেবের জামিনে ছেড়ে দেয়। মামলা হয়। একতরফা মামলা। জরিমানা হয়। জরিমানা দিয়ে তবে শ্রীঘর থেকে খালাস হয়ে আসে।

নেপালী মেয়েরা বড় রাস্তা দিয়ে গান করতে করতে এগিয়ে চলে—

শিলিগুড়ি বাটো রেলগাড়ী আয়ো
কাঞ্ছি নানী যাঞ্ছ কি যানদই না।

ওরা প্রথমেই বাবুবাসায় আসে তারপর সেখান থেকে সাহেবদের বাংলোতে যায়।

প্রতিবারের মত এবারেও একদল মেয়ে কুঠীতে গিয়ে নাচগান শুরু করে। বড়সাহেব দোতালায় ছিলেন। মেয়েদের গান শুনে নিচেয় নেমে আসেন তিনি। মেমসাহেব আসেননি। তাঁর অসুখ। প্রতিদিনই কমবেশি পেটের ব্যথায় ভুগছেন কিছুদিন

থেকে। সেদিন ব্যথাটা আরো জোর করে। বড়সাহেব সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। তাঁর জুতোর খটখট আওয়াজ শুনতে পেয়ে দলের রানী পদমমায়া সবাইকে চোখ ইসারা করে খুব জোরে গানের কলি আবৃত্তি করে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আর আর মেয়েগুলোও গাইতে থাকে। ওদের সুর ও ছন্দ লহরিতে নিঝুম বাংলোটা আরামে দোল দিয়ে ওঠে।

পদমমায়া সুরূপা। পাহাড়ী ফর্সা রঙের সঙ্গে আলতা মিশানো গায়ের ত্বক। লাল ঠোঁট আর চিবুক দুটো দিয়ে যেন রক্ত চুঁয়ে পড়ছে। সুগোল নিটোল দেহ। তাতে উনিশ বছর বয়সের জোয়ারের অবাধ্য দুরন্ত ঢেউ। টগবগে চেহারা। রূপ আর স্বাস্থ্য মিলে এক অপরূপ সৃষ্টি। কথায় গানের কোমল মিষ্টি সুর আর চোখে কবিতার ছন্দ। মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন আত্মভোলা হয়ে পড়েন মঙ্ক। নিষ্পলক দৃষ্টি। মেয়েগুলোর মুখে হাসির তুবড়ি ফুটছে। কোন খেয়াল নেই মঙ্কের, শুনতে পাচ্ছেন না হাসি। এর মাঝে এক ফাঁকে ঠেলাঠেলি করে পদমমায়াকে তাঁর গায়ের ওপর ঠেলে ফেলে দেয় মেয়েগুলো। সাহেব ধাক্কাটা সামলিয়ে নিয়েছিলেন বটে কিন্তু কি একটা উঁচু নরম মাংসের দলা তাঁর হাতে বাধে। পদমমায়া মুখটি উঁচু করে একবার মঙ্কের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে হাত দিয়ে বুকের কাপড়টা ঠিক করে নেয়।

এর চার পাঁচদিন বাদে আর পদমমায়াকে বাগানে আওরাতের মেলাতে দেখতে পায়নি কেউ। সাহেবের মালিবাড়িতে কাজ নিয়েছে সে। তার দেহ ও অঙ্গসৌষ্ঠব আরো সুপুষ্ট ও টলটলে হয়েছে। কাপড়জামার চেহারাও বদলে গেছে। আগের মত বিটকেলে গন্ধ আসে না গা থেকে।

এর দুইমাস পরে হঠাৎ মেমসাহেবের অসুখ অত্যন্ত বেড়ে পড়ে একদিন। কলকাতা নার্সিং হোম থেকে নার্স আসে। নার্স বাগানে ছিলেন পুরো একটি মাস। এই একমাস নার্সকে সাহায্য করবার জন্যে মঙ্কসাহেব পদমমায়াকেই ঠিক করেন। পদমমায়ার কাজে সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলেন নার্স। আশ্চর্যও হয়েছিলেন খুব, একটা দেহাতী পাহাড়ী মেয়ে যে এই অল্পদিনের মধ্যে তাঁর

সেবাযত্নের সমস্ত আদবকায়দাটা আয়ত্ত করবে এ ধারণা তাঁর ছিল না। তাই কলকাতা ফিরে যাওয়ার সময় মঙ্ক ও মেমসাহেবের কাছে তার উচ্চপ্রশংসা করেন। একটা প্রশস্তি পত্রও দেন পদমমায়াকে। আর মিসেস মঙ্ককে যত্নআত্তি করার জন্য পদমমায়াকে তাঁর আয়া করে নেওয়ার প্রস্তাব করে যান।

এরপরই মেমসাহেবের আয়া হয়—পদমমায়া। বাংলোর আব-হাওয়াও আস্তে আস্তে অন্যরূপ নেয়। আগে যে সমস্ত অলিগলি সন্ধি অন্ধি নিজের মনেই গুমরে মরতো এখন তারা মানুষের গন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে।

মেমসাহেবের অসুখ লেগেই আছে। কতকগুলো বাগান নিয়ে একজন চীফ মেডিক্যাল অফিসার। তিনিই তাঁকে চিকিৎসা করেন। কিছুতেই অসুখ বাঁক নিচ্ছে না দেখে তিনি মঙ্ককে বলেন মিসেস মঙ্ককে অপারেশনের জন্য বিলেত পাঠাতে।

মেমসাহেব বিলেত চলে যান। এতে পদমমায়ার ভাগ্য অপ্রসন্ন হয়নি বরং প্রসন্নই হয়। সে যে আয়া সেই আয়াই থেকে যায়। আগে শুধু মেমসাহেবের আয়া ছিল, এখন সে সমগ্র বাংলোটারই আয়া। কুঠীর যাবতীয় কাজই দেখাশুনা করতে হয় তাকে। কোথাও ধুলো বালি ঝুল কালি না থাকে। চাকর বাকরগুলোকে শাসিয়ে সব কাজ ঠিক মত আদায় করে নিতে হয় তাকে। এতে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলোতে একটা স্থায়ী আসন হয় তার। সকলেই তাকে ভয় করে চলে। তারা জানে মঙ্কসাহেব তার কথায় ওঠে বসে।

এরমাঝে হঠাৎ চায়ের বাজার মন্দা হয়ে পড়ে। খরচ কমাবার জন্য কড়া হুকুম আসে কোম্পানী থেকে। উপয়ান্তর না দেখে কুলিদের কাজের ঠীকা বাড়িয়ে দেন মঙ্ক—এক চৌপল থেকে দেড় চৌপল, বিশ লগি থেকে ত্রিশ লগি করে দেন। দেড়া কাজ—অনেকেই রোজকার ঠীকা কুলাতে পারে না, ফলে সেই কাজের অবশিষ্ট অংশটুকু পরের দিন করতে হয়। মেহানতি বেড়ে যায় সবার অথচ আয় কমে যায়। এতো গেল মজুরদের কথা। বাবুদের বেলাতে হয় অন্য ব্যবস্থা। বড়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে

ঠিক করেন মঙ্ক যে অফিস ও গুদোম থেকে একজন করে বাবু ছাঁটাই করা হবে। গুদোমের তেরষাবাবু আর অফিসের গেড়েবাবু এই দু'জনকে নোটিশ জারি করা হয়। তেরষাবাবুর আসল নাম সনাতনবাবু। লোকটা টেরা তাই মজুররা তেরষাবাবু বলে তাঁকে আর গেড়েবাবু তাঁর আসল নাম ভোলাবাবু তিনি বেঁটে গাট্টাগুট্টো চলার সময় হাঁসের মত এ-পাশ ও-পাশ হেলে দুলে চলেন তাই তাকে গেড়েবাবু বলে। এ-নামগুলো মজুরদের নিজের দেওয়া গোপন নাম। এই নাম তারা নিজেরা নিজেরা যখন কথাবার্তা বলে তখন ব্যবহার করে।

পদমমায়ার ঝাঁঝ বা দাপটা বাগানের সকলে সুস্পষ্ট বুঝতে পারে এই গেড়েবাবুকে নিয়ে। গেড়েবাবু পদমমায়াকে দিয়ে বলেছিলেন মঙ্ককে। পদমমায়ার একটা কথাতে তার চাকরি রয়ে যায় কিন্তু তেরষাবাবুর চাকরি যায়।

পদমমায়াকে নিয়ে অনেক কিছুই কানাঘুঁষা হতো আগে থেকেই কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে গুঞ্জনটা অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। এর ফলে পদমমায়ার বুড়ো মানধ্বোজকে বাগানে মুখ দেখানো দায় হয়ে ওঠে। পদমমায়াকে আয়ার কাজ থেকে ইস্তাফা দিতে বলে সে। এতে জোর আপত্তি করে পদমমায়া। এ-নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে বহু কথা কাটাকাটি হয়। শেষে রাগের মাথায় পদমমায়াকে দু'চারটে থাপ্পড় মারে মানধ্বোজ। পদমমায়া এ-সব বলে দেয় মঙ্ককে। এজন্য মঙ্ক খুব চটে যান মানধ্বোজের ওপর আর তাকে চৌকিদার দিয়ে ধরে এনে যা ইচ্ছে তাই বলে গালাগাল দেন। শেষে শাসিয়ে একটা চরমপত্র দেন তাকে—আর যদি ভবিষ্যতে সে পদমমায়াকে কখনও মারধর কি গালাগাল করে তাহলে হপ্তাবার করা হবে তাকে। হপ্তাবার কথাটা শুধু নামেতেই হপ্তাবার—কাজের সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে একটুও সময় না দিয়ে সেই মুহূর্তেই তাড়িয়ে দিয়েছে বাগান থেকে অথবা ছেড়ে এসেছে ঘন বনজঙ্গলে বাঘ-ভালুকের হিংস্র শিকারের মুখে।

সাহেবের গালাগালি আর শাসানিতে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে মানধ্বোজ। সাধুর কাছে গিয়ে প্রতিকারের পরামর্শ চায়।

সাধু বলে—তোমরা কেন প্রতিবাদ করো না এর ? তোমাদের ঘরের মা-বোনকে নিয়ে সাহেববাবুরা খেলা করবে অথচ তোমরা তা মুখ বুজে চোখে দেখবে, কানে শুনবে ? কেন, কিজন্য ? তোমরা কি জান না যে এইজন্য তোমরা দিন দিন ধ্বংসের পথে পা গলিয়ে দিচ্ছো, তোমাদের সমাজ ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমনি করে কত মেয়ে সমাজচ্যুত হয়ে খৃষ্টান হয়েছে, মুসলমান হয়েছে। এই জন্যই তো তোমাদের মন্দির কি পুজোর আখড়া থাকুক বা না থাকুক সাহেবেরা কিন্তু তাঁদের ধর্মযাজকের আমদানি করেছে। গির্জা করেছে। জানি অর্থ না থাকাই তোমাদের এই অনর্থের মূল। মেয়েরা ভাল খেতে পরতে পায়না তাই এই সামান্য একটু প্রলোভনেই দেহ বিকিয়ে দেয় তারা। কেন, কি জন্য ? অর্থ নাইবা থাকলো, মনের শক্তি খোয়াবে কেন ? মুষ্টিমেয় কয়জন সাহেববাবু আর তোমরা অগুণতি শ্রমিক অথচ তাঁরা সিংহের মত গর্জন করে বেড়ান আর তোমরা তাঁদের ভয়ে খরগোসের মত পালিয়ে, লুকিয়ে বেড়াও। প্রতিবাদ কর। একজন সাহসে ভর করে প্রতিবাদ করলে আর দশজন সাহস পাবে, এগিয়ে আসবে। অচিরেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারবে তোমরা। একটা বিরাট দলও গঠন হবে।

এর মধ্যে সাধু তার আসন জাঁকিয়ে বসেছে আবার। এক এক করে সকলেই ফিরে আসে তার আস্তানায়। রাতে ধুপধুনা পোড়ে, ধুনি জ্বলে। সেই ধুনির আলোতে মজুররা পড়াশুনা করে, সময় পেলে চিন্তা করে, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আকাশ দেখতে পায়।

সমাজ সংস্কারের কথাও বলে সাধু। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার দরকার। এই গলিত সমাজে এমন অনেক দুর্নীতি দুর্বিকার আছে যার ফলে মজুররা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছে। একই সমাজের লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দল থেকে। অন্য দলের আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে। আর এরাই শেষে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘরের বিভীষণ।

সাধুর এ-সব কথায় মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সকলে। অবশ্য বুড়োরা ছাড়া। তারা মুখে বড় একটা কিছু বলেনা তবে

তাদের চোখমুখের ভাব এ কথায় সায় দেয় না বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কারু লোহার, জন্তরে সারকিও যোগ দেয় মানধেবাজের সঙ্গে। কারুলোহারের বউ যমুনিকে ছুকরি করে নিয়েছেন ছোটসাহেব। জন্তরের বউ অন্তরনিকে ছুঁচুবাবু গুদোমের কাজ দিয়ে গোপন ইচ্ছা পুরণ করছেন তাঁর। ছুঁচুবাবুর আসল নাম হরিশবাবু। বড় হ্যাংলাটে চেহারা, মুখটা লম্বা, ঠোঁষ খাওয়া তাই কুলিরা ছুঁচুবাবু বলে তাঁকে। জন্তরে বহুবার বহুদিন বারণ করেছে তার বউকে যাতে গুদোমের কাজ না করে সে কিন্তু অন্তরনি নাছোড়। সে যাবেই যাবে। এই হ্যাংলা কদর্য চেহারার লোকটিই তার কাছে জোয়ান জন্তরের চেয়ে অনেক মিষ্টি লেগেছে। তলে তলে এই তিনবন্ধু মিলে একটা দল পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। তারা আরো অনেকগুলো তাগদওলা ছোকরাকেও ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুস্‌ফাস হয়ে যায় সব। তারা দেখতে পায় সাধু যা বলেছিল তাই ঠিক, ঘরের কোনো এক বিভীষণ এই ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেয় সাহেববাবুকে। এর হপ্তাখানেক বাদেই এরা বড় বড় চুল দাড়ি মোচঅলা, চুলে ও দাড়িতে মস্ত বড় গিঁট, পাকানো মোচ, বিরাট পাঁচফুট একটা লাঠি হাতে পুরণসিং হাবিলদার আর তার সঙ্গে ঝকন, দেওয়াল সিং ও কায়লা চৌকিদার এসে হাজির হয় তিন বন্ধুর ঘরে। ওরা তখন ঘরে ছিল না। ওদের পায় সাধুর আখড়াতে। এই ঘটনা ঘটে রাত আটটায়। তখনই তাদের ছিঁটিমিটি সমেত বাগান থেকে বার করে জঙ্গলের বীভৎস অন্ধকার পথে ছেড়ে দিয়ে আসে তারা।

এই তিন বন্ধুকে সাধুর আখড়াতে পাওয়া গিয়েছে জেনে মঙ্ক মাকনার মত গর্জন করে ওঠেন। পরের দিন সকাল হতে না হতেই নিজে গিয়ে সাধুর গায়ে আলপিণ ফুঁড়িয়ে চাবুক মারতে মারতে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেন তাকে।

বুড়ো অশ্বথটা স্তব্ধ চোখে চেয়ে থাকে। দেখে নড়ে, মুচকে হাসে। দু'চারটে কাক চিল বক যা গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে বসে আরামে গা চুলকাচ্ছিল তার মধ্যে একটা আধটা কা-কা

চি-চি শব্দ করে পাখার ঝাপটা মেরে উড়ে যায় আর বাকিগুলো ভীত সন্ত্রস্তভাবে পাতার আড়ালে সমস্ত দেহটা লুকিয়ে ফেলে। ধুনি জ্বলছে। শুকনো পাতাপুতি ও কাঠ পোড়ার চড়চড় ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ হচ্ছে তা থেকে। ধোঁয়া উড়ছে। সাদা কালো মিশানো ধোঁয়া।

চাবুকের আঘাতে গায়ের চামড়া অনেক জায়গায় ফেটে ফেটে যায় সাধুর। দু'চার ফোঁটা রক্ত আর চোখের তপ্ত জল গাছের গোড়ায় আর ধুনির মধ্যে পড়ে। ত্রিশূলে দু'ফোঁটা রক্ত মাখিয়ে সেটাকে উদ্ধত করে একবার আকাশপানে ধরে সাধু। কোন কথা নেই মুখে, চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হল্কা নির্গত হচ্ছে।

মঙ্ক ভয় পাননি এতে। সাধুর উদ্ধত ত্রিশূলটি চাবুকের একটা আঘাতে মাটিতে ফেলে দেন তিনি।

শান্তভাবেই ত্রিশূলটি তুলে নেয় সাধু। খানিকক্ষণ চুপ থেকে শেষে একটা হুংকার দিয়ে ওঠে, জয় কালীমাই কি জয়!

সাহেবের সাথের লোকগুলো চমকে ওঠে। সাহেব লাল জবার মত চোখ দুটো মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাধুর দিকে।

এক ঝাঁক বাতাস আসে সোঁ সোঁ শব্দ করে। ধুনির অগ্নিশিখাগুলো কাঁপছে, ছাই উড়ছে আকাশে আকাশে। বটগাছের পাতা নড়ছে বাতাসে। পাতার ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ হচ্ছে। মুখ উঁচিয়ে সাধুর যাওয়া দেখছে বুড়ো অশ্বত্থটা।

আট

সাধু চলে যাওয়ার পর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে বাগানটা। কোথাও কোন হল্লাহল্লি নেই—শুধু চোখ চাওয়াচাওয়ি, কানাকানি আর ফিসৃফিসানি। কতকটা বিস্ময় আর মনে ষোল আনা আতঙ্ক। চারিদিকে কান খাড়া। চা-শিরীষের গাছগুলোও অত্যন্ত সজাগ। কখন কি ঘটে—কে জানে? সাধুর আস্তানা, সেই লতাপাতা-ঘেরা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটুকু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ছাই করে দিয়েছে সাহেব। তার ছাইগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে যায় শ্রমিকদের ডেরায় ডেরায়। কেউ হাসে, কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, আবার ছাইটে গায়ে মেখে নেয় কেউ কেউ। ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে বিনম্র প্রণাম জানায় মনে মনে। দেহের রক্তে একটা অজ্ঞাত কল্লোল শুনতে পায়।

সাধুর জন্য সবসময়েই আনচান করে ভাওনাথের মন, কেমন যেন নিঃসঙ্গ শূন্যতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। হাসিমারা, হ্যামিলটনগঞ্জ, মাদারিহাট, দমনপুর, সাঁতালী গারোপাড়ার হাটে, মাঠে ঘাটে সর্বত্রই খোঁজ খবর নিয়েছে কিন্তু কোথাও সন্ধান পায়নি তার।

নিরঞ্জনবাবুর কথা প্রায়ই মনে জাগে ভাওনাথের। ইচ্ছে করে তাঁর কাছে গিয়ে দু'টো ভাল কথা শুনে প্রাণের জ্বালা জুড়োয় কিন্তু সে উপায় নেই। চারিদিকে অজস্র শ্যেনপক্ষীর চোখ, তাদের এড়িয়ে চলাফেরা করা কি সম্ভব? একেই তো তাঁর ওপর পিনাকবাবুর যে কড়া নজর। সত্যি, যেমন নাম তেমনি তাঁর মন, কাম! ধনুকের মত বাঁকা মন, ত্রিশূলের মত তীক্ষ্ণ, ধ্বংসাত্মক।

অল্পতেই সন্দিহান চিত্তে সংশয় জাগে। পিনাকবাবু ভাবলেন কি জানি, খাল কেটে কুমির এনেছেন তিনি। তিনিই তো তাঁকে চাকরি দিয়ে এনেছেন এখানে, তাঁরই এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছেলে এই নিরঞ্জনবাবু। পর পর কয়েকটা ব্যাপারে তার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন পিনাকবাবু। সে সমস্ত কথা নিরঞ্জনবাবুর নিকট

থেকেই শুনেছে ভাওনাথ। ঘটনাগুলি তেমন জটিল বা সংশয় কি সন্দেহ উদ্দীপক বলে মনে করেননি নিরঞ্জনবাবু। তিনি সরল সহজ অন্তঃকরণেই করেছিলেন, কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে নয়। দোষী মনে যে অল্পতেই সন্দেহ ও ভয় হয় এ-কথা তখন খেয়াল হয়নি তাঁর।

ভাওনাথের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেই সে সমস্ত কথা বলেছিলেন নিরঞ্জনবাবু। তিনি যখন নতুন চাকরি নিয়ে এলেন এখানে তখন প্রথম দিনে তাকে পাতি-কেতাবের পাতায় পাতায় শ্রমিকদের নাম লিখতে দেন বড়বাবু। নামগুলো বড় অদ্ভুত লাগে তাঁর কাছে। মাইচাং, ডালিমফুল, পদমমায়া, রেশমফুল, রেশমায়া, শুনমায়া, জাউনি, বড়কা, ঝগড়ু, জুঙ্গে, জন্তরে অন্তরে, মন্তরে, সায়লা, কায়লা, আরো কত কি। কোন নামেরই অর্থ খুঁজে পাননা নিরঞ্জনবাবু। লিখতে লিখতে বিষম সংশয় জাগে, চিন্তা হয়—তিনি কি ভুল লিখছেন? ভয়ও হয় প্রথমদিনেই কাজের অযোগ্য প্রমাণ না হয়? ডানপাশের যোগেনবাবুকে জিগ্যেস করেন।

যোগেনবাবু একটা মুরব্বিপানা হাসি দিয়ে বলেন—মানে খুঁজে কাজ নেই মশায়, যৎ দৃষ্টং তৎ লিখিতং। ও-সব জুঙ্গলিদের জুঙ্গলি নাম—ওর আবার মানে? আপনিও যেমন।

নিরঞ্জনবাবুর বাঁ-পাশে একটু দূরে পিনাকবাবুর আসন। তাঁর বাঁ হাতের নিকটে একটা জানলা। তারপর প্রশস্ত বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলে তাঁকে।

পিনাকবাবু লোকটিকে বিরক্তির সুরে বললেন, তোরা সব বড় নিমকহারাম। তোদের জন্য কি কিছু করতে আছে?

লোকটি মিনতির সুরে বলে, 'আজকার মত এই নাও। ছেলেটার বড় শক্ত অসুখ বাবু। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ভাল ওষুধ ও পথ্যের দরকার তা না হলে বাঁচবে না। তারপর ঐ ওষুধ নাকি দাওইখানায় নেই, কিনে আনতে হবে।' লোকটির কথা আটকে যাচ্ছিল বলতে বলতে, চোখ দুটো জলে ছলছলিয়ে ওঠে।

পিনাকবাবু লোকটির কথা শুনে একটু হাসেন। এই হাসির কারণ নিরঞ্জনবাবু বুঝতে পারেননি তখন। তাঁর খুব দুঃখ হয়েছিল, একটু উষ্মও হয়েছিলেন মনে মনে। ইনি কি মানুষ না পশু যে

লোকের দুঃখে তাঁর হাসি পায়? এখন নিরঞ্জনবাবুও এই হাসির কারণ বুঝতে পেরেছেন। ভাওনাথও বুঝেছে। এইটেই তো চা-বাগানের রীতি। এই রীতি চলে আসছে কত যুগ যুগ ধরে। ওষুধটি কিনতে হবে না। ওষুধের দামটা তাঁরই পকেট ভারি করবে।

নিরঞ্জনবাবুর কৌতূহল হয় এর রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে। উৎসুক চোখে ভয়ে ভয়ে দু'একবার পিনাকবাবুর পানে তাকান পাছে দেখতে পান তিনি। আবার খাতাপত্তরে মন দেন। দু'দিন বাদেই জানতে পারেন সব। লোকটি বাগানেরই একজন মজুর। নাম ঝকরন। রাস্তায় দেখা হয় তার সঙ্গে। জিগ্যেস করেন তাকে, 'তোর ছেলের অসুখ সেরেছে তো?' এ প্রশ্নে কেঁদে ফেলে ঝকরন। ছেলেটি মারা গেছে সেইদিনই, যে'দিন সে বিশটি টাকা পেস্কি নিয়ে আসে বড়বাবুর কাছ থেকে। নিরঞ্জনবাবু ক্যাশ বইয়ের পাতা উলটিয়ে এই অঙ্কটাই দেখতে পেয়েছিলেন। পরে ঝকরনের কাছে জানতে পারেন, বিশ টাকা পেস্কিই নিয়েছে সে তবে এর থেকে পাঁচ টাকা দিতে হয়েছে বড়বাবুকে।

নিরঞ্জনবাবুর কথাগুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ও জড়তা মাখা হয়ে আসছিল, কি একটু ভাবেন তারপর শুরু করেন আবার। আরো দু'টো ছোটখাটো নগণ্য ঘটনা বলেন, যাকে মোটেই আমল দেননি তিনি, ভাবতেও পারেননি যে এগুলো আবার এমন কদর্যভাবে রূপায়িত হতে পারে। ছোট একটা টুলে বসে কাজ করতে করতে অনেক সময় নিজেকে কেমন অসহায় মনে করতেন নিরঞ্জনবাবু। অস্বস্তিতে বুক ফেটে যেত। ছোট্ট একটা হাত পিঠহীন টুল। একটু নড়াচড়া করার জো নেই। সেই সকাল ছ'টায় ভাল করে গাছের ডগায় রোদ না আসতেই ঐ টুলে গিয়ে বসা, ওঠা তো আর বেলা ন'টায়। ঐ সময় বিশ পঁচিশ মিনিটের বিরতি চা-জলখাবারের জন্যে। আবার টুলে গিয়ে বসা আর ওঠা সেই একটা দেড়টায় পাতিওজনের পরে। তারপর একঘণ্টা বিশ্রাম, আবার দু'টো থেকে নিস্পন্দ-বসা শুরু হয়। ছুটি সেই সন্ধ্যা সাড়ে সাত কি আটটায়। এ-ছাড়া প্রায়ই রাতেও কাজে যেতে হয়

সবাইকে। এই অমানুষিক খাটুনি তার ওপর আবার বসার এই সুব্যবস্থা, সোনায় সোহাগা।

বলি বলি করেও বলতে সাহস পান না তিনি, যদি চটে যান বড়বাবু। মনে পড়ে বোশেখ জষ্টির তিড়বিড়ে গা-জ্বালা গরম। স্বেদেক্লেদে সারাদেহ জবজবে। একবার মুখখানা মুছতেই খাকি রঙের ছোট রুমালটি ভিজে যায়। তারপর কোঁচার কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে সেই অপরূপ রুমাল আর কাপড়ের কী চেহারাই না হয়! কী তার দুর্গন্ধ! এই একটু আগেই তো ধোওয়া কাপড়টার ভাঁজ ভেঙ্গে পরে এসেছেন তিনি।

একটি টানা-পাখা। একটা বুড়ো পা ঝুলিয়ে বারান্দায় বসে সারাদিন টানে সেটা। মাঝে মাঝে খইনি খায়, খক্ খক্ করে কাশে, বারে বারে থু ফেলে থু থু করে আবার কখনও বা ঝিমিয়ে পড়ে সে।

ধমক দেন পিনাকবাবু।

চমকে ওঠে বুড়োটা। আবার জোরে জোরে টানে।

পাখাখানি ওড়ে শুধু বড়বাবুরই মাথার ওপর। আর কারো গায়ে বাতাস লাগে না তার।

গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নিরঞ্জনবাবু। অবসাদক্লিষ্ট চোখে লুকিয়ে তাকান বড়বাবুর দিকে। বেশ নির্বিকার কিন্তু লোকটি! একটু যদি ওদের কথা ভাবেন!

একদিন সাহসে ভর করে বড়বাবুকে বললেন, 'টুলের ওপর অতো সময় বসে থাকা বড় যন্ত্রণাদায়ক। একবার বড়সাহেবকে বলে চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিন না? আপনি বললে আপনার কথা ফেলবেন না তিনি।'

বড়বাবু তো অবাক! বড় বড় চোখ করে আস্তে বললেন, 'বলো কি হে ছোক্‌রা, শেষটায় কি চাকরিটে খোয়াবে? দেখতে পাওনা কী রাক্ষুসে সাহেব? একটুতেই গিলে খেতে চায়। পেটের দায় বড় দায় নিরু। কাজ করে যাও ও-সবে মন দিওনা।'

পাত্তির উপরি পয়সা দেওয়া হয় সপ্তাহে একদিন। এটা

তলব নয়, টাকার ওপরে উপরি পাওনা। পাতির পয়সা দেওয়া শেষ হলে যাঁর যাঁর পয়সার ট্রে নিজেরা এনে দেন সাহেবের কাছে। নিজে ট্রে নিয়ে যাননি নিরঞ্জনবাবু। একজন দফাদার দিয়ে পাঠিয়ে দেন ট্রেটা।

এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে নিরঞ্জনবাবুকে ডেকে পাঠান মঙ্ক।

নিরঞ্জনবাবু তাঁর কাছে আসতেই তিনি কর্কশস্বরে জিগ্যেস করেন 'তুমি এ কি নতুন দপ্তর তৈরি করছ? টাকা দফাদারের হাত দিয়ে পাঠিয়েছ কেন?'

নিরঞ্জনবাবু বুঝতে পারেননি এতে কি দোষ হয়েছে তাঁর। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা হয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন মঙ্কের পানে।

মঙ্ক তাঁর হাবভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'সোজা কথা বুঝলে না, দফাদার দিয়ে টাকা পাঠিয়েছ, পথে আসতে আসতে ও যদি চুরি করে তাহলে দায়ী হবে কে?'

অকপটে জবাব দেন নিরঞ্জনবাবু, 'কেন? দায়ী হবো আমি।' এই দেখুন না-বলেই টাকার হিসাবের কাগজটা নিয়ে মঙ্ককে দেখান, 'ব্যালান্স কষে আমার সই দিয়েছি আমি। আর টাকার ট্রেটা আমি বয়ে আনবো এতে কি আমার আত্মসম্মানে আঘাত করে না। এ-ছাড়া এতটুকু বিশ্বাস যদি একটা লোককে করতে না পারি তাহলে নিজেকেই বা বিশ্বাস করি কি করে? আমার বিশ্বাস, বিশ্বাস করলেই লোকে বিশ্বাসী হয়।'

মঙ্ক খুব খুশি হয়ে নিরঞ্জনবাবুর পিঠে হাত দিয়ে আদর করে বলেন—'ভেরি গুড।'

ঐ দিন সময় ও সুযোগ পেয়ে চেয়ারের কথাও উত্থাপন করেন।

মঙ্ক একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেন, আর কারো অসুবিধা হচ্ছে না, তোমার হচ্ছে কেন?

'একটানা বারো ঘণ্টা টুলের ওপর হাত-পা নাড়াচাড়া না করে কি বসে থাকা সম্ভব?' তিনি বালকসুলভ সরল ভঙ্গিতে বলেন, 'এতে যে বাত ধরে যাবে, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে। আর এইজন্য আমার মনে হয় আপনার অফিসের ডিগনিটিও অনেক কমে যাবে।'

মঙ্ক সত্যিই খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন নিরঞ্জনবাবুর কথায়। তাঁর

কথাগুলো কোনটাই এলোমেলো বা যুক্তিহীন নয়। ছেলেটির বিদ্যাবুদ্ধি আছে। তিনি ধীর শান্ত গলায় বললেন, 'দেখো, আগে কেউ চেয়ারের কথা বলেনি কোনদিন। না চাইলে কে কাকে দেয়? না ডাকলে তো ভগবানও আসেন না। আচ্ছা, যাহোক একটা ব্যবস্থা করবো।'

এই সমস্ত কথা বলতে বলতে সেদিন প্রবল আবেগে নিরঞ্জনবাবু তাঁদের দেশের কথাও বলেন, তুলনামূলকভাবে জমিদারদের কথা, প্রজাদের কথা। কেন এই সংশয়, অবিশ্বাস? সেখানকার জমিদার আর এখানকার কর্তাদের মধ্যে বিভেদ কোথায়? দেশের জমিদার আখের রসটুকু খেয়ে ছোবড়াটা ফেলে দেয় তবু তাতে অল্প স্বল্প রস থেকে যায় কিন্তু এ দেশের কর্তারা শুধু রক্ত নয়, হাড় মাস সব চিবিয়ে খায়।

নিরঞ্জনবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলে ভাওনাথ। সাধু বাগান ছেড়ে যাওয়ার পর এই নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থাতে আরো বেশি করে মনে পড়ে তাঁকে। সত্যি, লোকটার দরদ আছে, হৃদয় আছে। এ-জন্যই তাঁকে খুব ভাল লাগে ভাওনাথের, কিন্তু তাঁরও তো উপায় নেই যে কিছু করবেন তাদের জন্য। এই লোকটি বড়বাবু হলে মজুরদের দুঃখকষ্ট অনেকটা দুর হবে। তবে আসনের স্পর্শদোষে হয়ত বদলেও যেতে পারেন তিনি। না, তা হতে পারে না, তাঁর মনের রঙ যে চোখে ভাসছে জ্বল জ্বল করে। মনের রঙ কৃত্রিম হলে এমন স্পষ্ট করে চোখে ভাসতো না। কোথাও একটা জায়গায় নিশ্চয়ই তার আভাষ পাওয়া যেত। এদিকে কখন যে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা গড়িয়ে গাঢ় অন্ধকার সারা পৃথিবীটাকে গ্রাস করে ফেলেছে তা ভ্রূক্ষেপ নেই তার। সেই নিকষ কালো আলকাতরার মত অন্ধকারে পথ চলতে চলতে নিরঞ্জনবাবুর বাড়ির নিকটে এসে হাজির হয়। সংশয় ও ভয়ে গা'টা শিরশির করে ওঠে। একটা পানিসাজ গাছের আড়ালে থেকে চোখ দুটোর তীব্র দৃষ্টি মেলে ধরে বাড়িটার দিকে; কান দুটো সজাগ খরগোসের মত। কেউ আসছে না তো রাস্তা দিয়ে, নেই তো কেউ বাড়িতে?

এরপর যখন সে নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে আসে তখন একখানা খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি। চোখ তুলে বিস্ময়মাখা স্বরে বললেন, 'কিরে ভাওনাথ, এতো রাতে যে ?'

ভাওনাথ বললো, 'রাতে না এসে কি করি বাবু ? নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে কি আসা-যাওয়া সম্ভব ? চর ঘুরছে যে চারিদিকে।'

দু'জনেই চুপচাপ থাকে খানিকক্ষণ। তারপর নিরঞ্জনবাবুই কথা বলেন প্রথম। তিনি বললেন, 'তোদের জন্য বেশ কিছু করবার মতলব ফেঁদেছিল সাধু, আশা করেছিলাম তোদের গড়ে তুলবে সে কিন্তু হলো না তা। খোঁজখবর রাখিস তার, কোথায় আছে এখন ?

জানিনে, সংক্ষেপে জবাব দেয় ভাওনাথ।

'—আমার বিশ্বাস, কাছে কিনারায় সাঁতালি বস্তিটস্তির মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। সুযোগ সুবিধা পেলে এসে হাজির হবে আবার।'

ভাওনাথ নিরাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আর এসেছে, যে মারটা খেয়েছে সে ?'

'—আসবে রে আসবে। আমি বলছি আসবে। যে কর্মী, পরার্থে যার জীবন, সে তার নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করে, বাঁধাপথে সে চলতে চাইবে না কোনদিন। আঘাত পেয়ে পিছিয়ে যাবার লোকও এরা নয়। যাক এ-কথা। তোদের স্কুলটার কি হলো, বল ?'

'—কি আর হবে, সাধু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙে উঠেছে তা। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা স্কুল চালাবে ?'

'—নিজেরা ঠিক না থাকলে কিছুই হয় না ভাওনাথ। ঘরে ঘরে যেখানে বিভীষণ সেখানে কি কিছু করবার উপায় আছে রে ? তোরা তো দূরের কথা, আমরা বাবুরা যারা শিক্ষিত ও সভ্য বলে গর্ব করি, দেখ না তাদের মধ্যেই কত বিভেদ। তোরা তো তবু কথা আর কাজে এক। আর আমরা ? কথায় এক, কাজে অন্য। মুখে মিষ্টি, মনে গরল। মাকাল ফলের মত বর্ণচোরা। চেনবার জো নেই। কিন্তু একটা স্কুল থাকা ত বিশেষ দরকার। একটু লেখাপড়া না জানলে কি করে নিজেদের পাওনার হিসেবটা বুঝে

নেবে? এখনও বাগান গরম, কিছুদিন বাদেই ঠাণ্ডা হবে তখন তুই না হয় অল্প একটু আধটু যা পারিস রাতে রাতে শিখিয়ে দিস মজুরদের।’

নিরঞ্জনবাবুর কথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠে ভাওনাথ। মুখে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবে। একটার পর একটা করে করে কত ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। এ-সবের তিক্ত অভিজ্ঞতা মর্মে মর্মে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে সে। একটা নতুন ফ্যাসাদ বুঝে সুজে ঘাড়ে নেবে আবার? বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। একখানি কচি মুখ, মাখনের মত তেলতেলে নরম দেহ, টলটলে চোখ আর ছোট্ট দুটো হাত মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। মোহ মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আগে যাহোক কাচ্চাবাচ্চা কিছুই ছিল না। সব সইতে পেরেছে তখন। কিন্তু এখন যে রুকমিনের কোলে একটা কচি মেয়ে। তাকে দেখবে কে? রুকমিনও চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে আধখান হয়ে যাবে, বুকের দুধও শুকিয়ে যাবে। এ-সব ভাবতে ভাবতে বিদ্রোহী মন একবার এগোয় পরক্ষণেই পিছিয়ে যায় আবার। মা বাপের মনে আর ব্যথা দিতে চায় না সে। তাদের সুখী করতে চায়। রুকমিন ও সুকুরমনিকেও। ওরা যে অনেক আশা করে তার কাছে। রুকমিনের ইচ্ছা তাদের বিয়েটা এবারে লৌকিকভাবে পালন করা হোক, জাতভাই আর বন্ধুবান্ধবদের হাঁড়িয়া গোস খাওয়ান হয়। মা বাপেরও সেই ইচ্ছা। এজন্য অনেক টাকার দরকার তার। যা নিতান্ত দরকার শুধু তাই করে আজেবাজে খরচ বাদ দিয়ে যতটা সম্ভব টাকা জমাতে হবে। সকলকেই অনেক বেশি খাটতে হবে এজন্য। সবাই ডবলি করছে। রুকমিনও। একদিনও কামাই করে না সে। বেশ ধুমধাম করে বিয়ে বসতে চায়। এ-বাসনা অন্যায় নয় রুকমিনের। কোন ছেলেমেয়ে চায় না তা? ভাওনাথকেও এ বিষয়ে মনযোগী হতে হবে। কারণ তারও একটা কর্তব্য আছে। আর রুকমিনের ইচ্ছা পুরণ করতে না পারলে যে তার নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হবে।

গুদোমে ন'টার ঘণ্টা বাজে। রাতে কাজ হোক্ চাই না

হোক্ ঘণ্টা পিটানো হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ম্যানেজার সাহেবের কড়া হুকুম। এর এদিক সেদিক হবার উপায় নেই। চৌকীদার যে সজাগ আছে এ তারই প্রমাণ। ঘণ্টার ঠং ঠং শব্দে মনে পড়ে নারায়ণ পুজোর কথা। বিকেলে নিজে গিয়ে বার বার করে বলে এসেছে রাজমন, নিমত দিয়েছে লবঙ্গ ও সুপুরী দিয়ে। সকাল থেকে উপোস করে আছে রাজমন। উপবাসী লোকের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা চলে না। সংসারের অমঙ্গল হবে যে। এ-ছাড়া তার সঙ্গে বন্ধুত্বও আছে অনেকদিনের, সেই গুদোমে কাজ করার সময় থেকে। পুজোর রাতে নাকি তাদের গানবাজনা হৈ-হল্লা করে কাটাতে হয়। এ নেপালী সমাজের রীতি। ভাওনাথকেও তাদের সঙ্গে যোগদান করতে অনুরোধ করেছে কিন্তু তা পারবে না সে। পুজোর পঞ্চামৃত ও চালের গুড়ো, দুধ, গুড়, লবঙ্গ এলাচি দিয়ে তৈরি অপুঙ্গ প্রসাদ পেয়েই চলে আসবে।

এরপর আর দেরি করে না ভাওনাথ, নিরঞ্জনবাবুকে বলে রাস্তা ধরে। সে যখন রাজমনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় তখন পুজো হয়ে গেছে, পঞ্চামৃত পান করছে সকলে। ভাওনাথও পঞ্চামৃত পান করে তারপর রাজমন নিজে তার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা ভরতি অপুঙ্গ দেয়। প্রসাদ খাচ্ছে এমন সময় একটা হৈচৈ, মার মার শব্দ শুনতে পায় সে। কান খাঁড়া করে শোনে কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে। রাজমনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে সোজা গুদোমডেরাতে আসে। ঘটনাটা ঘটেছে কুঁদরি বুড়ির ঘরে। তার ছেলেমেয়ে বলতে কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু তার সোয়ামী। দু'টো মেয়ে আর একটা ছেলে নাকি প্রথম বয়সে হয়েছিল তার। লোকে বলে কুঁদরি নিজেই খেয়েছে তাদের। ভাওনাথ দেখতে পায় সারা লাইনের লোক জড় হয়েছে, সবাই মিলে এক সুরে নানা অকথ্য গালিগালাজ করছে, চড়চাপড়ও মারছে তাকে। তার স্বামী ধনকুমার সেখানে দাঁড়িয়েই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় দেখেছে তা। ভাওনাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গঙ্গুর। তাকে জিগ্যেস করায় সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারে সে। এবারে তার মার অনেকগুলো কথা স্পষ্ট হয়ে

ফুটে ওঠে তার কাছে। সেদিন ছিল অমাবস্যার বিদঘুটে অন্ধকার রাত। তার মা কয়েকটা শিষ গাছের চারা এনে ঘরের চারপাশে রুয়ে দেয়। ভাওনাথ জিগ্যেস করে, এ-সব আবার কি করছ তুমি? মা উত্তর দেয়, তোরা আজকালকার ছেলেরা তো মানবি নে এ-সব, অনেক টুক্‌টাক্‌ খবর শোনা যাচ্ছে লাইনে।

মায়ের কথাতে একটু হেসেছিল ভাওনাথ। এ-সবে তার কোন আস্থা নেই তাই আর কিছু জানবার উৎসাহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কাণ্ড দেখেছে সে। এরপর অনেকগুলো এরাণ্ডি গাছের পাতা নিয়ে এসে সেগুলো ঘরের চালে চালে, ওঠোনে, ঘরের মেঝেতে, বিছানার তলে রাখে তার মা। বাবা ও রুকমিনকে ডেকে তাদের বুকের মাঝখানে একটা করে কালো কালির দাগ কাটে। সুকুরমণির বুকেও একটা দাগ দেয়। সব শেষে ভাওনাথের বুকেও একটা।

একফাঁকে রুকমিনের মুখের দিকে তাকায় ভাওনাথ। রুকমিন যে বেশ খুশি হয়েছে এতে, তার মুখের চেহারায় বুঝতে পারে সে। ভাওনাথ তখনো দুটো অবাক চোখ মেলে চেয়েছিল তার দিকে। রুকমিন বললো, বুঝতে পারনি এখনো? আজ যে অমাবস্যা, এই অমাবস্যার রাতে কলতলা বা নদীর ঘাটে উলঙ্গ হয়ে আসে ডাইনীরা। সেখানে স্নান করে নাচ করে, ধূপধুনা ফুল দিয়ে পুজো করে, তারপর অন্ধকার থাকতে বাড়ি ফেরে তারা।

ভাওনাথ বলে, 'তা তো হলো। এখন ডাইনী কোথায় যে এ-সব করা?

রুকমিন চোখ দুটো বড় করে বিস্ময়ের সুরে বলে, 'ওমা, তুমি শোননি বুঝি? এই চারদিনের মধ্যে দুই দু'টো তরতাজা ছেলে মরেছে ঐ গুদোম ডেরাতে। ডাইনী না থাকলে অমন করে মরবে কেন ছেলে দু'টো? অসুখ নেই বিসুখ নেই তবে কি তারা হাওয়ায় মরেছে?' এরপর গলার সুরটা অপেক্ষাকৃত নরম করে বলে, 'জানো তুমি, মা যা করলো তা ছাড়াও অনেকে লোহা গরম করে বাঁ কি ডান হাতে দাগ কাটে। এতেও নাকি ডাইনী আসতে পারে না।'

আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ভাওনাথ। দরদমাখা সুরে সবাইকে বললো, 'আহা বেচারীকে মারছ কেন তোমরা ?'

ভাওনাথের কথাতে জনতা রুখে দাঁড়ায় তার দিকে। 'কি বলছিস তুই, মারবো না তবে কি পুজো করতে বলিস ? প্রতিদিন নিত্যিনতুন নধর ছেলেমেয়েগুলোকে চিবিয়ে খেতে দেব ? এতো যদি দরদ থাকে তাহলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোর মেয়েটাকে দে না ওকে ?'

ভাওনাথ ভুলে যায় তার মা আর রুকমিনের কথা। বলে আচ্ছা তাই হবে। আমি দেখবো মানুষ কি করে একটা আস্ত মানুষকে চিবিয়ে খায় ? এই কথা ক'টি বলে পরক্ষণেই সুকুরমনির কথা মনে পড়ে তার। একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক ও যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে। কী টলটলে হাসি হাসি মুখ, তুলোর মত নরম দেহ, কী শ্যামসুন্দর লতাবাহু।

এর মধ্যে কয়েকজন বলে ওঠে—'নে, ভণ্ডামী রেখে দে। অনেকে বলে দু'ঘা বসিয়ে দেনা ওকেই ?' সত্যি সত্যিই দু'একজন ঠেলাঠেলি করে তার গায়ের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে।

নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে সব সহ্য করে ভাওনাথ। এরমধ্যে প্রেমপ্রকাশ এসে হাজির হয় সেখানে। তাকে দেখতে পেয়ে অনেকটা বল পায় মনে। প্রেমপ্রকাশই সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলে তাকে। ছোট্‌কা সর্দার নাকি মতিকে এনে পুজো করিয়েছে আজ সন্ধ্যায়। মতি আলো চাল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে। আরো কত কি বিড়বিড় করে বলে সে সমস্ত বুঝতে পারেনি কেউ, তবে শেষে একটা কথা জোর গলায় বলে ওঠে, গুদোমডেরার রাস্তার পাশেই একেবারে উত্তর প্রান্তে যে বাড়িটে সেখানেই এই ডাইনি থাকে। এই বাড়িটে আর কারো নয়, কুঁদরি বুড়ীর। সঙ্গে সঙ্গে জনতা মরিয়া হয়ে ছুটে আসে এখানে।

এরপর সবাই মিলে নাপিত ডাকিয়ে মাথামুড়ে জঙ্গলের রাস্তার মধ্যে ছেড়ে আসে কুঁদরিকে।

এ-সব কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ভাওনাথ। সকলেই যে যার ঘরে যায় কিন্তু সে তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুঁদরীর

ছোট্ট শূন্য ঘরটি দেখছে। ভাবছে—এই তাদের সমাজ, এই তাদের শিক্ষা। সমাজের মধ্যে এত গলদ তাহলে কি করে মানুষ হবে এরা। শিক্ষা ছাড়া এ-সব নোংরা, অসত্য সংস্কারের মূলে আঘাত করা অসম্ভব। নিরঞ্জনবাবু বলেছিলেন, সাধুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তুই তো চালাতে পারিস স্কুলটা। ঠিকই বলেছেন তিনি। যে করেই হোক স্কুলটা চালাতে হবে তাকে।

নয়

সাধুকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশি দিন নয়। মাত্র তিন হপ্তা। এর মধ্যেই কয়েকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে বাগানে। যার ফলে অনেকের আস্থা আরো বেড়ে যায় তার ওপর। কমবেশি সকলেই বলে সাধুকে এমন করে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতেই বাগানের এই সমস্ত বিপর্যয় ঘটছে। ভবিষ্যতে আরো কত কি হবে এই কথা ভাবতে তারা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। বাগানের মঙ্গল অমঙ্গলের সঙ্গে যে তাদের জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। সাধুর গায়ের গন্ধ বাগান থেকে লুপ্ত না হতেই প্রথমে কুঁদরি বুড়িকে ডাইনী বলে মাথা মুড়িয়ে তাড়িয়ে দেয় বাগানের সকল আদিবাসী মিলে। তার চারদিন বাদেই গুদোমডেরার সমস্ত ঘরগুলোই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগে কুঁদরির ঘরে। অন্য একজন নতুন মজুর এসে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে, তার চলে যাওয়ার পরই। আগুন যে কি করে লাগে তা অনুমান করতে পারেনি কেউ। রাত তখন দশটা হবে। সমস্ত কুলিলাইন নিঝুম, নিথর। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। যে সমস্ত জ্বালানী কাঠ বর্ষায় জ্বালাবে বলে সঞ্চয় করে রেখেছিল কুঁদরি যাওয়ার সময় সে-গুলো ছেড়ে যেতে হয় তাকে। সেই কাঠগুলো আর ঘরের বাঁশ, খুটি, রুয়ো ও বাতাতে আগুন লেগে পট্ পট্ ফট্ ফট্ করে বোমার মত ফুটতে থাকে। আগুনের লাল ফুল্‌কি আর সাদা কালো ছাই সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেলে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে শন্ শন্ শব্দ করে দক্ষিণে হাওয়া বইতে থাকে খুব জোরে। মুহূর্তের মধ্যে সারা লাইনটার রূপ বদলে যায়। কার সাধ্য অত বড় আগুনের সামনে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আগুনের উত্তাপ আর ফুল্‌কি এসে গা হাত পায়ে ফোস্কা পড়ে। অনেকেই বাড়ি থেকে কোদাল, কলম-ছুরি যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে

ভ্যাবাচাকা খেয়ে। আগুন নেভার কাজে হাত দিচ্ছে না কেউ। এরমধ্যে ছোটসাহেব গিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে আগুন চাপা দিতে বলেন সকলকে। সকলেই কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে তবু। সাহেবের পেড়াপীড়িতে সাউনা জিগ্যেস করে, কত হাজরি দেবে সাহেব? সাউনার কথাতে সাহেব চটে গিয়ে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকে তাকে। মুখ কাচুমাচু করে প্রতিবাদ জানায় সে। সেখানে এগিয়ে যায় ভাওনাথ। সাহেবের কথার প্রতিবাদ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। সে চেয়েছিল আগুন লাগার গুরুত্বটা সাউনাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। সাউনার দিকে চেয়ে সেই কথাই বলতে যাচ্ছে সে এমন সময়ে সাহেব দুই চড় মারে সাউনার মুখে। এরপরই হাত উঁচিয়েছে ভাওনাথের দিকে। ভাগ্যিস, সে একটু পিছু সরে দাঁড়িয়েছিল নতুবা নির্ঘাত তাকে নিকটের টিপি করা অসমান চইলিগুলোর ওপরে পড়ে সমস্ত দেহটা থেঁতোমেতো হয়ে যেত তার। বড়সাহেব মঙ্কও নিকটেই ছিলেন একটা বোবা, বোকা মানুষের মত দাঁড়িয়ে। কি যেন ভাবছিলেন তিনি? চোখেমুখে কোন চাঞ্চল্য বা বিষণ্ণতার ছাপ নেই বরং ধীর, স্থির, নির্বিকার ও প্রশান্তির একটা উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এরমধ্যে ফেকু ঠীকাদার গিয়ে অসম্ভবরকম নুয়ে পড়ে একটা সেলাম ঠোকে বড়সাহেবকে। চোখেমুখে একটা অপরিসীম খুশীর আমেজ অন্তর থেকে উঁকি মারছে তার। তাকে যত চেপে রাখতে চাচ্ছিল সে তত যেন সেটা আরো পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হয়ে ফুটে উঠছে।

বড়সাহেব গম্ভীরভাবেই জিগ্যেস করেন, 'খড়বাড়িমে কি আউর খড় হায়?'

'—নেই হায় হুজুর। লেকিন, খড় মিল যায়েগা।'

'বড়সাহেব বললেন, ঠিক হায়, কাল অফিসমে হামারা সাথ ভেট করেগা।'

ফেকুর চোখেমুখে অন্তরেব সমস্ত অস্ফুট, প্রচ্ছন্ন আনন্দ রেখাগুলো পরিণত হয়ে ফুটে ওঠে এবারে। আগুনের শিখার আলোতে তা স্পষ্টই দেখতে পায় ভাওনাথ।

এই যে এত বড় একটা বিরাট লাইন যাতে ছোট বড় নিয়ে সাত আটশো লোক তাদের সারাদিনের কঠোর শ্রান্তি, স্বেদক্লেদ মুছে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে, সুখের স্বপ্ন দেখে শুয়ে শুয়ে, তা আজ নেই। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোম্পানীর লোকসান হয় এতে সত্য কিন্তু তাদের লোকসান এই নীড়হারা লোকগুলোর ক্ষতির তুলনায় কতটুকু? শুধুই কি গৃহ হারিয়েছে এরা? এরা হারিয়েছে ওদের সবকিছু, গরিবের খুদকুঁড়ো বলতে যা বোঝায়। কাল কি খাবে, কি পরবে? এখন থেকেই পেটের ক্ষুধা অনুভব করছে তারা। কাঁদছে, ছেলে মেয়ে বুড়োগুড়ো এক সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদছে সকলে। জিনিসপত্তর যা কিছু পারে ঘর থেকে বার করে আনার জন্য মরণ পণ করে জ্ঞানহারার মত ছুটে চলেছে ঘরের দিকে। আগুনের আঁচ লেগে, পরনের নেংটিতে আগুন ধরে হাত পা গা জ্বলে যায় অনেকের সেদিকে কারো খেয়াল নেই। অন্য অন্য লাইনের লোকগুলো রুখতে পারে না তাদের। বড়সাহেব কি তাদের কান্নার রোল, বিবর্ণ আধপোড়া দেহ অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে পারছেন না? তিনি কি শুধুই কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করছেন? হাঁ, হিসাব করছেন বটে, কিন্তু তা কোম্পানীর ক্ষতির হিসাব না, তার নিজের লাভের অঙ্ক।

এই ঘটনার পরদিনই নিরঞ্জনবাবুর কাছে জানতে পারে ভাওনাথ, অসময়ে খড় কাঠ খুঁটি দুষ্প্রাপ্য তাই নির্ধারিত রেটের ওপর প্রতি ঘর পিছু আরো অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় ফেকুকে। নিজের কাজ বাগিয়ে চলে যায় ফেকু। তারপরই বড়সাহেবের রুমে ঢোকেন বড়বাবু। তাঁর সঙ্গে কি সব যুক্তি পরামর্শ হয়। সে খবর জানেন না নিরঞ্জনবাবু। বড়সাহেব নাকি হাসছিলেন। সেই সঙ্গে বড়বাবুও। এই ফাঁকে নিরঞ্জনবাবু কণ্ট্রাক্ট বইয়ের পাতা উলটিয়ে দেখতে পান রেটের অঙ্কটা। তাড়াতাড়ি করাতে এবং খুশির আবেগে কণ্ট্রাক্ট বইটি আলমারির মধ্যে বন্ধ করে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন বড়বাবু। নতুবা হিসাবপত্তরের সমস্ত

বই খাতাগুলো কখনও টেবিলে কি কোন খোলা জায়গায় পড়ে থাকে না।

নিরাশ্রয়, অসহায় গৃহহারা এই লোকগুলো তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে নরমগুদোমে আশ্রয় নেয়। সেখানে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন করে করে দু'হপ্তার উপর কাটায়। এ অবস্থায়ও কাজ না করে উপায় ছিল না তাদের। সকালে সিটি বাজবার আগেই বেরিয়ে যায় কাজে, কাজ থেকে ফেরে বিকেলে। তখনই আবার বেরিয়ে যায় জঙ্গলে কিছু পাতাপুতি কুড়িয়ে আনার জন্যে। ঐ পাতাপুতি দিয়েই ইঁট সাজিয়ে তার ওপর হাঁড়ি চাপিয়ে দুটো ভাত সিদ্ধ করে।

এরপর চৈত্র গেছে, বৈশাখও যায় যায়। আকাশ আগুনে। একবিন্দু কালো ছায়ার চিহ্ন নেই কোথাও। গনগনে আগুনে গা-জ্বালা হাওয়া বইছে। খাঁকড় শিরীষগাছগুলো নিরাভরণা। একটি পাতাও নেই তাতে। ডালগুলো হাত পা ছেড়ে উর্ধ্বমুখা হয়ে হাহাকার করছে। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কলম করা চা গাছগুলোতে একটাও নতুন পাতা গজায়নি। একটা অনাগত দুর্ভিক্ষের করালছায়া সমস্ত গাছে ডালে মাটিতে, চায়ের আকাশে বাতাসে। ম্যানেজারের মুখে আর হাসি নেই। মেজাজ তিরিক্ষি, চোখ দু'টো গোবাঘের মত। দিনের মধ্যে অন্ততপক্ষে বিশ বার শূন্য আকাশের পানে চেয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে কত কি বলেন। বড়বাবুকে মাঝে মাঝে ম্লান হেসে জিগ্যেস করেন, তোমাদের পঞ্জিকার আবহাওয়ার খবর কি? বাগানের প্রতিটি জীবই কেমন সন্ত্রস্ত। এমন কি দোকানদারগুলোর চোখ মুখও শুকনো, নিরস। বিক্রিপাটা নেই বললেই চলে। শিগগির যে কোন নতুন ডালপালা পাতা গজাবে গাছে সে আশা করা যায় না। এইমাত্র কয়মাস হয় আগেও বৃষ্টি না হওয়াতে এমনি দুর্দশা হয়েছিল সবার। এবারে তো বছরের গোড়াতেই শুরু হলো, কি জানি সারা বছরটাই খারাপ যাবে নিশ্চয়। আবার একটা গ্রামপুজা

দেওয়ার জন্ত মেতে ওঠে আদিবাসী মেয়েগুলো। তারা সকলে মিলে বাড়ি বাড়ি ও অফিসে সাহেবের কাছে গিয়ে চাল ডাল পয়সা নিয়ে আসে। বাগানের শেষ প্রান্তে রিজার্ভ ফরেষ্টের নিকটে একটা চিলোউনি গাছের গোড়ে বেশ খানিকটে জায়গা পরিষ্কার করে গোবর মাটি দিয়ে নেপেপুছে নেয়। সেখানকার চারদিকে চারটি সিঁতুরের ফোঁটাকাটে ঝাণ্ডি পোতে। গাছটার গোড়াতে পাঁচটা মাটির ঢিল তৈরি করে তাতে সিঁতুরের ফোঁটা কাটে। বাতি দেয়, ধুপ জ্বালায়। সমস্ত মেয়েরা মিলে ভক্তি ভরে স্নান করিয়ে দেয় বৈগাকে। এরপর বৈগা তার আসনে বসে, চার ঝাণ্ডির মাঝখানে। আর তাকে ঘিরে বসে সমস্ত মেয়েগুলো। রুকমিনও এদের মধ্যে ছিল। একটা মিসমিসে কালো কারি পাঁঠাকে সিঁতুর লাগিয়ে বলি দেওয়া হয়। চারটে পেরমার মধ্যে তু'টোকে বলি দেওয়া হয় আর বাকি তু'টোকে উড়িয়ে দেয়। এই পায়রা চারটির মধ্যে একটি দিয়েছিল রুকমিন। তার সিতুর মাখা পায়রাটা ডানা মেলে আকাশে উড়ে চলেছে দেখে রুকমিনের মন খুশিতে ডগবগ হয়ে ওঠে। পুজো শুরু হয় বেলা দশটায় আর শেষ হয় বারোটায়। মেয়েরা সকলেই নিজ নিজ ঘর থেকে সাধ্যমত খাবার তৈরি করে এনেছে। রুকমিনও এনেছে—পুরি, মিঠাই, দই ফলমূল। সকল ঘরের জিনিসগুলোই একত্রে করে সবাই মিলে এক পংক্তিতে বসে মহাতৃপ্তির সঙ্গে খায়। কারিপাঁঠা আর পেরমা তু'টোকে টুকরো টুকরো করে কেটে তেলে ভেজে নিয়ে ঐ সঙ্গে খায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে হাত ধরাধরি করে নাচগান শুরু করে মেয়েগুলো। নাচগানে রুকমিনের বেশ সুনাম। তার চেয়ে ভাল নাচতে আর কেউ পারে না এ কামানে। রুকমিনের নৃত্যে কেমন যেন একটা মাদকতা, প্রাণশক্তি আছে। আত্মভোলা হয়ে যায় নাচতে নাচতে। দেহটা লতার মত অনায়াসসাধ্য, একটুতেই তুলতে থাকে। মনে হয় একটা অপ্সরী নাচছে।

আখড়ার নাচগান সেরে রুকমিনরা সবাই মিলে বৈগার বাড়ি যায়, নাচগান করে সেখানে।

আখড়াতে পুজোর সময় তু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। আকাশ

জুড়ে একটা বিরাট দৈত্যের মত থমথমে মেঘ। পুজো পণ্ড হবে এই ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় সকলের। বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে তার সিঁহার পাতার ছাতা নিয়ে আসে রুকমিন। আরো অনেকে কেউ বাঁশ ছাতা কেউ সিঁহার পাতার ছাতা নিয়ে এসে সিঁদুর মাখা মাটির ঢেলা, বাতি, ধুনোচি প্রভৃতি ঢেকে দেয়। আর রুকমিন তার ছাতাটা ধরে বৈগার মাথার ওপর। বৈগা খুব খুশি হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে তাকে। রুকমিন বলে, পুজো পরের কথা, যে পুজো করে তাকেই দেখতে হয় আগে। পুজোর যে ভালমন্দ এ তো দেখবে পুরোহিত। তারা শুধু তার আদেশ পালন করেই খালাস।

শেষ পর্যন্ত আর বেশি বৃষ্টি হয় না সেদিন। এক ঝাঁক বাতাস এসে সেই রাক্ষুসে মেঘটাকে খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে নিয়ে যায় কোথায়। আকাশে সূর্য হাসে আবার। গাছের পাতাপুতি ডালপালা চিকচিক ঝিকমিক করে ওঠে। মাটিতে মানুষ হাসে। ধুপধুনোর গন্ধ ভেসে যায় ঘরে ঘরে আনন্দ বারতা নিয়ে।

সতি, সত্যি, এক হপ্তা বাদে খুব জোর বৃষ্টি হয় একদিন। হাসির ঢেউ বয় বাগানে। পাহাড় থেকে নেমেআসা ঝুরঝা ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে কলকল খলখল আনন্দরাগে ছুটে চলেছে অজানার কাছে। ধ্যান গম্ভীর পাহাড়টা হাসছে। রুকমিনের চোখে মুখেও একটা অজ্ঞাত আধোফোটা চুমকি। কি যে বলতে চায়, আবার চেপে যায় সে। এর পনর ষোল দিন বাদে একদিন হঠাৎ মন ও মুখের ঢাকনি খুলে যায় তার। হাসতে হাসতে চা গাছগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, দেখেছ, বৃষ্টি পেয়ে গাছগুলো কেমন হেসে উঠেছে।

ভাওনাথ একটু হাসে। দু'জনেই চুপ থাকে খানিকক্ষণ। চুপ করে বসে অনেক কিছু ভাবছিল ভাওনাথ। অনেক দুঃখ, অনেক সুখের কথা।

ধৈর্য ধরে কণ্ঠ চেপে আর থাকতে পারেনি রুকমিন। সে বলে ওঠে, সত্যি, কোন কথা গোপন রাখা যায় না আপন জনের কাছে। যতক্ষণ না বলা হয় ততক্ষণ যেমন আনন্দ তেমনি

একটা অস্বস্তিও বোধ করতে হয়। হঠাৎ এক সময় মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এবারের পাত্তির পয়সা দিয়ে তোমার জন্য একটা মাদল কিনে দেব। আর মাদল চাইতে সর্দারের বাড়ি যেতে হবে না তোমার।

ভাওনাথের মনের ঘুম ভাঙে এতক্ষণে। সে হেসে বলে, বিয়েতে দেবে বুঝি?

রুকমিন ঠোঁট দুটোতে অল্প হাসির রেখা টেনে আস্তে করে জবাব দেয়—হুঁ।

রুকমিনের কথাতে হাসির জোয়ার আসে ভাওনাথের। খুশির ঢেউয়ের ফেনা হয়ে ভাসতে থাকে সে। অনেক কল্পনার স্বপ্নজালে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষণকালের জন্য বিদ্রোহী মনটা কেমন যেন একটা অসম্ভব রকম উদাস, শান্ত, নরম হয়ে ওঠে। সে অন্য লোক ব'নে যায় সহসা। নিজেকে চিনতে প'রে না আর। তার সেই সবল পেশীবহুল দেহটা যেন দুমড়ে চিমসে নিস্তেজ, নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে দেখতে দেখতে। এমনি হয় ভাওনাথের। এর আগেও হয়েছে বহুবার। রুকমিনের চোখ মুখের দিকে তাকালে কেমন একটা নতুন অনুভূতি আকর্ষণ অন্তরের তলদেশে কল্লোল করে ওঠে তার, যেখানে সব আগুন নিভে গিয়ে একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর কাছে ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা আর দুঃখভার মনে হয় একটা অবাস্তব। ভবিষ্যৎ অন্ধ, স্তব্ধ, বর্তমানই সবাক বলে মনে করে সে।

দু'হপ্তার মধ্যেই সমস্ত বাগানটা একটা সবুজ মখমলের গালিচা হয়ে ওঠে। কলমকরা গাছগুলোতে সমানভাবে নতুন ডাল পাতা গজিয়েছে। একটা জুৎসই আবহাওয়াই এর মুখ্য কারণ। রাতে বৃষ্টি, দিনে রোদ। মজুরদের ঘরের চাল দিয়ে আসমানের জল পড়ে, বিছানা জিনিসপত্তর ভিজে যায় সব। বিছানা আর কি—বিছানা বলতে তো সিমেণ্ট কিম্বা সালফেট অব্ এমোনিয়ার খালি বস্তা। এই বস্তাগুলো বড়সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মজুরদের পাইয়ে দিয়েছেন চ্যাদরাবাবু। এইগুলো দিয়ে মজুররা ওদের

কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেয় যাতে নতুন কলমকরা সূঁচলো ক্ষুরধার ডালগুলো লেগে গায়ের ছাল উঠে না যায়। এই চ্যাঁদরাবাবু বাগানের টিলাবাবু। সারাদিন মজুরদের সঙ্গে বাগানে রোদে জলে ভেজেন তাই মাঝে মাঝে ওদের জন্য একটু আধটু দরদ হয় তাঁর। কিন্তু বুঝলেই বা কি হবে, কতটুকুই বা হাত আছে তাঁর? তবে মেজাজ বুঝে বাগানের কাজের সময় তিনি বড়সাহেবকে ধরেন তখন হয়ত খুশির আমেজে কোন কোন দিন রাজী হয়ে যান তিনি। বাগানবাবুর নাম ঠিক চ্যাঁদরাবাবু নয়। মাথায় মস্তবড় একটা টাক আছে কিনা তাই নিজেদের মধ্যে ঐ নাম ব্যবহার করে মজুররা। এই যে টুক্‌টাক্‌ জিনিসপত্তর বৃষ্টির জলে ভিজে জবজবে হয়, ভাল করে ঘুমুতে পারেনা রাতে তবু ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের। দিনের বেলাতে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেয়। আর ঘুম? এর আগে তো অনেক ঘুমিয়েছে, কদিন না হয় নাই বা ঘুমালো।

রুকমিনের খুব কষ্ট হয়। একটুও ঘুমুতে পারেনা। সুকুরমনি সারারাত ধরে বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কতবার যে প্রস্রাব করে তার ইয়ত্তা নেই। যত বৃষ্টি তত প্রস্রাব তার। রুকমিনের সমস্ত কাপড় জামা ভিজে যায়, সারারাতের প্রস্রাব গায়ে বসে তার। এতে অসুখী নয় সে। ভবিষ্যতের একটা রঙিন ছবি আকাশ পথে নিয়ে যায় তাকে। ভোর না হতেই দুটো পান্তা ভাত মুখে দিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে, আর ফেরে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হলে। যত পাতি তত কাজ। পাতি বেশি হলে কাজের সময়ও বেড়ে যায় তার সঙ্গে। এতেও অপার আনন্দ পায় সে। গায়ে লাগে না এই কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট আর রাতজাগা।

সমস্ত বাগানটাই মহাসুপ্রসন্ন, ধীর শান্ত অথচ কর্মব্যস্ত। দোকানদারেরাও। যারা বাগানে থাকে তারা সকলেই এক সুতোয় গাঁথা। সুতোয় এক জায়গায় একটু টান পড়লে সারা বাগানটারই টনক নড়ে। সে মজুর হোক্‌, বাবু হোক্‌ কি চাই দোকানদার হোক্‌। গুদোমের পেটা ঘণ্টা কিম্বা বয়লারের সিটিই সকলের জীবনের স্পন্দন, ও হাসি কান্নার উৎস। সিটি বাজতে না বাজতেই বুধু তার ছোট কাঠের বাক্সটি মাথায় করে এসে বসে বুড়ো

বটগাছের ছায়াঘেরা একপাশে একটু ঝরামরা পাতাপুতির মধ্যে। বাক্সটির ওপরে স্তরে স্তরে পান বিড়ি সিগ্রেট মতিহারি তামাকের পাতা আর কঙ্কটের পাতলা কাগজ সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখে। পাশেই একটু দূরে লুদরু মিঠাইঅলার ঘর। সেও তার ঘর খুলে বসে তখন। হাই তুলে সিয়ারাম সিয়ারাম করে আর পথের দিকে তাকায়। হাতকাটা ছোট একটা জামার পকেট থেকে একটা টিনের ডিবা বার করে বাঁ হাতের তলায় খানিকটে খইনি ও চুণ নেয়। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটাকে বেশ করে ডলে খইনির ওপর দু'তিনটে থাপড় মেরে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। খইনি সমেত চোয়াল দু'টোকে নাড়তে থাকে। তারপর থুক্ থুক্ করে থুতু ফেলে অনবরত। হঠাৎ ছোট ছেলেমেয়ের কান্নার শব্দ শুনে নড়েচড়ে বসে উল্লাসে। দেখতে দেখতে অনেক ছেলেমেয়ে ও তাদের মা বাবা এসে হাজির হয় সেখানে। দু'হাতে মিঠাই বিক্রী করতে থাকে লুদরু। মা বাবারা তাদের আপন আপন ছেলে মেয়েগুলোর হাতে একটা পেড়া, জিলিপি কি কিছু ঝুরিভাজা অথবা গুজিয়া দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি পাঠায় আর বুধুর দোকান থেকে পান বিড়ি সিগ্রেট কিনে সোজা বাগানে কাজে যায়। ভাওনাথও বুধুর দোকানে আসে। সে আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রুকমিনের জন্য অপেক্ষা করে সেখানে। এরপর ঘরের কাজকর্ম সেরে রুকমিন এলে একখিলি পান আর কয়েকটা বিড়ি দেয় তাকে। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়। একটা নির্বাক চলচ্চিত্রের মত চোখে চোখে বাক্য বিনিময় হয়। একটা বিমূঢ় মুহূর্ত। তারপরই যে যার কাজে যায়।

সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই পালা বদল শুরু হয় আবার। বুধু, লুদরু, ভিখরী, কাঞ্চন যে যার দেকানপাট গাছতলা থেকে গুটিয়ে অল্প কিছু জিনিসপত্তর একটা ছোট বাক্সে কি বাঁশের চ্যাঙারিতে করে নিয়ে গিয়ে কেউ আওরাত কি কেউ মরদের মেলার কাছে বড় সড়কটার ওপর শিরিষ গাছতলে বসে বিড়ি ফোঁকে অথবা খইনি খায়। এই বাক্স ও চেঙারিতে বাদাম ছোলা মটর ভাজা,

বাদাম তেলে ভাজা মিঠাই, পান বিড়ি, দেশলাই রামরাম সিগ্রেট প্রভৃতি নিয়ে আসে।

বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠ পড়ে। এবারের মত কোন বছরেই এ-সময়ে এতো পাতি আসতে দেখেনি কেউ। তাই দশটার এই অতিরিক্ত পাতিওজনও আর হয়নি বাগানে। এতো পাতি যে দশটার আগেই টুকরি ভরতি হয়ে যায়, পাতি রাখার আর জায়গা থাকে না তাতে। আবার ওজন হয়, বারোটায়। গুদোমে এসে ওজন হলে অনেক সময় নষ্ট হয় আসা যাওয়ায়। এতে মালিকদেরও ক্ষতি আবার মজুরদেরও। সময় মত পাতি টিপতে না পারলে পাতা ডগা শক্ত হয়ে যায়। চা ভাল হয় না শক্ত পাতায়। দামও ভাল পাওয়া যায় না। এ ছাড়া কোম্পানীরও বদনাম হয় বাজারে। মজুরদের বেলাতেও তাই। সময় মত কামিয়ে না নিলে পাতি কেটে ফেলে দেবে কোম্পানী, আবার কবে পাতি আসবে তার ঠিকানা কি। এই জন্যই বাগানে এই পাতিওজনের ব্যবস্থা আর এই কারণেই দোকানদারেরা তাদের পণ্য নিয়ে আসে সেখানে। সেইখানেই উভয়ের কেনাবেচা হয়।

রুকমিন খুব হিসাবী। এ-গুণ সে পেয়েছে সুখনীর নিকট থেকে। সে বাড়ি থেকেই কান্দা সিদ্ধ অথবা কিছু তেলেভাজা করে নিয়ে যায়। বারোটার ওজনের পর আধ ঘণ্টা কাজের বিরতি। এই সময়ের মধ্যে যে যার মত খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়। রুকমিনও তখন একটা নিরিবিলি গাছতলায় বসে নিজের মনে সুকুরমণিকে মাই দেয় আর ঐ কান্দা সিদ্ধ অথবা তেলেভাজা াক ছোলা ভিজানো খায়। মাত্র ক'টি দাঁত উঠেছে সুকুরমণির। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে পারে না সে। কান্দার একপাশ থেকে একটু ভেঙে নিয়ে দেয় তাকে। দু'একটা নরম ছোলাও তার দাঁতের কাছে ধরে। ছোট দাঁত নিয়ে কুটকুট করে সেটাকে কেটে নেয়। খুব ভাল লাগে তার খাওয়া দেখতে। রুকমিন তার মুখের পানে চেয়ে থাকে; অপার তৃপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে।

এই সময়ে অন্য অন্য গাড়িম্যানদের মত ভাওনাথও তার ভয়সা, গাড়ি নিয়ে হাজির থাকে বাগানে। ওজনকরা পাতিগুলো

গুদোমে বয়ে আনতে হয় তাদের। ভাওনাথের ইচ্ছা হয় একবার রুকমিনের কাছে গিয়ে সুকুরমণিকে একটু ধরে, আদর করে। আবার এতে রুকমিনও তার কোমর পিঠ বুকটা জিড়িয়ে নিতে পারবে অল্পক্ষণের জন্যে কিন্তু সে উপায় নেই। তার কারণ মেয়েপুরুষের হাত থেকে পাত্তির টুকরিগুলো তুলে নিয়ে গাড়ির খাঁচার মধ্যে চালতে হয় তাদের তারপরই তাড়াহুড়ো করে গুদোমে ফেরা। এরমধ্যে পাতি টিপা শুরু হয় আবার। পাতিগুলো নরমগুদোমের সানবাঁধা উঠোনে ঢেলে বারোটা বাজার আগেই আবার হাজির হতে হবে বাগানে। বারোটার ওজনেও এমনি তাড়াহুড়ো। দেরি করার জো নেই। একটু দেরি হয়েছে কি সাহেব, বাবু, কামদারি চাপরাশীর নানা ভাষার নানা অকথ্য গালিগালাজ অবশ্য এ-কথা সত্য যে পাতি অনেকক্ষণ এক জায়গায় গাদামারা থাকলে ভেতরের সমস্ত পাতি উত্তাপে পচে যায়।

এই সুযোগে বাগানের সমস্তদিন মজুরই অল্পবিস্তর বেশ কিছু দু'পয়সা কামিয়ে নেয়। রুকমিনও আশাতীত কামিয়েছিল কিন্তু অন্য অন্য মেয়েপুরুষের মত নয়। ভাওনাথেয় মা বাবাও পারেনি, কারণ ভাওনাথের গোষ্ঠীর লোকগুলোই অন্য ধরনের, অথবা কামদারি চাপরাশীরা তার চারিত্রিক দৃঢ়তা জানে তাই সাহস পায় না এদের কাছে ঘেঁষতে। রুকমিন অনেকদিন ভাওনাথকে বলেছে, অন্যান্য অনেক মেয়েরা তার চেয়ে কম পাতি টিপে অথচ হপ্তাকালে যেদিন পাত্তির উপরি পয়সা দেওয়া হয় তখন দেখতে পায় তাদের চেয়ে অনেক কম পেয়েছে সে। এর কারণ অবশ্য জানে ওরা। পাত্তির পয়সা যেদিন দেওয়া হয় সেদিন গুদোমের গেটের সামনে 'গুদরি' বাজার বসে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর ছাড়াও অনেক কিছু পাওয়া যায় সেখানে। মজুররা পয়সা পেয়ে যার যা দরকার কেনাকাটি করে। এখানেই ঘোরাফেরা করে অনেকগুলো কামদারি যাদের সঙ্গে কতকগুলো মেয়েপুরুষের যোগসাজস আছে। তারা পাতি ওজনের সময় স্কেলটাকে জোরে চেপে ধরে হাত দিয়ে, তাতে ওজন বেশি হয়। ওজন বেশি হওয়ার দরুণ পাওনার অঙ্কটাও বেশ স্ফীত হয় আর এরই একটা অংশ ঐ মেয়েপুরুষেরা স্কেল

দফাদারকে দেয়। এই উভয়পক্ষের দেওয়া-নেওয়া হয় এই 'গুদরি' বাজারে।

যেমন পাতি আসছে তেমনি চা'ও হচ্ছে প্রচুর। গুদোমেরও বিশ্রাম নেই। দিনরাত ইঞ্জিন কলকজাগুলো ঘষঘষ ফসফস করে চলেছে সমানে। হৈচৈ করছে লোকগুলো। ট্রলি, রংগামলা চা, কয়লার বাক্সের গড়গড় ঝন্‌ঝন্‌ খচ্‌খচ্‌ ধুপধাপ শব্দ সমস্ত গুদোমটাকে যেন ভেঙে চুরে বেরিয়ে এসে সারা বাগানটাকে গিলে খেতে চলেছে। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এই মজুররা। ডবলি ('ওভারটাইম) করে মনের সাধে ভাল রকম কামাই করে নিচ্ছে। এইরকম আবহাওয়া আর সুযোগ তো আসে না সচরাচর। বছরে হয়ত এক আধবার আসে আবার কোন বছরে আসেই না একেবারে। আর এলে কয়দিনই বা থাকে, বড় জোর দু'হপ্তা। যতদিন না সারা বাগানটার একটা রাউণ্ড দেওয়া হয়। এরপর নতুন করে পাতি গজাতে প্রায় দু'হপ্তা লাগে আবার। এও নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে পাতি আসে না মোটেই। তাই নিজের আলস্য কিম্বা গাফিলতিতে এই সুযোগ হারালে কাজের লোকগুলোর মনস্তাপের অন্ত থাকে না। এমন কি অসুখ হয়ে হারালেও এই ক্ষোভ মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না তারা। সারা বছর ধরে অনেকদিন অনেকবার বহু অভাব অভিযোগে এই ক্ষোভ মাথা চাগিয়ে ওঠে।

ভাওনাথ ও লেংড়াতেও ভালোই কামিয়েছে। ভাওনাথ দিনে গাড়িম্যানের কাজ করে আবার গুদোমে 'ডবলি' করে রাতে। সন্ধ্যা সাতটায় কোনরকমে দু'টো চোখেমুখে দিয়ে গুদোমে গিয়ে কাজ ধরে, কোনদিন রংগুদোমে রং বয়, কোনদিন রোলিংএ নরমগুদোম থেকে পাতির টুকরি বয়ে নিয়ে আসে, আবার কোনদিন শুকলাই অথবা চালনি ঘরে কাজ করে। রাতের কাজে উপার্জনটা দিনের তুলনায় অনেক বেশি। অবশ্য শ্রম ও ক্লান্তিও ততোধিক। পাঁচ ঘণ্টার কাজের পরে পালা বদল হয়। যারা সাতটায় কাজ শুরু করে তাদের পালা শেষ হয় বারোটায়। এই সময় নতুন লোক পালা দেয় তাদের। ভাওনাথের পালাও শেষ হয় বারোটায়।

এরপর দু'ঘণ্টা বিরতি। তবে এই বিরতি প্রায় [illegible] কাগজে কলমে ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরের জন্যে। কাজে কিন্তু এই লোকগুলোকেই অন্য জায়গায় আর এক কাজে লাগান হয়। ভাওনাথ দুই 'ডবলি' করে। একযোগে বিরতি না নিয়ে দুই ডবলি কাজ করলে জমা নয় ঘণ্টার কাজ। তাই ভাওনাথের কাজ শেষ হয় ভোর চারটেয়। এর মধ্যেই দেহে শ্রান্তি আসে, চোখ দু'টো ঘুমে ঢুলুঢুলু করে। ঐ সময়ে ছুটি পেয়ে আর ঘরে ফেরার মত দৃঢ়তা বা উৎসাহ থাকে না দেহে মনে। নরমগুদোমের এককোণে ঘুমিয়ে পড়ে খালি মেঝেতে। একটুক্ষণ বাদেই ভোরে কাজে যাওয়ার হাজিরা ডাক সিটি বাজে। ঘুম ভেঙে যায় তাতে। লেংড়া বারোটায় এক ডবলি করে ঘরে গিয়ে ঘুমোয়।

রাতে 'ডবলি' করতে পারে না রুকমিন। সে জন্য তার ক্ষোভের অন্ত নেই। সে বলে, সুকুরমণি আর একটু বড় হলে আর এ-সুযোগ হারাতে হতো না তার। সুখনীর কাছে রেখে যেতে পারতো। আর আজকাল তো আগের সেই গুদোমবাবু নেই যে কাজ দেবে না তাকে? সমূহ ক্ষতি এতে। এদিকে সুখনীও রাতে ডবলি করতে যেতে পারে না, কারণ রুকমিন আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে কি করে যাবে? একের জন্য দশের ভোগ।

সত্যিই রুকমিন তার পাত্তির কালতু টাকা দিয়ে একটা মাদল কিনে দেয় ভাওনাথকে। এতে মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল রুকমিনের ওপর। হেসে বলে, তোয় নাচগান করবে আউর মুই বাজাবু।

—সাচ্চা, নাচবু মুই। পরবকা তো দেরিস হেকে আব্।

ভাওনাথ বলে, তোকার বড়কা পরব তো আওথে; তোয় নাচবে তখন।

রুকমিন বুঝতে পারে, বড় পরব বলতে ভাওনাথ কি বোঝে? মুখ টিপে একটু হেসে নির্বাক ছবির মত জবাব দেয়। এর মধ্যে কি কাজের জন্য সুখনী ডাকে তাকে। 'মাই বুলাথে' বলে চলে যায় সে।

পাত্তির সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের মাতলামির মাত্রা বেশ বেড়ে যায়। রাস্তাঘাটে অনেক মাতালকেই দেখা যায় রাতে। বাগানের জুজুদের ভয়ে দিনের বেলায় বড় একটা বেরোয় না তারা। দু'একজন যারা নেশার ঘোরে বেরোয় তাদের বরাতে বুটের গুতো, লাঠির ঘা আর দু'চারটে চড়চাপড়ও জোটে। এই সুযোগে আবার অনেক নেপালী মদ চোলাই করে বেশ কিছু রোজগারও করে। আদিবাসীরাও করে হাঁড়িয়া তৈরি করে। পুজোপার্বণে এ-লোকগুলো বরাবরই করে থাকে এ-ব্যবসা। আর পুজোপার্বণ ছাড়াও সকল সময়েই কিছু না কিছু মাল পাওয়া যায় এদের ঘরে। যারা ঘরে নিজেরা চোলাই করে না, তারা দরকার মত পুজোপার্বনে কি মইমান এলে ওদের কাছ থেকে কিনে আনে। অবশ্য এই দেওয়া-নেওয়া, কেনাচেনা হয় অতি গোপনে। কিন্তু সবক্ষেত্রে গোপন রাখা সম্ভব হয় না। ঘরে ঘরে গদিঅলার মাইনে করা দালাল। সকলেই চেনে তাদের। এদের খুশি রাখবার জন্য চোলাইকারীরা বিনা পয়সায় এক আধ বইলা দেয় ওদের। কিন্তু যে ঘুষ নেয় আর দেয় তাকে কি খুশি অথবা বিশ্বাস করা যায়? হঠাৎ একদিন ভোরে দেখা যায় চোলাইকারীদের অনেককেই পুলিসে গ্রেপ্তার করে অফিসে নিয়ে এসেছে জামিনের জন্যে। ম্যানেজার জামিনপত্র সই করেন না। আর করবেনই বা কেন? এই পাত্তির মরশুমে তিনি তো এই চান। অন্য সময় হলে হয়ত এজন্য মাথা ঘামাতেন নিশ্চয় এবং দরদ দেখিয়ে বলতেন—আহা, বেচারিরা যে কঠোর পরিশ্রম করে এতে একটু আধটু মদ না খেলে শরীর ঠিক রাখবে কি করে? কিন্তু এইরকম পাত্তির মরশুমে তাঁর অন্যরূপ দেখা দেয়। ম্যানেজার জামিনপত্র সই না করাতে সর্দারেরাও ভয়ে জামিন হয় না কেউ। ফলে হাজতে যেতে হয় এদের। এই চোলাইকারীদের মধ্যে বিলাসী বুড়িও একজন। বিলাসীর সংসারে একটি পনর বছরের মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। মাকে হাজতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে মেয়েটির। বিলাসীর চোখ দু'টোও জলে ভার হয়ে ওঠে। কার কাছে থাকবে মেয়েটা—একে

মেয়েছেলে তার ওপর রূপযৌবনে টলমলে দেহ। রুকমিনের দিকে মেয়েটা চেয়েছিল একটুক্ষণ, একটা নিতান্ত অসহায় ব্যাধতাড়িত বনহরিণীর মত ছু'টো করুণ চোখ মেলে। তার বেদনা রুকমিনের অন্তর স্পর্শ করে। সে ভাবে, আহা, এই মেয়েটির মত দশা যদি হতো তার তাহলে কি করতো সে? এরপর রুকমিন তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে মেয়েটিকে। এতে অনেকে রুষ্ট হয় ভাওনাথের ওপর। সাহেবের কানেও সে-খবর যায় কিন্তু অসন্তোষের কোন লক্ষণ দেখা দেয়নি তাঁর চোখেমুখে। অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ ও মেয়েছেলেলোভী ভেতরে ভেতরে ফাঁক খুঁজতে থাকে। এদের মধ্যে জোয়ান ছেলেই বেশি। অনেক কিছু ইনিয়ে বিনিয়ে ভাওনাথের নামে অপবাদ রটায়। অন্ধকার হলে ইঁটপাটকেল ছোড়ে বাড়িতে।

ভাওনাথ একটুও বিচলিত বা ভীত হয়নি এতে। রুকমিনও না। সে বিশ্বাস করেনি ষড়যন্ত্রকারীদের কথা। সুখনী ও বিশ্বাস করেনি। সে বলেছিল ঠিকই করেছে রুকমিন, মেয়েদের ব্যথা মেয়েরা না বুঝলে কে বুঝবে? ভাওনাথ বলতো আজ ওরা পরস্পর বিরোধী নয়, পরম আত্মীয়, এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভাওনাথের নামে অপবাদ দিচ্ছে অথচ তারা এ-কথা বুঝতে পারছে না যে সে-ই একটা সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাদের। নতুবা নিশ্চয়ই কাটাকাটি মারামারি করে মরতো ওরা।

যাহোক্ লেঠাটা যত শিগগির হয় চুকিয়ে দেওয়াই ভাল এই ভেবে ভাওনাথ জরিমানার টাকাটা জমা দিয়ে খালাস করে নিয়ে আসে বিলাসীকে।

বিলাসীর টাকার অভাব ছিলনা। ঘরের মেঝেয় মাটিতে অনেক টাকা পোতা আছে তার। তাই বাগানে এসেই ভাওনাথের পাওনা টাকাগুলো দিয়ে দেয়। অধিকন্তু আরো কুড়ি টাকা দিতে যায় মেয়েটার খরচ বাবদ। ভাওনাথ নেয়নি তা।

রুকমিন ও সুখনীরও ইচ্ছা নয় যে বিলাসীর কাছ থেকে তার মেয়ের খরচ বাবদ টাকা নেয় ওরা। সুখনী তো স্পষ্ট বলেই ফেলে টাকা নিলে আর কি উপকার করা হলো? মন আর দরদ কি

পয়সা নিয়ে বিকিয়ে দেব ? আমাদের দিয়ে ও-সব হবে না বাচা। আর আমরা তোমার মেয়েকে কিই বা এমন খাইয়েছি। আর যাই বলো, তোমার মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে খুব। পাত্তির যা উপরি পয়সা পেয়েছিল তা দিয়ে এক ফাঁকে গুদরি বাজার থেকে চাল ডাল কিনে আনে। তার চাল ডাল সেই খেয়েছে, আর চাল ডাল বাদ দিলে পাঁচ জনের মধ্যে একটা লোকের খেতে কি এমন খরচ লাগে তুমিই বলো না।

এ-কথার কোন প্রতিবাদ বা উত্তর দেওয়ার মত ভাষা খুঁজে পায়নি বিলাসী। ভাবাবিষ্ট চোখে অল্পক্ষণ কি ভাবে তারপর ধীরে শান্ত পা ফেলে বাড়িমুখো যেতে থাকে সে।

এরপর থেকে বিলাসী ও তার মেয়ে বন্ধনি প্রতিদিনই ভাওনাথের বাড়িতে আসে। আসা যাওয়ার সময় অসময় নেই ওদের। বাড়ির লোকের মতই চলাফেলা করে অবাধে। বাড়িতে লাউটে কুমড়োটা শাকপাতা যাই হোক্ না কেন ওদের না দিয়ে খেত না ওরা। রুকমিনের সঙ্গেই কাজে যেত বন্ধনি। এতে দুই পরিবারের মধ্যে বেশ একটা অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে।

বিলাসী জেল থেকে খালাস পেয়ে আসার পর কয়েকদিন আর কোন নিন্দাবাদ কিছু শুনতে পায়নি কেউ। কোন ঢিলও পড়েনি ভাওনাথের বাড়িতে। দুই একটা জোয়ান ছোকরা যাতায়াত করে বিলাসীর কাছে। অনেক সাধুবুলি আওড়ায়। এখন আর ভাওনাথকে দোষে না তারা। পরস্পর পরস্পরকে সুযোগ বুঝে বিলাসীর কাছে অনেক গালিমন্দ দেয়। বিলাসী মেয়েলোক হলে কি হবে পুরুষের চেয়েও শক্ত সে। কারো কথাতেই তার মন ভেজেনা। মন দিয়ে সবার কথাই শোনে, নিজের মনে হাসে, মজা দেখে।

এর মধ্যে আবার একটা রব ওঠে বাগানে। বন্ধনিকে নাকি বিয়ে করবে ভাওনাথ। সুখনী ও শুনতে পেয়েছে। সে খুশি হয়নি এতে। বিলাসীকে ডেকে বলে—তুমি বাছা আর তোমার মেয়েকে পাঠিওনা আমাদের বাড়িতে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, এ-সব ভাল লাগেনা।

বিলাসীর মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুহূর্তে। সে বললো, ব্যাপার তো সবই বুঝতে পারছ তুমি। তোমার ছেলে ও খারাপ নয়, আমার মেয়েও না। বলে, বলুক। ওদেরই মুখ ব্যথা হবে শেষে। তারপর তুমি যা বলছ, বন্ধনিকে যদি তোমার বাড়ি আসা বন্ধ করি তাহলে সকলেই বলবে ছোড়াগুলো যা বলে তা ঠিক বটে।

রুকমিনও ছিল সেখানে। সে বলে, বলুক না ছোড়াগুলো যা ইচ্ছে হয় তাদের। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? আর ভাওনাথের সঙ্গে তো বন্ধনির দেখাই হয় না একরকম।

ভাওনাথ মাঝে মাঝে বিব্রত হয়ে পড়তো এ-জন্য। ঘৃণা হতো ঐ লোকগুলোর ওপর! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতো আর কারো জন্য কোন কিছু করতে যাবে না। কি দরকার তার, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার? নিজের মনে কাজ করবে, বাপ মা বউ মেয়ে নিয়ে সুখে দিন কাটাবে। যেমন আর আর মজুররা করে। পরক্ষণেই মনে পড়ে, সৎকাজে তো বাধা বিপত্তি থাকবেই, এতে পিছ্‌পা হলে চলবে না। রাতের অন্ধকারেই ফুল ফোটে। তারপর দিন আসে ফুল হাসে। এই কথা কটিই সেদিন তাকে বলেছিলেন নিরঞ্জনবাবু। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য কাজের চাপ ছিল তাই প্রায় বিশ একুশ দিন হয় দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। হঠাৎ দেখা হয় বড় সড়কে সেদিন। নিরঞ্জনবাবু বাজারে যাচ্ছিলেন আর ভাওনাথ ঘরে ফিরছিল জঙ্গল থেকে কিছু লক্‌ড়ি সংগ্রহ করে। তখন অন্ধকার হয় হয় প্রায়। একটা ধূসর ছায়ার আস্তরণ পাতা হয়েছে সর্বত্র। কিছুক্ষণ আগেই লাইনের গোয়ালা গরু নিয়ে ফিরেছে ঘরে। গরুর খুরে উড়ানো ধুলো তখনো রাস্তাটাকে অন্ধকার করে আছে। তবু কাছের লোক চেনা যায়। ভাওনাথ তার মাথার ওপরের বোঝা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতটা কপালে ছুঁইয়ে সেলাম করে নিরঞ্জনবাবুকে। অনেকদিন পর দেখা হওয়াতে কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে সে। অপরাধী মনে করে নিজেকে। প্রথমে সেলাম ছাড়া আর কোন বাক্যস্ফুরণ হয়নি তার।

নিরঞ্জনবাবু জিগ্যেস করেন, কেমন আছিস? কাজে খুব ব্যস্ত

ছিলি জানি, তাই দেখা করতে পারিসনি এতদিন ? ভাওনাথের জবাবের জন্ম অপেক্ষা না করে জিগ্যেস করেন আবার—হাঁরে, এসব কি শুনছি তোর নামে ? বিলাসীর মেয়েটাকে নিয়ে ? এই কথাগুলো এমন অতর্কিত ভাবে বললেন তিনি যেন একটুক্ষণ আগেও এ-কথা মনে ছিল না তাঁর।

ভাওনাথ নির্বাক ছিল। শুধু একটা ম্লান হাসির ঝলক খেলে যায় তার চোখেমুখে। নিরঞ্জনবাবু তার দিকে চেয়েছিলেন তখনো। তার চোখমুখের হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। অল্পক্ষণ বাদে বললেন, এসব কথা বিশ্বাস করেনি কেউ, ঘাবড়াসনে এ-জন্ম। ভাল কাজে বাধা হবেই। একদিন শুনতে পাবি যে কাটাকাটি মারামারি করে মরেছে ওরা।

কয়েকদিন পরের কথা। তখন রোজ রাতে 'রামলীলা' গান হয় বাজারে। ছাপড়া জেলা থেকে এসেছে এই রামলীলার দল। প্রায় একমাস আগে একবার এসেছিল এরা কিন্তু বাগান পাতিতে ভরে উঠেছিল তখন তাই অনুমতি পায়নি ম্যানেজারের। তিনি বলেছিলেন, এখন পাতির মরশুম পড়েছে, পাতি কমলে পরে এসো। এ-সময়ে তোমাদের রামলীলা গান হলে মজুররা রাত জেগে অসুখ করবে। কাজে যেতে পারবে না ওরা আর পাতির ডাঁটাও শক্ত হয়ে যাবে। এখন পাতি কমেছে তাই তারা এসে গান শুরু করেছে। গান একবার আরম্ভ হলে কমসে কম পনরদিন চলে তা। পালা গান। রামের বিয়ে, বনবাস, রাবণের সীতাহরণ, রামচন্দ্রের সীতাউদ্ধার ইত্যাদি পালা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হতেই আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে বাজার। ধুমল বাজে খোল করতাল মৃদাঙ্গ হারমনিয়ামের। মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো সবাই মিলে রামলীলার আসরে যায় মজুররা। সকলেই যে গানের আসরে যায় তাও নয়। অনেকগুলো জোয়ান ছোঁড়াছুঁড়ি এই সুযোগে ঝাড়েজঙ্গলে, বাগানে অথবা নরমগুদোমের দোতালা কিম্বা তেতালার আনাচে কানাচে গিয়ে তাদের গোপন কাজ সমাধা করে।

জউরু লাইনটা একেবরে বাগানের পশ্চিম প্রান্তে। সেখান

থেকে বাজারে আসতে বাগানের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটে নির্জন পথ পেরিয়ে গুদোম, পরে গুদোমধোড়া তারপর বাজার। অন্যান্য লাইনের লোকগুলোর তুলনায় এদের কাছেই সবচেয়ে দুরে বাজার। গুদোমধোড়াটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে বাজারে। এই লাইনটাকে দু'ভাগে ভাগ করে গিয়েছে একটা সড়ক। এর দুধারেই বস্তি। তবে এই রাস্তা দিয়ে বাজারে যেতে ঠিক বাজারের নিকটের খানিকটা পথের ডানদিকে বাঁশ বন। বস্তি নেই সেখানে।

এতোয়া থাকে জউরু লাইনে আর গুদোমধোড়াতে ভাদোয়া। বিলাসী ও ভাওনাথের. ঘরও গুদোমধোড়াতে। তবে ভাদোয়ার ঘর প্রায় বাজারের কাছে, বাঁশবনের উল্‌টো দিকে আর বিলাসী ও ভাওনাথের ঘর গুদোমের অনেকটা কাছাকাছি। আর আর সকলের মত এতোয়া ও ভাদোয়া রামলীলা গান শুনতে যায় প্রতিদিন। সীতাউদ্ধার পালা হচ্ছে। চারদিন হয়ে গেছে। খুব জমে উঠেছে গান। গুদোমে, পাতি ফাড়ুয়ার মেলাতে রাস্তাঘাটে সর্বত্রই সকলের মুখে ঐ এক গুঞ্জন। অনেক ছেলেমেয়ে এর মধ্যে গানের দু'একটা কলির সুর ভাঁজতে শুরু করেছে। আবার অনেকে হনুমানের অঙ্গভঙ্গি নকল করে মহড়া দেয়।

পাঁচদিনের দিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। রামলীলার আসর লোকে গমগম করছে তখন। অনেকক্ষণ ধুম্বল বেজে একটু থেমেছে এইমাত্র। গানের স্টেজে ফিসফিস ফুসফাস শোনা যাচ্ছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাদের অঙ্গসাজ নিয়ে ব্যস্ত। এর মধ্যে হঠাৎ একটা হৈচৈ হট্টগোলের আওয়াজ শোনা যায়। শব্দটা আসে গুদোমের দিক থেকে। অনেকে ভাবে, আগুন লেগেছে কি জানি। তাই গুদোমমুখো দৌড় দেয় তারা। ভাওনাথও ওদের সঙ্গে যায়। এরপর সকলেই রাস্তায় এসে দেখতে পায় লাইনে কোথাও কোন আগুনের চিহ্ন নেই কিন্তু বাঁশবনের রাস্তাটাতে লোক থৈ থৈ করছে। প্রত্যেকের মুখে ঐ এক কথা, কা ভেলেক? লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে কোনরকমে ভেতরে ঢোকে ভাওনাথ। এতোয়া আর ভাদোয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে তখনো। যে লোকগুলো বাঁধা দিচ্ছে ওদের, তাদের ঠেলে ফেলে হাত মুঠিয়ে

বুক ফুলিয়ে উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হয়ে যা হয় একটা কিছু হেস্তনেস্ত করার জন্য বদ্ধপরিকরভাবে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ভাওনাথ শুনতে পায় ভাদোয়া জনতাকে শুনিয়ে বলছে, শালা, বদমায়েস আছে। জউরু লাইন থেকে এসেছে বন্ধনীকে জোর করে সিঁদুর লাগাবার জন্যে। শালা চোর, লুকিয়ে ছিল এই বাঁশবনে। এতোয়া জোর গলায় উত্তর দেয়, তোয় তো ডাকু আছে। ভাওনাথকা ডেরামে ঢিল ছোড়নেঅলা। শালা, তুই তো ফন্দি এঁটেছিলি ভাওনাথকে মারার জন্যে। আমাকে ফুসলিয়েও ছিলি সেজন্য। এরপরও পরস্পরে অনেক কথা কাটাকাটি করে তারা। ভাওনাথ কেমন যেন ভাবাবেশে ছিল তখন তাই শেষের কথাগুলো কানে পৌঁছেনি তার। খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল ভাওনাথ একথা সত্য। কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিল তার চেয়ে বেশি। কারণ বাগানের এতগুলো বুড়োগুড়ো, মেয়েপুরুষ জানতে পেরেছে ঘটনাটা। আর তার নামে যে সমস্ত অপবাদ শুনেছে তারা তা সমস্তই মিথ্যা একথা প্রমাণ হয়ে গেল এখানে। আজ রাত্রেই বাগানের বেশিরভাগ লোক জানতে পারবে রামলীলার আসরে আর বাকি লোকগুলো জানবে কাল সকালে মেলাতে। এবারে ভাওনাথের নজর পড়ে বাঁশবনের দিকে। সে দেখতে পায় বাঁশবনের কতকটা অংশ ওদের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আরো একটু এগিয়ে যায় এতোয়া আর ভাদোয়ার দিকে। দেখতে পায়, ওদের দেহের অনেক জায়গা ক্ষতবিক্ষত। অল্প অল্প রক্তক্ষরণও হচ্ছে তা দিয়ে। কি জানি বাঁশের গিঁটে, কঞ্চিতে অথবা নখের খামচাখামচিতে এমন হয়েছে। এসব দেখে শুনে কারো বুঝতে দেরি হয় না যে ওরা উভয়েই বন্ধনীর প্রার্থী এবং দু'জনেই বাঁশবনে এসেছিল একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেখান থেকে বন্ধনীর গতিবিধি লক্ষ্য করবে আর সুবিধা মত তাকে নিয়ে গিয়ে জোর জবরদস্তি সিঁদুর লাগিয়ে দেবে। কিন্তু জঙ্গলে এসে [illegible]র সঙ্গে দেখা হয়ে উভয়ের ঈর্ষা প্রবলতর হয়ে ওঠে। কথা কাটাকাটি, বচসা থেকে শেষে মারামারি লাঠালাঠিতে রূপায়িত হয় তা। দু'জনের হাতেই তখনো একটা করে বাঁশের কঞ্চি। আরো এগিয়ে

গিয়ে দুজনেরই হাতের কঞ্চি কেড়ে নেয় ভাওনাথ। তারপর ওদের সম্বোধন করে বলে, গু'তে বাড়ি মারিস নে আর, কারো কিছু হবে না এতে তোদেরই গায়ে এসে লাগবে তা।

ভাওনাথকে দেখে উভয়েই যেন কিছু বলতে চায় তাকে। ভাওনাথ বলে, তোকের বাদ পিছেড়ি শুনবো মুই। আজ ছোড় দে। সে বুঝতে পারে তাদের কি কথা। একে অপরকে দোষারোপ করে ভাল মানুষ সাজতে চায়।

এরপর জনতা যে যার মত চলে যায়। আবার রামলীলার প্যাণ্ডেল ভরতি হয় লোকজনে। ঢাক ঢোল, খঞ্জনির চপ্‌চপ্‌ ঝনঝন শব্দ হতে থাকে।

ভাওনাথ আর গানের আসরে যায়নি। সোজা বাড়ির রাস্তা ধরে সে। মনটা অনেকদিন বাদে আবার খুশির ঢেউয়ে নেচে উঠছে বারেবারে, বুকটা স্ফীত হয়ে উঠছে গৌরবে। আজ সত্যিই সে অনুভব করে ভাল কাজের গোড়াতে দুঃখ, শেষে সুখ। মন আরো সতেজ ও দৃঢ় হয়, বাহুতে অপরিমেয় শক্তি পায়। এক্ষুণি বাড়িতে গিয়ে রুকমিন ও সুখনীকে বলতে হবে এসব কথা। সমস্ত সংশয়, ভয় ও দ্বন্দ্বের অবসান হবে তাদের। শান্তি পাবে মনে। ওরা যে বাড়িতেই আছে সেকথা ভাওনাথ জানে। সুকুরমণি ঠিক সন্ধ্যেটায় পরপর কয়েকটা হাঁচি দেয় তাই অসুখের ভয়ে গান শুনতে যাবে না স্থির করে রুকমিন।

ভাওনাথ বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় বিলাসী, বন্ধনী, সুখনী, রুকমিন ও লেংড়া খুব হাসাহাসি করছে আঙিনায় দাঁড়িয়ে। সুখবরটা আর দিতে হয়নি তাকে। বিলাসী ও বন্ধনী এসে আগেই দিয়েছে সংবাদটা। হল্লাহল্লি শুনে ভাওনাথের খোঁজে বেরিয়েছিল সুখনী ও রুকমিন। তাদের ধারনা হয়েছিল হয়ত এতোয়া ভাদোয়ারা ভাওনাথকেই মারপিঠ করছে। বিলাসী ও বন্ধনীও ভেবেছিল তাই। ঠিক সেই সময়ে গানের আসরে যাওয়ার জন্য বড় সড়কের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কি কথা হচ্ছে শোনার জন্য কান খাঁড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। এরমধ্যে গোলমাল থেমে যায়। রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরছে ভুটকা, তার

কাছে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে খবরটা সুখনী ও রুকমিনকে দেওয়ার জন্য সোজা ওদের বাড়িতে আসে।

বিলাসী হাসতে হাসতে সুখনীকে বলে, মুই তো তোকার কহো, ডরাইক নি পড়ি।

দশ

অনুকূল আবহাওয়ার জন্য বাগানের সকলের পক্ষেই এবছরটা ভালভাবে কাটে। অনেক দুঃখ দুর্দশা, বিপর্যয় বিবর্তনের মধ্যেও দিন মজুরগুলো সুখ স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখতে পায়। অনেকের অনেক অপূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ হয়। কেনাকাটা, পুজোপার্বন, বিয়েথা বেশ জাঁকজমক ভাবেই হয়। পুরোহিতদের মুখে হাসি ফুটেছে, দোকানদারও বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছে। দোকানের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। গিরিধারীলালের দোকান আরো বড় হয়েছে। আগে তাকিয়া ছিল না ফরাসে। সম্প্রতি তাকিয়া বানিয়েছে। কাঠের বাক্সের পরিবর্তে গদরেজ সিন্দুকের আমদানি করেছে। আজকাল তাকে সেই গদরেজ সিন্দুকের সঙ্গে তাকিয়াটা ঠেস দিয়ে আঁটোসাটোভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। আগের মত বড় একটা নড়াচড়া করে না। ভুঁড়িটাও দশমাসে পোয়াতীর মত স্ফীত হয়েছে। আজকাল ওখান থেকেই শকুনির চোখ মেলে নজর রাখে সবদিকে। গদিঅলা কালোয়ারের চটফটানি বেড়েছে। মদের পিঁপে আসছে প্রতিদিন। আগে একটা জলের জালা ছিল এখন তিনটে হয়েছে।

গোমড়ামুখো মক্কের মুখেও অফুরন্ত হাসি। চা হয়েছে অনেক। প্রতিদিনই কমিশনের অঙ্ক কষেন তিনি। যেদিন যে বিক্রীর হিসাব আসে সঙ্গে সঙ্গে পিনাকবাবুকে অঙ্ক কষে হিসাব করে এভারেজ বার করে বলতে হয় তাকে। যে চা তখনো বিক্রী হয়নি সেটারও এভারেজ রেটের ওপর অঙ্ক কষে বলতে হয়। বাগানের খরচপত্তরের হিসাব বাগানেই আছে। ম্যানেজিং এজেন্সীর অফিস ও বিলেতের অফিসের খরচ গত পাঁচ বছরের খরচের ওপর একটা গড়পড়তা কষে নিয়ে বাগানের খরচের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোট খরচের একটা হিসাব বার করেন। তারপর সমস্ত চা বিক্রীর জমা অঙ্কের থেকে খরচের ঐ অঙ্কটা বাদ দিয়ে লাভের অঙ্ক ঠিক

করেন। বাবুদের মুখেও হাসি। সাহেব যখন এত খুশি তখন নিশ্চয়ই দু'এক টাকা মাইনে বাড়বে তাদের। মজুরদের সে-সব বালাই নেই। দিনগত পাপক্ষয়। তারা ভাবে, আসছে বছরের কথা। তাদের হিসাবপত্তর তো চুকে গেছে বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বিলেত ও কলকাতা থেকে হোমরাচোমরা সাহেবরা এলেন। কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা এলেন, প্লান তৈরি করলেন মেসিনপওরের। বাগানে যে মেসিনপত্তর আছে তা বাগানের প্রয়োজন অনুপাতে নগণ্য। আরো মেসিনপত্তরের দরকার। মার্শাল, বিট্রোনিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরক্কো কোম্পানীর অনেক ইঞ্জিনিয়ার এসে গুদোম মাপঝোপ করেন।

কিছুদিন বাদেই মেসিনপত্তর আসতে শুরু হয়। কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়াররা এসে বসাচ্ছেন সেগুলো। ভাঙাচুরো গড়ার হৈচৈ চলছে গুদোমে। চুণ বালি শুরকি, সিমেণ্ট লোহলক্কড়ের খেলা হচ্ছে। এতো দিনের কথা, এরপর সন্ধ্যা হলেই বাংলোতে হাসির তুবড়ি ফোটে আর সেই সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসে কাচের জিনিসপত্তরের টুং টুং ঠুং ঠুং শব্দ, পিয়ানোর একটানা বাজনা আর একরকম উগ্র গন্ধ। এ-সব চলে অনেক রাত পর্যন্ত। কখন যে শেষ হয় সে-খবর রাখে না কেউ কারণ এর অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ে তারা। স্বপ্ন দেখে—রক্তচক্ষু, কানে শোনে [illegible], গালিগালাজ। ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। এই পালা শেষ না হতেই গুদোমের সিটি বেজে ওঠে। লাইনের জলের কলের ক্যাচক্যাচ খ্যাচখ্যাচ আওয়াজ শোনা যায়। সমস্ত লাইনে দিনের আলোতেও রাতের সেই স্বপ্ন জাগে আবার।

এই সময়ে ভাওনাথ ও রুকমিনের বিয়ে হয়। খুব ঘটা করে। বাপমায়ের একমাত্র সন্তান আর এই তাদের একমাত্র সর্বশেষ কাজ তাই বিয়েতে খরচপত্তরের কোন কাপণ্য করেনি তারা। তিনটি খাসি মারে, বিশ ঘইলা হাঁড়িয়া আনে। জাতভাই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সকলকেই পেট পুরে খাওয়ায়। সারা লাইনটা

উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে। এ-লাইন সে-লাইন থেকে গুচ্ছের বয়স্থা কুমারী ছুড়িগুলোকে নিয়ে এসে তিনদিন ধরে সার বেঁধে কী নাচগানই না করে বন্ধনী। রুকমিনের দেওয়া মাদলটার সদ্ব্যবহার হয় এবারে। প্রেমপ্রকাশের অনুরোধে মাদল বাজাতে হয়েছিল ভাওনাথকে। প্রথমটায় কেমন একটু বাঁধো বাঁধো লেগেছিল তার, নিজের বিয়েতে নিজে বাজানো কি ঠিক হবে? রুক্মিনকে নাচতে হয়েছিল সেই সঙ্গে। বন্ধনী জোর করে টেনে নামিয়েছিল তাকে। সারা উঠোনটাতে ত্রিপল ও গাছের ডালপালা পাতাপুতি দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করেছিল লেংড়া। প্যাণ্ডেলটাকে নানাপ্রকার ফুল ও পাতার সমারোহে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। এ আয়োজনটাও করেছিল বন্ধনী।

নিরঞ্জনবাবু খুব ভালবাসেন ভাওনাথকে তাই তাঁর জন্য খানিকটে মাংস, কিছু চাল ডাল তরকারী ও মিষ্টি নিজে গিয়েই দিয়ে আসে তাঁকে। ভাওনাথের ইচ্ছা ছিলনা, হাঁড়িয়ার আয়োজন করা হয় বিয়েতে কিন্তু বাপ মা, আত্মীয় স্বজন আর রুকমিনের অনুরোধে বাধা দিতে পারেনি তাতে। আর সত্যি, তাদের সমাজে হাঁড়িয়া, গোস না খাওয়ালে খাওয়ানোতে কোন নামডাক তো হয়ই না বরং নিন্দা অনিবার্য। একমাত্র ছেলের বিয়ে, এ অপবাদ বরদাস্ত করতে পারবে না তারা।

হাঁড়িয়ার আয়োজন হলেও ভাওনাথ নিজে খেতে নারাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবের পিড়াপিড়িতে খেতে হয় তাকে। তারা বলেছিল তোয় তানি না খাবে তো হামিলোক না খাবু।

এই বিশ মইলা হাঁড়িয়া বানিয়ে দিয়েছিল বিলাসী। হাজত থেকে ফিরলে, ভাওনাথ বারণ করেছিল বিলাসীকে যেন আর হাঁড়িয়া বা মদ চোলাই না করে সে। অন্য কোন বাড়ি থেকে কিনে আনবে এইটাই স্থির ছিল তাদের কিন্তু বিলাসী মানেনি। হাঁড়িয়া নাকি খুব উপাদেয় হয়েছিল। সবাই বলেছিল, এরকম হাঁড়িয়া আর কোথাও খেয়েছে বলে স্মরণ করতে পারেনা তারা। এই বিশ মইলা হাঁড়িয়ার দাম কমপক্ষে কুড়িটাকা। সুখনী বলেছিল, কিছু টাকা আগাম দেবে বিলাসীকে কারণ এ-জন্য লাল বাগড়া চাল আর

মশলাপাতি কিনতে হবে তাকে। বিলাসী নেয়নি, বলেছিল, পরে একসঙ্গে নেব সব দাম। ওরা মনে করেছিল ওদের নিকট থেকে হয়ত কোন লাভ খাবেনা বিলাসী তাই আগাম টাকা নেয়নি কিন্তু বিয়েথা হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধারণা বদলে যায়। বিয়ে হয়ে গেছে পাঁচদিন অথচ টাকার কথা মুখেও আনেনা বিলাসী। সুখনী একদিন জিগ্যেস করে—তোকের হাঁড়িয়াকা দাম কেতনা দিদি ?

একটু হেসেছিল বিলাসী। অল্পক্ষণ চুপ থেকে কি একটু ভেবে নিয়ে বললো—ভাওনাথ মোর পুত লাগে। ওর বিয়ের হাঁড়িয়াটা না হয় আমিই দিলাম, কিছু মনে করোনা এতে।

ভাওনাথেরা খুশি হতে পারেনি এ কথায়। লেংড়াও অনুরোধ করেছিল কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়নি বিলাসী।

ভাওনাথের কথাটা শেষ পর্যন্ত রেখেছিল বিলাসী। ভাওনাথ বলেছিল—আচ্ছা, হাঁড়িয়ার দাম না হয় না নিলে কিন্তু কথা দেও আর এ-ব্যবসা করবে না।

বিলাসী উত্তরে বলে, ঠিক আছে, আউর না বানাবু।

সত্যি, এরপর আর কোনদিন হাঁড়িয়া কি দারুর ব্যবসা করেনি বিলাসী। কারো অনুরোধ রাখেনি। এতে অনেকে অনেক কথা শুনিয়েছে তাকে। এমন কি দু'চারটে কুকথাও বলেছে।

এরপর নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে ছয় মাস। জ্যৈষ্ঠের শেষে হঠাৎ পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে ঝড় আসে একদিন। অজস্র গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে মড়মড় শব্দ করে। উত্তরের সমস্ত পাহাড়টা নেমে এসে বুকের ওপর চেপে বসে। আকাশটাও নেমে এসেছে মাটিতে। আজও ভাওনাথের চোখের সামনে সেই ছবি স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। এ কী সেই শব্দ, সমস্ত পাঁজরটা ভেঙে বেরিয়ে আসে হৃদপিণ্ডটা। সারা বাগানটা তছনছ হয়ে যায় বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে। বাগানের চেহারা বদলে গেছে। রাস্তা ঘাট ঘরবাড়ি লতাপাতা ডালপালা আর আবর্জনায় ভরতি। একটা নিস্তব্ধ বিষণ্ণ কালছায়া সারা বাগানটার ওপরে নৃত্য করছে। স্বপ্নেতেই শুধু অনুভব করা যায় সেইরূপ, বাস্তবে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। দিগ্

দিগন্তে কেবল কান্নার রোল আর বেদনার্দ্র হৃদয়ের মর্মান্তিক হা-হুতাশ।

কলমকরা চা গাছগুলোতে সবেমাত্র নতুন ডালপাতা গজিয়েছিল তা সব ভেঙে গেছে শিরীষ খাঁকড় গাছের বড় বড় ডাল পড়ে। একটি পাতা ও নেই কোন গাছে। শুধু একটা কঙ্কাল যেন উর্ধ্বমুখী হয়ে হা-হুতাশ নিবেদন করছে কার কাছে।

পরদিন সকাল থেকেই বাগানের সমস্ত মেয়ে পুরুষ মজুর লেগে যায় সেই সব আবর্জনা পরিষ্কার করতে। মজুরদের ঘর তৈরি করার কথা স্বপ্নের মতই অন্ধকারে পড়ে রইলো। ম্যানেজার বললেন, ও সব পরের কথা, আগে বাগান থাকলে তো থাকা খাওয়া। সমস্ত বাগানের জঞ্জাল ছাপ করতে দু'হপ্তা লাগে। এই আবর্জনা পরিষ্কার করতে অনেকের হাড়গোড় হাত পা ভাঙে। বাগানের ভেতরকার জল নিষ্কাশনের পাঁচ ছয় ফুট গভীর আর তিন ফুট চওড়া নালাগুলো ডালপাতা পাতাপুতিতে ভরতি থাকায় কোথায় যে নালা তা অনুমান করতে না পেরে এই দুর্দশা হয় তাদের। তবু মাজা বুক পিঠ কোঁচিয়ে কোঁচিয়ে কাজ করতে হয়। তা না হলে খাবে কি? পেটের ক্ষুধা মাজা বুক পিঠের ব্যথার চেয়ে অনেক বড়। বুড়োরা হয়ত দু'দিন উপোস দিতে পারে কিন্তু কাচ্চাবাচ্চা-গুলোর কথা মনে হতেই চোখে জল আসে তাদের।

বাগান পরিষ্কার করার পর মজুরদের ঘর তৈরির পালা শুরু হয়। একটা খড়ও নেই ওষুধ করতে। ম্যানেজার কেঁকু ঠিকাদারকে হুকুম দেন, ঝড়েভাঙা ঘরগুলোর খড়কুটো কুড়িয়ে নেও আর গাছের লতাপাতা ডালপালা দিয়ে ঘর খাঁড়া কর কোনমতে। ঘরগুলো খাঁড়া হলো বটে কিন্তু অনাগত দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ হতেই মনটা বিষিয়ে ওঠে তাদের। ক'দিন বাদেই তো বৃষ্টি সুরু হবে, পাহাড়ী বৃষ্টি, ওরা কি করবে তখন? এ ছাড়া ঝড় ও শিলের ভয় ও আছে। এই পাতাপুতি পঁচাছেঁড়া কুঁটো কাটা কি কোপ সহ্য করতে পারবে তাদের? উপায় নেই, নিজেরাই জঙ্গলে গিয়ে গাছের বাকল নিয়ে আসে, সেগুলো থেকে আঁশ বার করে তা দিয়ে আরো গিঁটগাট দিয়ে একটু শক্তসামর্থ করে নেয় ঘরগুলো। অনেকে সাহেব বাবুর কাছে

ধরনা দিয়েছিল একটু রশি কি এক টুকরো বাঁশের জন্য কিন্তু পায়নি। জঙ্গল থেকে এই গাছের বাকল সংগ্রহ করতে দু'একজন মজুরকে বেশ নাস্তানাবুদ হতে হয় ফরেষ্ট গার্ডের হাতে। এজন্য শেষ পর্যন্ত তার হাতে দু'একটা টাকা গুজে দিয়ে তবে নিস্তার পায়। গোবর মাটি দিয়ে খড় পাতাপুতির দেওয়ালগুলো ঠিক করে নেয়। নতুবা লাইনের গরুবাছুরগুলো ঐ খড় পাতাপুতি খেয়ে নষ্ট করে দেবে দেওয়ালটা। আর এই গোবর সংগ্রহ করাতেও যথেষ্ট বিপদ। ম্যানেজার সাহেবের কড়া হুকুম লাইনের রাস্তাঘাটের গোবর নিতে পারবে না কেউ। কারণ এই গোবর সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানী থেকে লোক আছে, তারা এই গোবর নিয়ে নিয়ে চা গাছের গোড়াতে গোড়াতে ছিটিয়ে দেয় জমিটা সারালো করার জন্যে। তাই সন্ধ্যের পরে চুপিচাপে এই গোবর জোগাড় করতে হয় তাদের, কেউ যেন দেখতে না পায়।

বাগানের ভেতরের আবর্জনা পরিষ্কার ও ঘর তৈরির কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ঝড়েভাঙা শিরীষ খাঁকড় গাছের অসমান ডালপালাগুলো সমান করে কাটা আর যেটা গোড়াতেই ভেঙে গেছে তার মূল উপড়িয়ে ফেলা। কলমকরার মত করে কাটলে শিগগির করে বৃষ্টি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর গোড়া দিয়ে নতুন ডাল গজাবে আবার দেখতেও সুন্দর হবে। মুন্সী, চাপরাসীরা বেছে বেছে লোক ঠিক করে একাজের জন্য কারণ এই কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। এছাড়া এই সঙ্গে এই লোকগুলো সবল ও বলিষ্ঠ হওয়া চাই এবং ভাল গাছেচড়া জানা থাকাও দরকার। লেংড়ার দেহ সুপুষ্ট ও দৃঢ় এবং গাছে চড়তে পারে ভালো তাই ঐ-কাজে লাগতে হয় তাকে। তিনদিন কাজ হওয়ার পর সমস্ত বাগানের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড আগুনে বাতাস বয়। সমস্ত মজুররাই ভীত, সন্ত্রস্ত। গাছে চড়ে ডালপালা কাটতে আর রাজী নয় কেউ। এর কারণ লেংড়া একটা সাদা শিরীষগাছের ডাল কাটতে কাটতে মাটিতে পড়ে যায় হঠাৎ। সাদা শিরীষের ডালাপালা কালো শিরীষ ও খাঁকড়ের চেয়ে নরম। লেংড়া লক্ষ্য করতে পারেনি আগে যে ডালটা কাটছে সে তার গোড়াটা পোকা

খাওয়া। ডালটা তার ভার বহন করতে পারেনি, ফলে গাছ থেকে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর। এমনভাবে পড়ে যে সমস্ত চোটটা লাগে মাথায় ও বুকে। রক্তক্ষরণ হয় মুখ দিয়ে। সেই রক্তক্ষরণ আর বন্ধ হয়নি। তিনদিনের মাথায় সব শেষ হয়। মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে কী আপ্রাণ লড়েছিল লেংড়া সে-কথা ভাবতে পারেনা ভাওনাথ। হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল মৃত্যুকে। সুদৃঢ় পেশীবহুল দেহটা প্রতিক্ষণই অস্বীকার করে বারবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় কিন্তু মৃত্যু সাপের প্যাঁচের মত তার সারা দেহটাকে এমনিভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে সেই বন্ধন শিথিল করা তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই ছবি আজও ভাওনাথের চোখের ওপর ভাসে।

লেংড়ার অসুখের কয়দিন বিলাসী ও বন্ধনী তাদের দরদমাখা মন দিয়ে সেবাযত্ন করে তাকে। সুখনী ও রুকমিন তো বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। মুখে কোন শব্দ ছিল না তাদের। বিলাসী গারো লাইন থেকে বিফইয়া ওঝাকে এনে ঝাঁড়াপোছা করে, বড় সড়কের তেমাথায় পুজো দেয় সন্ধ্যেবেলায়। একটা গাই ছিল বিলাসীর। দু'মাস আগে বাচ্চা দিয়েছিল গরুটি। তার সমস্ত দুধই লেংড়ার জন্য দিত সে।

এরপর শ্রাদ্ধের সময়েও যে উপকার করে বিলাসী তা মনে হতেই ভাওনাথের মাথা নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়। যে টাকা কামিয়েছিল তারা সে-সমস্তই বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে। তারপর দু'চারটাকা যা উদ্বৃত্ত ছিল তা ঘরবাড়ি ঠিকঠাক করতে লেগে যায়। খুব ভাবনায় পড়েছিল ভাওনাথ, কি দিয়ে কি যে করবে সে? ভেবেছিল, নিরঞ্জনবাবুর কাছে গিয়ে হাত পাতবে আবার। এ-ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই তার। কারণ সাহেবের যে নেকনজর তার ওপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলাসী কোথাও টাকা ধার করতে যেতে দেয়নি তাকে। বিলাসীই বিশটি টাকা দেয় এবং তাই দিয়েই কয় ঘইলা হাঁড়িয়া আর কিছু মাংস কিনে জাত-ভাইদের খাইয়ে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পায়।

ভাওনাথের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে কোন কাজকর্মে হাঁড়িয়ার ব্যবস্থা করে সে। কিন্তু বাপের কথা ভাবতেই একটা ধাক্কা খায় মনে। দেখতে পায় সেই জীবন্ত লেংড়াকে। সে যেন ভাওনাথের সমস্ত মনোভাব বুঝতে পেরে দু'টো রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে শক্ত পাথরের মত মনটা নরম কাদায় পরিণত হয়। মনে করে জীবন্তের ক্ষমা আছে, মৃত আত্মার তা নেই।

এই কুড়ি টাকা যা ধার দিয়েছিল বিলাসী, তা ফেরত চায়নি সে। কিন্তু ভাওনাথ মানেনি তা। সে বলেছিল, এ-টাকা নিতেই হবে তোমাকে। বাপের কাজে খয়রাতী টাকা কখনো নেব না আমি।

বারবার বিলাসীর এই উদারতার কারণ বুঝতে পারে না রুকমিন। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে মনে। একদিন তো ভাওনাথকে বলেই বসে—দেখ, আমার যেন কেমন সন্দেহ হয় বন্ধনীর মার ওপর। ওদের সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা না থাকাই ভালো।

ভাওনাথ হেসে উড়িয়ে দিতে চায় রুকমিনের কথা কিন্তু রুকমিন প্রতিবাদ করে।

এর ছয়মাস পরে বন্ধনীর বিয়ে হয় রাইমটাং বাগানের ডমরু সর্দারের ছেলে চামরুর সঙ্গে। বিলাসী ভালরকম খরচপত্তর করে বিয়ে দেয় মেয়েকে। তার ইচ্ছা ছিল চামরুকে ঘরদামাদ করে রাখবে কিন্তু ডমরু রাজী হয়নি এতে। প্রথম প্রথম চামরুকে খুব ভাল লেগেছিল বিলাসীর। বন্ধনীরও। কিন্তু তিনমাস পার না হতেই স্বরূপ ধরা পড়ে তার। তারা দেখতে পায়, চামরু একটা বদ্ধ মাতাল, কাজকর্ম কিছুই করে না সমস্ত সময়ই হাঁড়িয়ায় চুর হয়ে থাকে। কথায় কথায় মারধর করে বন্ধনীকে। একদিন তো নেশার ঘোরে টাঙ্গি দিয়ে কোপ মারে। ভাগ্যিস তার হাতটা চেপে ধরতে পেরেছিল বন্ধনী তাই রক্তারক্তিটে কম হয়। তবুও টাঙ্গিটার একদিকের ছুঁচলো আগা লেগে বাঁ হাতটা সামন্য জখম হয়। এই ঘটনার পরই তাকে নিয়ে আসে বিলাসী, চামরুর

কাছে যেতে দেয়নি আর। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন মহাকাল। তিনিই দুইমাস পরে একদিন ডেকে নেন বন্ধনীকে। বন্ধনী মারা যায় দশদিনের জ্বরে।

বন্ধনী মারা যাওয়ার পর বিলাসীর ওপর খুব দরদ হয় রুকমিনের। অনেক সান্ত্বনা দেয়, তথ্য কথা শোনায় তাকে। যখনই সময় পায় তার কাছে গিয়ে কাজকর্মে সাহায্য করে, চুলে তেল দিয়ে, নিজের চুল থেকে কাঠের কাঁকুই তুলে নিয়ে তার অবহেলিত এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে দেয়। চুলে অনেকদিন তেল চিরুনি না পড়াতে মাথায় উকুন হয়েছে, খুঁটে খুঁটে মেরে দেয় সেগুলো। সত্যি কথা বলতে কি এই করে রুকমিন তার মন দিয়ে বিলাসীর মন নেয়; বন্ধনীর শূন্য স্থানটির অনেকটা অংশ দখল করে বসে সে। এই থেকে বিলাসী আর তাকে নাম ধরে ডাকে না, মাইয়া বলে। রুকমিনও আমা বলে তাকে।

এরমধ্যে ডমরু ও চামরু অনেকবার এসেছে বিলাসীর কাছে। ডমরু বলেছিল, তুমি একা মানুষ তারপর মেয়েছেলে কি করে থাকবে একা ঘরে চামরুকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেই, তোমাকে দেখাশুনা করার জন্য। এ-প্রস্তাবে ক্রুর সাপিনীর মত ফুঁসে ওঠে বিলাসী। বলে, আমার মেয়েকে খেয়েছ, এবারে আমার হাড়মাস খাবে বুঝি? বিলাসী ভালোই জানতো যে এ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, তার যা টাকাকড়ি আছে সেটা হাত করতে চায়। সে কিছুতেই পাত্তা দেয়নি তাদের। চামরু তার জন্য হ্যামিলটনগঞ্জের হাট থেকে একবার একটা শাড়ি কিনেছিল কিন্তু তা হাতে নেওয়া তো দূরের কথা সেটাকে পা দিয়ে ওঠোনে ধুলোবালির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এরপর চৈত্রের বাতাস বয়। আকাশ আগুনে লাল। অতি উঁচু গিরিশৃঙ্গগুলোতে বরফ জমে নেই আর। সেখান থেকে বানের মত ছুটে আসছে আগুনের হলকা। শিরীষ ধাঁকড়ের সবুজ সুঁটিগুলো তেলেভাজা বেগুনের মত শুকিয়ে চিমসে মেরে গেছে। তাদের বেতাল বাজনা কেবলমাত্র কালবৈশাখীর একটা

সঙ্কেত জানাচ্ছে। শেষে সত্যিই কালবৈশাখীর ঝড় আসে একদিন। বাতাসে বাতাসে বিষ। শুরু হয় বসন্ত, কলেরা। লাইনকে লাইন উজাড় হয়ে যায় তাতে। অনেক লোক মারা যায়। সুখনীও। তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তটা মনে পড়ে ভাওনাথের। ফ্যাকাশে রক্তহীন চোখে মুখে একটা নিশ্চিত প্রশান্তির ছাপ। মৃত্যু যেন চেয়েছিল সে আর তাই পেয়েছে। একবারমাত্র চেয়েছিল তার দিকে। ঠাণ্ডা ঠোঁট দুটো একটুও নড়েনি, কেবলমাত্র চোখ দু'টো কি যেন এক দুর্জ্ঞেয় ইংগিত করে। উপরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে সে, যেন কার মিলনপ্রার্থী।

উপর্যুপরি অনেকগুলো আপদবিপদের সঙ্গে লড়তে লড়তে সত্যি মুষড়ে পড়ে ভাওনাথ। পাগলের মত উদাস অলস ভাবে বসে বসে কি ভাবে, শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। অনেক প্রশ্ন জাগে মনে—কেন, কি জন্য এমন হচ্ছে, কি অন্যায় করেছে সে। লোকের মুখে চিরকাল শুনে আসছে সে যে পুণ্য করে তার দুঃখ থাকে না, সদ্গতি হয় তার আর যে পাপচারী সে সুখী হতে পারে না জীবনে, তার অধঃগতি হয় কিন্তু সে বুঝতে পারে না এ-সব কথার কোন মূল্য আছে কিনা। মাঝে মাঝে মনে করে পাপপুণ্য বলে কোন কিছু নেই জগতে। জগতটা চলে তার ধারা নিয়ে যেমন নদী চলে, তার মুখে যা পড়বে তাকেই এমনি নাজেহাল হতে হবে।

বিলাসীর ঋণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তার ঋণ কিছুতেই শুধতে পারবে না সে। সুখনীর অসুখেও অনেক করেছে বিলাসী। যে তের চোদ্দ ঘণ্টা বেঁচেছিল সে, অবিশ্রান্ত সেবা করেছে তার। আর শুধুই কি তাই? শ্রাদ্ধের সময়েও টাকা পয়সা, গতর ঢেলে দিয়ে সাহায্য করেছে। কে এই বিলাসী? পূর্বজন্ম বলে কি কিছু আছে তা হলে? আর তা না হলে এমন দরদী মন দিয়ে দেখবে কেন তাদের? না, এ একটা চোখের ভাললাগা। অনেকে তো অনেক জিনিস ভালবাসে। ফুলকে ও। তাহলে কি ফুলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল পূর্বজন্মে? না, তা নয়, এটা লোকের স্বভাবসিদ্ধ। তারা সৌন্দর্য ও রূপের পূজারী তাই ফুলকে এত ভালবাসে। না,

শুধু তাও নয়, জগত আছে, পূর্বজন্মও আছে। মানুষ আছে ফুল ও আছে, পরস্পরের পরিচয় ও আছে সৃষ্টি থেকে। তাহলে বিলাসী পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই একজন পরম আত্মীয়া ছিল তার। এ বাগানে এসে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি কিছু তবে বিলাসীর কথা মনে হলে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে ওজন করে দেখতে পায় সে যে তার লাভই হয়েছে। এ বাগানে না এসে অন্যত্র গেলে এই লাভ হতো না তার। মৃত্যু, আপদ বিপদ এতো অনিবার্য। কোনদিন কি এর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে কেউ? যেখানেই থাকুক এই বিপদ বিপর্যয় আসতোই তার তাহলে বিলাসীকে এমন নিজের করে পাওয়া নিশ্চয়ই হতো না।

বিলাসী সান্ত্বনা দেয়, বলে—এটা ঋণ না ছোওয়া। আমিই ঋণী ছিলাম তোর কাছে আর জন্মে।

বাপ মা উভয়ের মৃত্যুতে বড় বেশি ফাঁকা হয়ে গেছে বাড়িটা। বিড়েল কুকুর এমন কি ঘরের একটা জিনিস খোয়া গেলে যখন বাড়িঘর ফাঁকা হয়ে যায় তখন দুটো মানুষ যাদের সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ তাদের অবর্তমানে হবে না কেন? ঘরে একটুও তিষ্ঠতে পারেনা ভাওনাথ।

রুকমিন বলেছিল, বিলাসীকে বাড়িতে নিয়ে আসতে। অবশ্য এ-প্রস্তাব নিজে থেকেই দিয়েছিল বিলাসী কিন্তু এতে রাজী হয়নি ভাওনাথ। সে বলেছিল, আর মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই রুকমিন। সে তো সমস্ত সময়ই বাইরে বাইরে থাকে, রুকমিনের কথা ভাববার ফুরসৎ হয়নি তখন। তার কি দশা? ছোট্ট একরত্তি একটা মেয়েকে নিয়েই ভুলে থাকে সে।

এগারো

বাপমার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়েই কেমন উদাস, নিরাসক্ত হয়ে পড়ে ভাওনাথ। তিন বছর কেটে যায় তবু তার পরিবর্তন নেই। কাজ না করলে চলে না তাই কাজের সময় কাজ করে। কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই। বাকি সময় নির্জন রাস্তা দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়ায় উদাসী বিবাগীর মত। কত কি প্রলাপ বকে নিজের মনে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হলে নিজেকে লুকিয়ে চলতে চেষ্টা করে। তারা প্রবোধ দেয়, জগত পরিবর্তনশীল, আজ যা আছে কাল তা নেই তখন তোমার আমার বেলাতেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন তার? সুখ দুঃখ এই দুই নিয়েই এই দুনিয়া। এর মানুষ। শুধু মানুষ কেন, প্রতিটী জীব। হাঁ না কিছুই বলেনা ভাওনাথ। এ সমস্তই সে জানে তবু মনটা কিছুতেই মানতে চায়না সেই কঠোর নির্মম নিয়তি, শুনতে ইচ্ছা হয় না এ-সব কথা। এ-সমস্তই অতি পুরনো কথা। কিন্তু যেখানে যতটুকু মানুষের হাত আছে তা করে কই তারা? মানুষই তো মানুষকে নিয়তির হাতে সঁপে দিতে সাহায্য করে।

রুকমিনও অনেক ভাবে বুঝিয়েছে ভাওনাথকে। সে যদি এমনিভাবে থাকে তা হলে রুকমিন বাঁচে কি করে? সুকুরমনিকে নিয়ে ভুলে থাকতে বলে।

সত্যি, রুকমিনের দেহটা অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। যৌবনের সেই রূপলাবণ্য নেই, লীলায়িত অঙ্গে আর ঢেউ খেলে না। অকালেই বার্দ্ধক্য দেখা দিয়েছে, রগের চুলগুলোতে পাক ধরেছে। এ-জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা হয় ভাওনাথের। মনটাকে বাঁধতে চেষ্টা করে। করেও তা। দু'চারদিন কাজের পর আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। এর মধ্যেই রুকমিনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আবার। কিন্তু ঘরে আর বসে থাকতে পারেনা ভাওনাথ, দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

বিলাসী প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে আসে। ভাওনাথকে দেখতে

পেলেই বলে, রুকমিন ও সুকুরমণিকে নিয়ে ভুলে থাক্ ছোওয়া। দেখলি তো, আমি কেমন করে ভুলেছি বন্ধনীকে। বিলাসীর চোখে জল আসে। তা দেখে ভাওনাথ আর চেপে রাখতে পারে না তাকে, তার চোখদুটোও ছলছলিয়ে ওঠে জলে।

এরমধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে একদিন। রাত প্রায় দশটা। একটুক্ষণ বাদেই গুদোমের দশটার ঘণ্টা বাজে। ভাওনাথ তখন নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে ঘুরছিল আর অনেক কিছু ভাবছিল। সে শুনেছে, অনেকে নাকি মৃত আত্মাকে দেখতে পায়, তাদের সঙ্গে কথা হয় কিন্তু কই সে তো তার বাপমায়ের কথা কত চিন্তা করে তবু তো দেখতে পায় না তাদের। কথাও শুনতে পায় না। এতদিনের মধ্যে স্বপ্নেও দেখেনি কোনদিন। সে আরো শুনেছে মৃতব্যক্তি নাকি তার চিন্তা ও হৃদয়বৃত্তি দিয়ে একটা মানসমূর্তি তৈরি করে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় আকাশে বাতাসে ধরে রাখে পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়, ঘুরেফিরে বেড়ায়। তাহলে কি এ-সব মিথ্যা অথবা সদ্গতি হয়েছে তাদের। মনে মনে ক্ষণিকের শান্তি অনুভব করে, একটা অজ্ঞাত আনন্দে মেতে ওঠে সে। শুনতে পায় অশরীরী বাণী, কারা যেন আশীর্বাদ করছে তাকে। এদিক সেদিক তাকায়, দেখতে পায়না কিছুই। মনটা পাগলের মত ছুটতে থাকে দিগ্ বিদিগ। হঠাৎ একটা হট্টগোল শুনতে পেয়ে তন্ময়তা কাটে।

গোলমালটা আসছিল বড় সড়ক থেকে। গদিখানা হবে বলে মনে হয় ভাওনাথের। সে ভাবে, কতকগুলো লোক হয়ত দারু খেয়ে মাতলামি করছে। আজ বিকেলে তলব পেয়েছে এ তার জের। এই তো মজুরদের রীতি। তলব হাতে পেলে কে রাজা কে প্রজা এ খেয়াল থাকেনা তাদের। কাল সকালেই হাহাকার শুরু হবে আবার। একটি পয়সা থাকবে না হাতে যে তা দিয়ে চাল ডাল তেল নুন কিনবে। সর্দারের কাছে হাত পাতবে, বেশ দু'চারটে কড়া কড়া কথা শুনবে। এজন্য কোন দাগ লাগেনা তাদের মনে, গা-সহা হয়ে গেছে শুনতে শুনতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সরগোলটা আরো জোরালো হয়। ভাওনাথ শুনতে পায়, নানা

ভাষার নানা কথা, মারো শালাকো, কুটহু হোস উসিকো, শালা ওটোঙ্গা আহে, টাঙ্গি লে আও, খুপরি দিয়েরে এওড়া কোপ মারহু, আরো কত কি।

এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয় ভাওনাথ। বড় সড়কটাতে লোক ধরেছে না তখন। গদিখানাতে যাঁরা দারু খাচ্ছিল তার মধ্যে অনেকেই বেরিয়ে আসে। ছোটসাহেবও এসে পড়েন। ভাওনাথ এগিয়ে যায় জনতার মধ্যে। ছোট সাহেবও।

ছোটসাহেব জিগ্যেস করেন, কা হোয়া?

অনেকেই অনেক কিছু জবাব দেয়। দারুণ হট্টগোলে, কারো কথাই স্পষ্টভাবে শুনতে পায়নি ওরা। বারে বারে একই কথা শোনা যাচ্ছে, ওটোঙ্গা আহে।

ওটোঙ্গা নাম শুনলেই ভয়ে শিউরে ওঠে মজুররা। এ নাকি লাইনে কি গ্রামে ঢুকলে সেই লাইন; গ্রাম উজাড় করে দেয়, লোকগুলোকে ছিন্নমস্তক করে।

জনতা রুখে যায় লোকটার দিকে। ছোটসাহেব নিষেধ করেন। কে শোনে তাঁর কথা? চারিদিকে হাত ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। সেই ছয় ফুটের ওপর লম্বা বলিষ্ঠ লোকটা ভয়ে কাঁপছে। কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে তার লম্বা লম্বা চুল আর দাঁড়ি উপড়োতে থাকে। একজন তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে একটা বাড়ি মারে তার পায়ে। একটা আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ে লোকটা। ছোটসাহেব আর ভাওনাথ লোকটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। পিছন থেকে গিয়ে টাঙ্গি দিয়ে কে যেন একটা কোপ মারে। অনেক লোকের মধ্যে সেটাকে খুব জোরে চালাতে পারেনি, হাত ঠেকে যায় দু'একজন লোকের কাঁধে, মাথায় তাই রক্ষে নতুবা একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে যেত নিশ্চয়। টাঙ্গির কোপটা [illegible] গায়ে লাগেনি, লেগেছিল ভাওনাথের বাঁ হাতে। হাত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, ছোটসাহেব তাঁর রুমাল দিয়ে হাতটা বেঁধে দেন।

ছোটসাহেব রেগে উঠে বলেন, হাম পুলিস বোলায়েগা। সবকা হাজতমে ভেজ দেয়েগা।

জনতা শান্ত হয় এতে। সুড় সুড় করে যে যার ঘরে চলে যায় তারা। ছোটসাহেব ও ভাওনাথ লোকটাকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন। ওষুধ দিয়ে ভাওনাথের হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দেন ডাক্তারবা্ু।

এই লোকটি পাঞ্জাবী, পলাশডাঙ্গা বাগানের হাবিলদার। সে এসেছিল কতকগুলো কুলির খোঁজে। তারা নাকি ঐ বাগান থেকে ভেগে এসেছিল এদিকে সন্ধ্যেবেলায়। লোকটিকে নিয়ে ছোটসাহেব সোজা বড়সাহেবের কুঠিতে যান। তারপর সেই রাত্রেই বড়সাহেব তার টমটমে করে পলাশডাঙ্গা ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দেন তাকে।

ছোটসাহেবের ইচ্ছা ছিল পুলিশে খবর দেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাব নাকচ করেন বড়সাহেব। তিনি বলেন, পুলিশে খবর দিলে কালই দেখতে পাবে যে বাগানে আর একজনও অদিবাসী নেই।

চোটটা খুব জোরে লাগেনি তবুও ভাওনাথকে ঘরে বসে থাকতে হয় দু'দিন। সে কাজে যেতে চেয়েছিল ঐ অবস্থাতেই কিন্তু কাচা ঘায়ে যদি আবার নতুন করে চোট লাগে তাহলে একটা অনর্থ ঘটবে এই ভেবে রুকমিন ও বিলাসী যেতে দেয়নি।

এরমাঝে তাকে দেখতে আসে একদিন কোলা। অনেকদিন বাদে আজ দু'দিন হয় বাগানে ফিরেছে সে। আজকাল প্রায়ই রাঁচী, নাগপুর, লোহরডগাতে কুলি চালানের জন্য জ্ঞানবাবুর সঙ্গে থাকে সে। ভাওনাথের অনেক কথা হয় তার সঙ্গে। একথা সেকথার পর সে দেশের কথা জিগ্যেস করে তাকে। এক এক করে দেশের সেই ছোট মেটে ঘরবাড়ি, পাহাড় পর্বত, সবুজ ধানের ক্ষেত স্বপ্নের মত চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে। ছেলেবেলার সেই দিনগুলি, মাঠে হুড়োহুড়ি করা, ডাণ্ডগুলি, দাঁড়িবিন্তে, গোল্লাছুট কাকউড়ানী খেলা। তাদের হালের সেই গরু দু'টো, মুরগী হাঁস, গরুর ঘাসকাটা, কিনকেলের হাট, শিবু মহাজনের দোকান আরো কত কি। মনটা বিষিয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্য। কোলার মুখখানি কেমন যেন কদাকার, নির্লজ্জ, নিরস, কুটিল বলে মনে হয়। মনটা বশে এনে শান্ত হতে চেষ্টা করে। ভাবে—ওর কি দোষ।

নিয়তিই এজন্ত দায়ী। তবুও কেন যেন কোলাকে দেখতে ইচ্ছা করে না তার। কি জন্ত এমন হয় তা অনুভব করতে পারে কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করে নাগাল পায় না তার।

কোলা জিগ্যেস করে, ক্যায়ছান লাগোথে কামানকা কাম?

ভাওনাথের মুখচোখ শুকিয়ে যায় এ-প্রশ্নে। ঠোঁট দুটো বেকিয়ে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, ঠিক নেই লাগোথে।

কোলার সঙ্গে আর বেশি কোন কথা হয়নি এরপর। সেও হয়ত তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল।

কোলা বলে তোকের দিল ঠিক নখে। বাপমাই মরকে বিগাড় গেলেক। বাপ মা তো চিরদিন থাকে না কারো। তুই আমিও থাকবো না। খামোখা এ-সব ভেবে মন-মেজাজ খারাপ করিস নে।

কোলার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা একটুও স্পর্শ করতে পারেনি তার অন্তর। লোকটা জ্ঞানবাবুর সঙ্গে সব সময় থেকে থেকে বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। লম্বা লম্বা বুলি আওড়ায়। ভাওনাথ শুক্‌নো গলায় জবাব দেয়—লে, ও-সব বাদ ছোড়দে।

কোলা খুশি হয়নি ভাওনাথের কথা শুনে। ওর কথাগুলোতে কেমন যেন সুঁচের ফোঁড় আছে। এভাব তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে ভাওনাথ লক্ষ্য করেছে তা।

বাপ মা মারা যাওয়ার পর এই দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে একদিনও নিরঞ্জনবাবুর বাসায় যায়নি সে। এরমধ্যে বিয়েথা করেছেন তিনি, তাঁর স্ত্রীও বাগানেই আছেন। এ-সমস্ত খবরই রাখে ভাওনাথ। অনেকদিন রাস্তাঘাটে, অফিসে তলব ঝোকতে গিয়ে দেখা হয়েছে। অফিসে যখন দেখা হয়েছে একটি কথাও বলেননি তিনি শুধু একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠতো তাঁর চোখেমুখে। বেদনা, সহানুভূতিমাখা সে হাসি। আর রাস্তাঘাটে দেখা হলে অনেকভাবে বুঝিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্ত বলেছেন বারবার। অল্প হেসে [illegible], বাবুয়ানীকে দেখে আসিস একদিন।

নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হলে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়ে সে, চোখ ভরে জল আসে। মনটা যেন কি বলতে চায় অথচ অনর্গল কথার

ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা মনের মধ্যেই হারিয়ে যায় আবার। বেদনা, লজ্জা ও সংকোচে মাথাটা নুয়ে পড়ে। যিনি এত স্নেহ করেন তাকে, বিপদে সাহায্য ও উপদেশ দিয়ে থাকেন আজ সে ভুলতে বসেছে তাঁকে। বিয়ে করেছেন নিরঞ্জনবাবু। তাঁর স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারেনি সে একি কম আপসোসের কথা তার? তিনি রুকমিনকে দিয়েছিলেন, একটা দামী শাড়ি, ব্লাউজ আরো অনেক প্রশাধনের জিনিসপত্তর। যার মুখ কোনদিন দেখেনি রুকমিন। কচি কচুপাতার রঙের শাড়ি আর ব্লাউজে কী সুন্দর মানাতো তাকে। এ-সব কথা আর ভাবতে পারে না সে, মনের পাড় ভেঙ্গে চোখের জল নামে। ঘৃণা হয় নিজের ওপর। অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ বলে মনে করে। মনে মনে সঙ্কল্প করে, আজ কি কালই তাঁর বাড়িতে যাবে। তারপর নরম গলায় বলে, যাবু। পরক্ষণেই নিরঞ্জনবাবু চোখের আড়াল হতেই ভুলে যায় সে-সব, অন্য রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে তখন।

আজ দু'দিন আগে বড় সড়কের ওপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আবার। এবারে দৃঢ়তা অবলম্বন করে ভাওনাথ। দু'চারটে কথা হওয়ার পরই বাড়ি চলে যান নিরঞ্জনবাবু। সেই থেকে এক পা এগোয় আর এক পা পিছোয় করে করে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে। তারপর এক ফাঁকে চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে গিয়ে হাজির হয় নিরঞ্জনবাবুর বাড়ি। একটা কথা নেই মুখে, যেন কত অপরাধ করেছে সে। একটা জড়পদার্থের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

নিরঞ্জনবাবু বসতে বলেন তাকে। তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনেন ভেতর বাড়ি থেকে।

নিরঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রী এলেন। ভাওনাথ তখনও দাঁড়িয়ে। তিনি আবার বললেন, বোস্ না বেঞ্চটাতে।

বেঞ্চটাতে বসে ভাওনাথ। কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে না। বি·ঢ়ের মত বসেছিল। অনেক কথা আসছে মনে কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারছে না একটা কথাও শেষে জড়তা কাটে বাবুয়ানীর কথায়। তিনি বললেন, তোমার বাবুর কাছে অনেক শুনেছি

তোমার কথা। অনেকদিন দেখার ইচ্ছে হয়েছে, আজ তোমাকে দেখে সত্যি বড় ভাল লাগছে আমার। ভাওনাথ নতমুখে নির্বাক ছিল এতে তাঁর ধারণা হয় তাঁর কথা বুঝতে পারেনি সে। তিনি বললেন আমি হিন্দী জানিনে ভাই।

এতক্ষণে কথা বলে ভাওনাথ। বুঝতে পেরেছি সব বলে আসন ছেড়ে দাঁড়ায় সে।

বাবুয়ানী বললেন, উঠলে কেন, বসো।

নিরঞ্জনবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে মুখ করে বললেন, একটু চা কর না ছন্দা।

এবারে মুখ উঁচু করে ভাওনাথ। ছন্দার দিকে তাকায়। কী স্নেহার্দ্র চোখ, যেমন ছন্দ তেমনি ঝংকার কথাতে। কী মিষ্টি, দরদ, মায়া মমতা স্নেহজড়িত কথা। তাঁকে অন্যান্য বাড়ির বাবুয়ানীর সঙ্গে তুলনা করতে যেন লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করে সে। কথা বলা তো দূরের কথা মুখ বেকিয়ে নাক সিটকিয়ে চলে যান তাঁরা।

ছন্দা রান্নাঘরমুখো পা বাড়াল।

নিরঞ্জনবাবু একটা সিগারেট ভাওনাথকে দিয়ে আর একটিতে আগুন ধরিয়ে টানতে থাকেন। কি যেন ভাবছিলেন তিনি, তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠে তার অস্পষ্ট কতকগুলো রেখা। অল্পক্ষণ চুপ থেকে বলতে শুরু করেন তিনি—জানো ভাওনাথ, মানুষমাত্রকেই মরতে হবে একদিন আগে চাই পরে। মৃত্যু অনিবার্য। এর হাত থেকে কেউ কোনদিন রেহাই পায়নি, পাবেও না। জানি, তোমার মা বাবার মৃত্যুতে খুব আঘাত পেয়েছ তুমি। কিন্তু তুমি যখন সত্যান্বেষী, অপরের দুঃখ বেদনা নিজের মনেপ্রাণে অনুভব কর তখন দৃঢ় হতে হবে তোমাকে যাতে এ-সব সাধারণ প্রতিক্রিয়ার অনেক উপরে উঠে যেতে পার, বিশাল বিস্তৃত মহত্তর আলো দিয়ে দুনিয়ার সবাইকে দেখতে পাও। তখন তুমি দেখতে পাবে তোমার বাপমা তোমার মৃত আত্মীয়েরা ও অন্য সকলের মত পৃথিবীর জীব, তারা চলেছে নানা পরিবর্তন আবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তন আবর্তনে মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে যা তাদের কাছে দুঃখকর। এতেই জীবনের

অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু যারা স্থূলকে ছাড়িয়ে উর্ধ্বে গিয়েছে তারা জানে যে অন্তরাত্মার ক্রমোন্নতির পথে যা কিছু ঘটে তার অর্থ আছে, প্রয়োজন আছে। এই সময়ের বাধাবিপত্তি আপদবিপদ মনের কাছে বিপরীত বলে মনে হলেও তা কিন্তু তার কল্যাণের জন্যই ঘটে। তোমার বাপমা মারা গেছেন—এ মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ভগবানের বিধান বলে মেনে নেও একে। জানো, আত্মার মৃত্যু হয় না। এ একটা পট পরিবর্তন মাত্র, এক ছেড়ে অন্যরূপ ধরা।

তন্ময় হয়ে সব শোনে ভাওনাথ। চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। দু'চার ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে। পরণের কাপড়টার কোঁচা দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলে—আমি যে কিছুই করতে পারিনি তাদের জন্যে এই আমার দুঃখ। আর যাঁদের জন্যে প্রাণ দিয়েছে তারাই বা কি করেছেন? তাঁরা ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারতেন।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, তাই বলে পথে পথে ঘুরে বেড়ালে আর দুঃখ করলে কি দুঃখ ঘুচবে তাদের? দুঃখ যাতে ঘোচে তার ব্যবস্থা কর। তারা তো এ মাটিতে আসবেন আবার।

এরমাঝে ছন্দা এসে দাঁড়ান তাদের মধ্যে। দু'জনেই নীরব তখন। তিনি হেসে বললেন, কথা ফুরিয়েছে তোমাদের? একটা কথা জিগ্যেস করবো ভাওনাথকে।

ভাওনাথ বলে, বলুন।

তুমি কি আমার কথা রাখবে?

[illegible]য়হ রাখবো বলে ভাওনাথ। বলুন, কি কথা।

ভাওনাথ [illegible] ছন্দা হয়ত ম[illegible]রদের বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করবেন। ছন্দা ইতস্তত: করছেন, একবার স্বামীর দিকে আবার ভাওনাথের দিকে তাকান। তিনি ভাবছিলেন, যে অন্যায় অনুরোধ তিনি ভাওনাথকে করবেন তা কি রাখতে পারবে সে? আগেই শুনেছেন তিনি তাদের চাকর [illegible]োকরাটির কাছে যে আদিবাসীরা বিয়ে করার পর আর বাবুদের বাড়িতে খায় না, মেয়েছেলের কাপড় জামাও ধোয় না। ভাওনাথ তো বিয়ে করে[illegible]। অনেক ভেবেচি[illegible]

শেষে জিগ্যেস করেন, যদি সামাজিক কোন গোলমাল না হয় তাহলে আজ এখানেই দুটো ভাত খাবে তুমি। আমি রান্না করেছি, মায়ের হাতের রান্না ছেলেতে খেলে মার মনে শান্তি পাবে।

ভাওনাথ বললো, আপত্তি কি আছে এতে। এতো আমার পরম সৌভাগ্য। এই কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ওঁদের চাকর ছেলেটির কথা। সে যে দেখে ফেলবে, কাল সকালেই একটা গণ্ডগোল বেঁধে উঠবে নিশ্চয়।

নিরঞ্জনবাবু ভাওনাথের মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বললেন, ভয় নেই ভাওনাথ। ছোকরাটিকে অনেক আগেই ছুটি দিয়ে দেবে ছন্দা। আর সে তো এখানে খায় না। শুকনো তলব পায়। তবে দু'একদিন কিছু ভালমন্দ তৈরি হলে খেতে বলা হয় তাকে।

ভাওনাথের সমস্ত সংশয় কেটে যায় এবারে। একঝলক হাসি খেলে যায় তার চোখে মুখে। জীবনটাকে আবার যেন নতুন করে দেখতে পায় সে। সমস্ত দুনিয়াটার রূপ বদলে গেছে।

সেদিন বাড়ি ফিরে আর ঘুমুতে পারেনি ভাওনাথ। সারারাত শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে আর নিরঞ্জনবাবুর কথাগুলোর জাবর কেটেছে। মনটা সঙ্কল্প ও দৃঢ়তায় সতেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে আবার। সূর্য উঠছে পুবদিকে। তার সোনালী আভা এসে পড়েছে চা শিরীষ গাছে, মজুরদের ঘরে, আঙিনায়। পাহাড়টা হাসছে। চা শিরীষের গাছগুলোও। চায়ের ফুল ফুটেছে। হলুদ রঙের দাগকাটা সাদা ফুলগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে। তার নিজের ঘরটির রূপ বদলে গেছে। সেই লতাপাতা খড়কুটো দিয়ে তৈরি কুঁড়ে ঘর আর নেই, পাকা ঘরে বিদ্যুতের আলো ঝলমল করছে। একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। তার মা নাতনীকে আদর করছে আর তার নিকটেই একটা বেঞ্চে বসে আরাম করে সিগারেট ফুকছে তার বাবা। অনেক দূরের রাস্তা হেঁটে এসেছে ওরা, খুবই পরিশ্রান্ত বলে মনে হলো তবু তাদের চোখেমুখে একটা পরম পরিতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বাবা সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে হেসে বললো, এ-মাটির মায়া ছাড়তে পারে না কেউ। জানিস, আশা, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি যাদের এক করেছে একবার তারা কি দূরে সরে ছাড়াছাড়ি থাকতে পারে আর? ভাওনাথ জাগ্রত তবু স্বপ্নের মত দেখতে পাচ্ছে সব। এই তন্ময়তার ঘোর কাটে রুকমিনের কথায়। রুকমিন গালাগালি করছে সুকুরমণিকে, এতনা বড়কা ভেলেক তব্‌ভি আব্‌ বিস্তানামে পেরসাব করোথিস্‌। একটা চড়ও মারে তাকে। সুকুরমণি কেঁদে ওঠে। ওকে একদিকে ঠেলে দিয়ে ভিজে বোরাটা বদলি করে দেয় রুকমিন। কোঁস কোঁস করে কাঁদতেই থাকে সুকুরমনি। ভাওনাথ উঠে কোলে নেয় তাকে।

রুকমিন বলে, ওতনা আহালাদ না দেবে। বলেই একটা হেঁচকা টান মেরে ছিনিয়ে নেয় তাকে। আরো জোরে কাঁদতে

থাকে সুকুরমনি। তারপর কাঁদতে কাঁদতে এককাঁকে ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

রুকমিনের মেজাজটা সম্প্রতি কেমন যেন রুক্ষ হয়েছে। কথায় কথায় চটে ওঠে সে। এর কারণ জানে ভাওনাথ। হবেই না বা কেন? না হওয়াটাই আশ্চর্য। একা একা ঘরে বসে থাকা, একটা লোক নেই যে কথা কয় তার সঙ্গে। ভাওনাথ তো সমস্ত সময়ই বাইরে বাইরে থাকে, সংসারের সমস্ত ঝামেলাই পোহাতে হয় তাকে। একে মেয়েছেলে তার ওপর বয়সটাই বা এমন কি হয়েছে? এই তো বাইশ বছরে পা দিয়েছে। করুণা উথলে ওঠে। ভাঙা মনটাকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করে সে। এ কি করছে? সংসারটাকে যে আরো বিষময় করে তুলছে। বাপ মা দু'জনেই মারা গেছে এরপর যদি আবার রুকমিনের মাথা খারাপ হয় তাহলে কোথায় দাঁড়াবে সে? সুকুরমনিকেই বা দেখবে কে? রুকমিন ও তাকে নিয়ে সেও যে পাগল হয়ে যাবে।

এদিকে ভোরের সিটি বাজে গুদোমের। কাজে যাওয়ার তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে সারা বাগানের মজুরদের ঘরে ঘরে। চারপাশের বাড়ির লোকগুলোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বাসনপত্তরের ঝন্‌ঝন্‌ ঝুন্‌ঝুন্‌ আওয়াজ ভেসে আসছে। লোকগুলো খাওয়া দাওয়া করছে। রুকমিন তখনও শুয়ে। আজকাল রাতে ভাল ঘুম হয় না তার প্রথম দিকে তো এপাশ ওপাশ করে কাটায় তারপর শেষ রাতে নেশাখোরের মত চোখ বুজে ঝিমোয়। ভাওনাথের মনে হয় ডেকে তোলে তাকে কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে, আহা বেচারা, কতকাল ঘুমোয়না, একটু ঘুমোক। দু'একটা হাইতুলে মোড়ামুড়ি ছেড়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় ভাওনাথ। ঘরের এককোনে একটা খড়ের মোড়ার ওপর বসানো মেটে লাল ঘইলাটা তুলে নিয়ে জল আনতে যায় কল থেকে। তখনো ঘুমুচ্ছে রুকমিন। সুকুরমনি তার পাশে শুয়ে চোখ দু'টো মিটমিট করছে। রুকমিনের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে ভাওনাথ। মায়া, করুণা ও দাক্ষিণ্যে ভরে ওঠে মনটা। অনেক ছেঁড়াকাটা টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি জাগে। সারা উঠোনটা রোদে ভরে গেছে। লোক গমগম করছে

রাস্তাঘাটে। কাজে যাচ্ছে তারা। গাড়ির ভয়সা দুটো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে, গদের আঠার মত সাদা ফেনা জমেছে মুখের দুধারে আর লেজ নেড়ে মশা মাছি ডাঁশ তাড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। চাবুক মারার মত শপ্‌শপ্‌ শব্দ হচ্ছে তাতে। সেই শব্দে স্বপ্নাভিভুত লোকের মত ধড়মড়িয়ে ওঠে রুকমিন। তখনো তার দিকে অপলক চেয়ে রয়েছে ভাওনাথ। রুকমিনের চোখেমুখে ভোরের আলোর রশ্মি ঝলমল করছে। রুকমিন অবাক হয় ভাওনাথকে এমনি করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। মুখখানা কাচুমাচু করে বলে, ভের বেলা ভেলেক, কালে নেই বোলালেক? ঘইলাটির দিকে তাকায়। কলসীর গা ভিজে, একটু একটু জল চোয়াচ্ছে তা দিয়ে। আচর্য লাগে রুকমিনের কাছে। জল এনেছে ভাওনাথ। এমন তো করেনা অনেকদিন। এই পুরো তিন বছর হলো বাপমা মরার পর আর কোন কাজেই হাত দেয়না সে। কাজে যাওয়ার জন্যও কোন তৎপরতা নেই, শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবে। কি ভাবে সেই জানে। কাজে যাওয়ার জন্য ডেকে ডেকে হয়রাণ হতে হয় তাকে আর আজ সেই ঘুম থেকে উঠেছে আগে, জল এনেছে প্যাচ্‌ থেকে।

ভাওনাথ হেসে বলে, কা দেখোথিস্? চিয়াপানি লে আব্‌।

রুকমিন উঠে দাঁড়ায়। সুকুমনি তখনো শুয়ে শুয়ে একবার মার দিকে আবার বাপের দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছে। তাকে উঠতে বলে চাপানি আনতে যায় সে। হাত নাড়াচাড়া করাতে কাচের চুড়িগুলো ঝুনঝুন করে বাজতে থাকে, কানের রূপোর ঝুমকো জোড়া দোল খায়। এই ঝুমকো জোড়া তাকে উপহার দিয়েছিল বিলাসী বদ্ধনি মরার পর যে-দিন তার 'মাইয়া' বলে স্বীকৃতি জানায় তাকে। হাতের রূপোর ঢেউখেলানো চওড়া চুড়ি দুটো আগে হাতের সঙ্গে এক হয়ে লেগে থাকত আজকাল নড়াচড়া করে বেড়ায় সে দুটো। বড় রোগা হয়ে গেছে রুকমিন। তবু ভাওনাথের খুব ভাল লাগছে তাকে। সেই রুকমিন আজ নেই সত্য তথাপি তার এই রুগ্ন চেহারা মুহূর্তের মধ্যে যেন শান্ত ও কমনীয় হয়ে উঠেছে আগের মত। মনে পড়ে গুদোমের কাজ করার সেই চকিত ক্ষণগুলো।

রুকমিন হাসে। একটা খুশীর হাসি, অমাবস্যার মধ্যরাত্রের তারার অম্লান হাসি। হাসতে হাসতে অ[illegible]রের সুরে বলে, আজ কামমে না যাবু।

রুকমিন তাকিয়ে থাকে ভাওনাথের দিকে। হাঁ, না কিছুই বলছে না সে। দু'জনেই নীরব থাকে অল্পক্ষণ তারপর ভাওনাথ নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে যা যা ঘটেছিল সমস্তই বলে তাকে।

রুকমিন বলে, সাচ্চা, তোকের বহুৎ পছিন করথে বাবুঠো।

ভাওনাথ আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ একটা ভয়সার লেজের বাড়ির শপ্‌শপ্‌ শব্দ শুনতে পায় কানে। মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয় তার। বলে, মোকের কামমে জরুর যানে আছে। চার নম্বর চোপলে সমস্ত গাছের পাতাগুলো মশায় চুষে খেয়েছে, সারা চৌপলটা লাল হয়ে গেছে। এক্ষুনি গাড়ি জুতে নিয়ে যেতে হবে গুদোমে। সেখান থেকে গন্ধকপানি চোং‌এ ভরতি করে ঐ চৌপলে নিয়ে যেতে হবে। না গেলে যে চৌকীদার এসে ধরে নিয়ে যাবে অফিসে।

ভাওনাথ আর দেরি করে না। উঠে গিয়ে গাড়ি জুততে সুরু করে। রুকমিন তার অসহায় চোখ দুটো মেলে তার দিকে চেয়ে থাকে।

আড়াইটে তিনটে নাগাদ কাজ করে ঘরে ফেরে ভাওনাথ। গন্ধকজল ছিটোনোর কাজ, নোংরা ও উগ্রগন্ধযুক্ত তাই এ কাজে দুপুরে কোন বিরতি না দিয়ে একটানা হাজরি ডবলি কাজ হয়। রুকমিন তখনো কাজ করছে বাগানে আর তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে সুকুরমণি। বাড়ি ফিরে ঘইলা থেকে এক বাটি জল গলিয়ে খায় ভাওনাথ। ওঠোনে খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কল্কট ধরিয়ে টানতে থাকে। ভয়সা দুটো বাঁধা আছে বাড়ির পাশের একটা মরা টুনি গাছের গোড়াতে। মুখ উঁচু করে শুয়ে ঝিমুচ্ছে তারা। একটা ঘাস নেই যে খেতে দেবে তাদের। এরমধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেছে ভয়সা দুটো। পশ্চিমে ঢলেপড়া সূর্যের মত ওদের দেহও যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

সারা বাড়িটা একটা পড়ো বাড়ির মত [illegible], খাঁ খাঁ করছে। দৃষ্টি পড়ে ঘরের পশ্চিম কোণটার দিকে। একটা খড়কুটোও নেই যে কাজ থেকে ফিরে তা দিয়ে রান্নাবান্না করবে রুকমিন। আজ অনেকদিন জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে না সে। রুকমিন কাজ সেরে ঘরে ফেরবার পথে রোজই কিছু না কিছু খড়কুটো, লতাপাতা অথবা চা গাছের কলমকরা ছোট ছোট ডালপালা কুড়িয়ে আনে। রুকমিনের ওপর দিয়ে কম ধকল যাচ্ছে না। এ-সব ভাবতে ভাবতে কাঁচিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভাওনাথ।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, গির্জার সান্ধ্যঘণ্টা বাজছে সেই সময় কতকগুলো ডালপালা মাথায় করে বাড়ি ফেরে রুকমিন। সঙ্গে সুকুরমণি। তার মাথায়ও একবোঝা শুকনো খড়কুটো লতাপাতা।

ভয়সা দুটো ঝিমুচ্ছে। দুজনেই বোঝা দুটো ধপ্ করে মাটিতে ফেলে। সেই শব্দে একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখে তারা। ভয়সা দুটো রয়েছে অথচ ভাওনাথ নেই এ একটা চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে রুকমিনের। মনে ভাবে, হয়ত ঘাস কাটতে গেছে ভয়সা দুটোর জন্যে পরক্ষণেই স্মরণ হয় সে তো এমনি যায় না আজকাল। অনেক বলতে বলতে শেষে যায়। ঘরের চারদিকে তাকায় তারপর দেখতে পায় কাঁচিটা নেই তাহলে নিশ্চয়ই ঘাস কাটতে গেছে সে। খুশির ঢেউ খেলতে থাকে মনে। বিচিত্র রঙের সমাবেশ। ঘরের টুক্‌টাক্ কাজ করতে করতে দু'একটা গানের কলি তুফানের মত ভেসে আসে। গুনগুন করে অস্পষ্ট সুর ভাঁজে তার। অনেক পুরোনো বিস্মৃত-প্রায় গান। রুকমিন বুঝতে পারে না কেমন করে এতদিন পরে এই গানগুলো মনে এলো তার। এরপর ঘইলাটা নিয়ে যখন জল আনতে যাবে তখন দেখতে পায় ভাওনাথ ফিরছে। তার মাথায় একটা ঘাসের বোঝা আর তার ওপরে বড় এক আঁটি গাছের শুকনো ডালপালা। রুকমিন ঘইলাটা উঠোনে রেখে ভাওনাথের মাথার বোঝাটা হাত বাড়িয়ে নামাতে যায়।

ভাওনাথ বললো, তোকার নেই লাখবো।

আবার ঘইলিটা উঠিয়ে নেয় রুকমিন।

ভাওনাথ বলে ওঠে, তোকের [illegible] পড়ি, মোর ঘাওখে।

প্যাচ ইঠান মখে, ছুরনে আহে। যাইক ভের বেলা লাগি, ভোর তানি চাপানি পাকাও ওয়া।

রুকমিন প্রতিবাদ না করে চা তৈরি করতে যায়।

সেদিন সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সারে ওরা। ভাওনাথ সুকুরমণিকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রুকমিন খুঁটিনাটি কাজ সারছে, ভোর না হতেই তো কাজে যাওয়া আবার। তখন আর সময় কোথায়? লাল কেরাসিনের কালো ধোঁয়ার পিদিমটা জলছে পিট্‌পিট্‌ করে তাতে ছোট্ট ঐ ঘরখানি হিমের কুয়াশার মত আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। নাকে আসছে তার উগ্র গন্ধ। ঘরের জিনিসপত্রগুলো অনেকদিন ধরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। ধুলোবালি ভরতি। সেগুলো ঝেড়েমুছে ঠিক করে রুকমিন।

ভাওনাথ বলে, ঢের রাত ভেলেক, লে শোয় যা আব্‌। খুব হয়েছে আজ। বাকিটে কাল করিস।

তের

কয়েক বছর বেশ শান্ত পরিবেশের মধ্যে কেটে যায়। মনের উত্তাপ নেমে স্বাভাবিক হয়েছে। বিলাসীও খুব খুশি। সুকুরমণি বড় হয়েছে এখন। অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদের মত থালি ফাড়ুয়াটি কাঁধে নিয়ে কাজে যায় বাগানে হৈ চৈ করতে করতে। রুকমিনকে সংসারের খুঁটিনাটি কাজে সাহার্য করে, কাজ থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই শুকনো পাতাপুতি, পথেপড়া গাছের ছোট মরা ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে আসে। রুকমিন খুব অসন্তুষ্ট হয় এতে। ভাওনাথও। সকলের সঙ্গেই খুব ভাব তার তবে সখিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গটা সবচেয়ে বেশি। সে প্রতিদিনই সুকুরমণির কাছে আসে, সুকুরমণিও যায়। বেশ মেয়েটা সখিনা। মুখে কথা আর হাসির তুবড়ি খই ফোটার মত কুট্‌কুট্‌ করে ফোটে। সুকুরমণির হাতে কাজ থাকলে হাতে হাতে করে দেয় সেটা।

এরমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে বাগানের। অফিস, গুদোম আরো বড় করা হয়েছে। পাতিওজনের পৃথক ঘর হয়েছে। আগের মত আর পাতিওজন নরমগুদোমের কোনায় কোনায় হয় না আজকাল। এছাড়া হাসপাতাল হয়েছে। পাশকরা ডাক্তার এসেছে কলকাতা থেকে। অস্ত্রপাতি ও ফোড়াকুড়ির জিনিসপত্তর আসে অনেক। মেসিনপত্তর বেড়েছে। আগে যা হাতে করা হতো এখন মেসিনে করা হয় তা। সাহেবদের বাংলার চেহারা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। সন্ধ্যা হলেই লাল নীল সবুজ বাতি জলে। আকাশকে হার মানিয়েছে। তার সমস্ত আভা যেন এসেছে বাংলাটাতে। প্রাঙ্গনে ফুলের বিচিত্র সমাবেশ। সর্বত্রই একটা বাসন্তী গন্ধ। বড়সাহেব আর টমটমে চড়েন না। নতুন মোটর গাড়ি এসেছে। তকতকে ঝকঝকে মোটর গাড়ি। কুচি কুচি পাথর দিয়ে রাস্তা মোড়া হয়েছে। টমটমের ঘোড়াটা বিক্রী করে দিয়েছেন বড়সাহেব। তার চাকা আর কাঠের ফ্রেমটা মালগুদোমের

পিছনে আগাছা কুগাছা ঘাসপাতার মধ্যে অবহেলিতভাবে পড়ে আছে। কোম্পানী কেঁপে উঠছে দিনদিন। প্রত্যেকের ধারণা বাগানের ভোল বদলাবে এবার। সূর্য উদয়ের দিকে চেয়ে দিন গোনে মজুররা। তাদের থাকা খাওয়ায়ও উন্নতি হবে। সামনে ভবিষ্যতের স্বর্ণ অরুণিমা। সূর্য উদয় হচ্ছে। তার সমস্ত আভা এসে পড়েছে বাগানের ওপর। ঘর বাড়িগুলোর চেহারা বদলে গেছে। লোকগুলোরও। বেশ গোলগাল, পুর্ণস্বাস্থ। কালো মিশমিশে আদিবাসী লোকগুলোকে বেশ দেখায়। নেপালী ভুটিয়া লোকগুলোর রঙ আরো ফর্সা হয়েছে, মেয়েদের চোয়ালে গোলাপ ফুটেছে, ঠোঁটে আবির রঙ লেগেছে।

প্রথম প্রথম কোন রুগী হাসপাতালে যেতে রাজী হয়নি। সবাই বলতো, সাতজাতের ছোঁওয়ামেলা খেয়ে জাত যাবে। এরপর সাহেব বাবু মিলে অনেক করে বোঝায় সর্দার, কামদারী ও চাপরাসীদের। ওরা বোঝায় মজুরদের। এই করে করে শেষে দু'একটা রুগী আসে। এরমধ্যে হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে একদিন। হাসপাতালে মারা যায় অন্তরে সারকি। খুব জ্বর হয়েছিল তার, সেই সঙ্গে মাথাধরা আর গা বমি বমি করা। পেটে মোচড় দিয়ে উঠতো, সমস্ত দেহ শক্ত হয়ে যেতো, ওয়াক টানতো সমানে অথচ বমি হতো না। কেঁপে কেঁপে ঘেমে যায় যায় হয়। নতুন ডাক্তার ডুস দেয় তারপরই মারা যায় সে। কথাটা ঝড়ো হাওয়ার মত রটে যায় বাগানে। মজুররা অন্তরের মরার উত্তাপ অনুভব করে তাদের গায়ে। সব জায়গাতেই ঐ এক কথা, ওনে গাড়মে পানি দেওথে মোকের মারনেকো অস্তে। হাসপাতালমে না যাবু কই। রাস্তাঘাট, বাজার বাগানে তো ফিসফিস করে এই আলোচনা হতোই এছাড়া সন্ধ্যা হতেই ঘরে ঘরে বৈঠক বসতো, দল পাকাতো প্রতিদিন। অনেকে ঠিক করে ভেগে যাবে বাগান থেকে। সাহেবের কানে যায় সে-সব কথা। আবার শুরু হয় বোঝাবার পালা। সর্দার, কামদারী, চাপরাসীকে ডেকে পাঠান বড়সাহেব। সাহেব বাবু সকলে মিলে লম্বা চওড়া অনেক বক্তৃতা দেন কিন্তু

কোন ফল হয় না এতে। শেষে বড়সাহেব বললেন—ঠিক হায়, হাসপাতালমে কইকো যানে নেই হোগা, জিস্কো দিল হোগা ও যায়েগা।

এরপর অনেকদিন হাসপাতালে রোগী আসেনি আর। খালি পড়ে থাকে বেড্‌গুলো। বড় সাহেব হাল ছাড়েননি তখনো। সুযোগ সুবিধা পেলেই ডাক্তারকে লাইনে লাইনে পাঠিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সাহেব, বাবু, সর্দার, কামদারী, চাপরাসীও বোঝাতে সুরু করেছে আবার। কিছুদিন বাদে দু'একটা করে রোগী আসতে থাকে আবার। অন্তরে সারকির কথা সময়ে সময়ে অনেকেরই মনে পড়ে বিশেষ করে যখন হাসপাতালের নিকট দিয়ে বাগানে কাজে যায় তারা। এগারো বারো মাস তো অনেকের মুখেই শোনা যেত যে অন্তরে ভুত হয়েছে। হাসপাতালেই থাকে সে। মাঝে মাঝে হাসপাতালের কাছেকার শেওড়া গাছটার ঘন পাতার মধ্যে কি একটা ঝাপসা ঝাপসা দেখা যায়। গা ঝিম ঝিম করে ভয়ে তাই ঐ পথ দিয়ে চলবার সময় মুখ নিচু করে চলে অনেকে। রাত হলে তো কথাই নাই, ওপথ মাড়ায় না কেউ। এই সব সংস্কার ভাঙতে অনেক চেষ্টা করে ভাওনাথ, অনেকভাবে বুঝিয়েছে মজুরদের। কিন্তু তার কথা কান পেতে শোনেনা কেউ। ওরা অনেক রকম অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায় তাকে আবার কেউ মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। তবু ও নিরাশ হয়নি ভাওনাথ।

সংস্কারের ওপর হাত দেওয়া যে কত ঝকমারি তা আগেও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে সে তবু তার মন সায় দেয় না এ-সব মেনে নিতে। তার মনে হয় সমাজের অনেক ক্ষতি হচ্ছে এতে তাই সময় এলে চুপ করে থাকতে পারেনা সে। এবারেও মর্মে মর্মে এর বিপদ, লাঞ্ছনা অনুভব করে।

কয়েকদিন উপর্যুপরি কয় পশলা জুৎসই বৃষ্টি আর রোদ হওয়াতে বাগানটা সবুজ হয়ে ওঠে। গাছ ভরতি পাতি, টিপে শেষ করতে পারছেনা মজুররা সাঁওতালি বস্তি থেকে চাষীদের আনা হয়েছে পাতি টিপতে। দশটা ও বারোটায় দু'বার পাতি ওজন হয় বাগানে।

ঐ দু'বারে পাতিগুলোই ভয়সাগাড়ী করে আনা হয় গুদোমে। ভাওনাথকেও গাড়িতে পাতি বয়ে আনতে হয়।

বাগানের বড় সড়কটার দু'ধারে চল্লিশ বিয়াল্লিশটি গরু ভয়সার গাড়ি। এর একটু দূরে একটা মস্ত বড় চিলোনি গাছে ঠেস দেওয়া একটা সাইকেল।

পাতিওজন সুরু হয়নি তখনো। গাড়িম্যানেরা গল্পগুজব করছে বসে বসে। ভাওনাথও সেখানে। কারো কোন কথার মধ্যে নেই সে। দূরদিগন্ত পানে চেয়ে সুদূরের অনেক ছবি দেখছে, আঁকছে আবার মুছে ফেলছে। কালো ধোঁয়া আর গরম বাতাস এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার চোখেমুখে মনে। অস্থির অশান্ত মন। বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা নয়, বর্ষার মেঘলাদিনের ফড়িংএর মত চঞ্চলতা। এ ক্ষেত থেকে সে ক্ষেত, এ গাছ থেকে ও গাছ, এ পাতা থেকে সে পাতা করে ঘুরছে। পাহাড়ী পথ, মসৃণ নয়, পায়ে পায়ে বাঁক। কোন মতেই এড়িয়ে চলা যায় না একে। মানুষগুলোও যেন কেমন, ওপরটাতে বেশ সোজা, সরস আর ভেতরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্যাঁচের পর প্যাঁচ। আর এরাও যেন কেমন—পাহাড়ের শক্ত পাথরে গা ঘঁষে ঘঁষে দেহের ত্বক গণ্ডারের চামড়ার মত শক্ত বানিয়েছে। বড় বড় পাথর এসে গায়ের ওপর পড়ে তবু ভ্রুক্ষেপ নেই।

বারোটার পাতিওজন আরম্ভ হয়। অনেক মায়েরই পিঠে বাঁধা কাচ্চাবাচ্চা। পিঠের সঙ্গে চাপা থাকতে থাকতে নাক থেবড়ে গেছে তাদের। পা দুটো সরু, টিনটিনে রোগা শুক্‌নো কাঠের মত নিরস, নির্বল। দেহ অসাড়, নিষ্পন্দ, পড়ে পড়ে ঝিমুচ্ছে। কোন সকালে দুটো ভাত কি মাইএর দুধ খাইয়েছে তার সঙ্গে অল্প একটু হাঁড়িয়া। লাল বাগ্‌ড়া চালের পঁচা ভাত তার নেশা পুরোপুরিভাবে ছাড়েনি এখনো; ছাড়ো ছাড়ো করছে তাই মাঝে মাঝে মিট মিট করে তাকাচ্ছে ছেলেগুলো। মায়েরাই বা কি করবে নিতান্ত অসহায় তারা—হাঁড়িয়া না খাওয়ালে যে কাজের সময় বিরক্ত করবে, কাঁদবে, খেতে চাইবে। কাজ যে করতেই হবে, একদিনও কামাই করা চলবে না ওদের। বাড়তি তো কিছু নেই, রোজ আনা রোজ

খাওয়া। রাস্তার ধারে অনেকগুলো রেইন ট্রি। সেগুলো বর্ষার জল পেয়ে নতুন রূপ ধরেছে। পূর্ণ স্বাস্থ, রূপ; কোথাও কোন কার্পণ্যতা নেই। পাতিভরতি টুকরিটা নিকটে রেখে অনেকে এর শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াতে বসে আঁচল দিয়ে দেহের ঘাম মুচছে আর ছেলেকে বুকে ঝাপটে ধরে মাই দিচ্ছে।

হঠাৎ একটা চীৎকারে শিউরে ওঠে সকলে। কা করোথিস্ হারামজাদী লোক। আরো অনেক গোপন, অশ্লীল কথা যা মুখে আনা যায় না। এ ছাড়া অস্থানে চাগাছের লাঠির ছোঁওয়া। এরপর আর দেরি করে না ওরা, নির্বাকে উঠে যায় পাতি ওজনে। ছেলেটা কেঁদে ওঠে, ক্ষিধে ও পিপাসা তখনো মেটেনি তার। দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে আরাম দেয় মা। একটু চুপ করে ছেলেটি, আবার কাঁদে আবার দোল দেয় তাকে।

একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ—কি যেন মাটিতে পড়ে। সকলেরই আকর্ষণ করে তা।

মুহূর্তে মোটাগলার একটা বিকট আওয়াজ ভেসে আসে—ড্যাম ব্লাডি ফুল্ ফকিং। কে কার ভয়সা হায়? সোওয়াইন, প্যারট।

পানীঅলা, কামদারী চাপরাসী মুন্সী সকলেই ছুটে আসে।

রাগে গজগজ করছে সাহেব।

কানাঘুষি শুরু হয়। একজন বললো, ওকার ডামডিম ভেঙ্গলেক জুন।

পোকোয়া ঘাসী জিগ্যেস করে—কে কার আহে?

করমপাল, সেও একজন গাড়িম্যান। এতক্ষণ মুচকে হাসছিল সে। কি জানি মনে মনে খুশি হয়েছিল খুব। তার মুখের হাবভাব দেখে তা বুঝতে পারে ভাওনাথ। মনে পড়ে ঐ করমপালও তাকে মুখ ভেংচি কেটেছিল একদিন যখন হাসপাতালের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়েছিল সে। একটু জোরগলায় বলে ওঠে করমপাল—ভাওনাথকা ভয়সা আহে। এমন বে-আক্কেলে আর কে হবে? বাগানে এসেই ভয়সা দুটোকে ছেড়ে দিয়ে নবাবের মত এসে আরাম করছেন গাছতলায় বসে। আর ছেড়ে দিয়েছিস তো

ভয়সার সাথে সাথে থাকিসনি কেন ? যেমন সাহেবের দালাল হয়েছিলি তেমনি ফল ভোগ কর এখন। ভাওনাথ শুনতে পায় এ-সব কথা। লজ্জামাখা মুখে একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে তার। কেমন বিষণ্ণ, বিপন্ন থরথর ভাব। ভাবে—কোন কোন সেই অতীত যুগে বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করে বিভীষণকে ঘরসন্ধানী বানিয়েছিলেন আর আজও ঘরে ঘরে, সে দেখতে পায়, সেই বিভীষণ জন্ম নিচ্ছে। এরা আবার মানুষ হবে ? সত্যিই তো, অপরাধ করে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা কি সমীচীন ? আর সত্যি বলতে কি—অপরাধ কি সে করেছে ? আর গরু ভয়সার কি এ বোধ আছে ? এ বোধ থাকলে তাদের গরু ভয়সা হয়ে জন্ম নিতে হতো না। একের জন্য অপরের দণ্ড। আর ওরাই বা কি—গরু ভয়সার চেয়ে এমন কি বড় ওরা ? গরু ভয়সা ক্ষতি করেছে এজন্য ক্ষতিপূরণ দেবে কিন্তু এত রাগারাগি কেন ?

অনেক চিন্তা করে শেষে এগিয়ে যায় ভাওনাথ।

বড়সাহেবের হাতে একটা লাঠি। লাঠি না নিয়ে কখনো বাগানে বার হন না তিনি। এক এক সারি চা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জল চলাচলের নালা। পদে পদে নালিতে পড়ে যাওয়ার ভয়। সরু নালি হলে কি হবে, বেশ গভীর। বেটে লোক হলে তো ডুবে যাবে আর যারা লম্বা তাদেরও বুক পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। বর্ষায় মাটি ধ্বসে নালি ভরে যায়, শীতে আবার পুনসংস্কার করা হয় তার। এ ছাড়া বর্ষাতে অনেক সবুজ নরম লতাপাতা সমস্ত নালিগুলোকে ঢেকে থাকে, নালা আছে বলে বোঝা যায় না। মনে হয় একখানা সবুজ ভেলভেট কার্পেট বিছানো রয়েছে। আবার শীতকালে যখন চা গাছগুলো কলম করা হয় তখন সেই কাটা ডালপালাগুলো নালিতে পড়ে ভরতি হয়ে যায় তা। যারা বাগানে কাজ করে সব সময় তাদের ততটা অসুবিধা হয় না কারণ কোথায় কোন নালা আছে তারা জানে তা। সাহেব বাবুরা সব সময় বাগানের মধ্যে ঢোকেন না, কালে ভদ্রে যদি ঢোকেন তাকে নৈসর্গিক দুর্যোগ বলা যেতে পারে।

বড়সাহেব যখনই বাগান কিম্বা অফিসে যান মস্ত বড় ছুটো

বিলেতা কুকুর থাকে তাঁর সঙ্গে। শিকারী কুকুর। তাদের লাল ঘোলাটে চোখের দিকে তাকালেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়। কুকুর দুটো আশপাশের লোকগুলোর দিকে তাকায়, মাঝে মাঝে বড়সাহেবের দিকে। বোঝা যায় [illegible] অপেক্ষা করছে তারা।

এরমধ্যে পাত্তিওজন বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মণ দুর্যোগের আভাসে আতঙ্কিত, চোখে বিস্ময়কর চাঞ্চল্য।

ভাওনাথ বললো, সাব মোকের কসুর আহে, মাফ করবে।

সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে দলমান মুন্সী। সাহেব কিছু বলার আগেই সে তার নেপালী ভাষায় বলে ওঠে—শালা, জানোয়ারকা কোরা শুনহু, বড়সাবকা গোড়মে তেরো মুড় কুটহু।

চারিদিক থেকে অগুণতি গালিগালাজের বাণ ছুটে আসছে। শালা ধাঙড়, বেইমান, বজ্জাত আরো কত কি।

নিমুবাবু অফিসে কাজ করেন। অফিসবাবু। হাজরিবাবু রামতনুও সেখানে দাঁড়িয়ে। ওঁরা পাতি ওজন দিতে এসেছেন বাগানে। তিনি রামতনুবাবুকে চুপেচুপে বললেন—কি জানি, আমাদের বরাতেও কিছু আছে ভাই। শালা, মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে সাহেবের। বিকেলটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়?

বড়সাহেব একটুক্ষণ কি ভেবে লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারেন ভাওনাথের পায়ে। ভাওনাথ বসে পড়ে মাটিতে।

কি জানি, সাহেবের ইংগিত ছিল কিনা এতে, লাঠি দিয়ে বাড়ি মারার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দুটোও ঘেউ ঘেউ করে আক্রমণ করে ভাওনাথকে।

লাঠির ঘা আর কুকুরের কামড়ে কি কম ভুগেছিল সে? পুরো ছ'টি মাস। আগেই বাপ মা হারিয়েছে। সংসারে এখন শুধু স্ত্রী রুকমিন আর সাত বছরের একটি মেয়ে সুকুরমণি। ওরা দু'জনে কিইবা রোজগার করে। দিনে সাড়ে চারআনা। এতে ওদের দুজনেরই খাওয়াপরার সংস্থান হয় না তার আবার রোগীর খাওয়াদাওয়া আর ওষুধপত্তর। ভোগের পাঁচমাসের মধ্যেই ভয়সা, গাড়ি যা ছিল বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ভাওনাথের ইচ্ছা ছিল না গাড়ি ভয়সা বিক্রী করে। রুকমিন বলে, তুমি সেরে উঠলে

এ-রকম অনেক ভয়সা, গাড়ি হবে। আর সাত্যাই তো, এই কয়মাস ঠিকমত খেতে না পেয়ে ভয়সা দুটোর মরার হাল হয়েছে, আর কিছুদিন এমনি চললে হয়ত মরে যাবে ওরা।

অসুখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করে ভাওনাথ। সে এ-বাগানে থাকবে না আর, যে করেই হোক এই নরপশুর কবল থেকে বাঁচতে হবে তাদের। ভুলে যায় গিরিবর্ত্মের দুর্গমতা, বন্যপশুর হিংস্রতা, পার্বত্য নদীর নির্মমতা ভুলে যায় অন্ধকারের মৃত্যু বিভীষিকা।

পায়ের ব্যথা সম্পূর্ণ সারেনি তখনো। শরীরে সামর্থ নেই। অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় পালোয়ানী দেহ একটা শুকনো পাতখড়ির মত হয়েছে।

মেমসাহেব এই খবর পেয়ে বড়সাহেবকে বলেন, বেয়ারার কাছে জানতে পেরেছি, সেই লোকটি নাকি বিছানাতে পড়ে যন্ত্রণায় ধুঁকছে আর উপযুক্ত খাবার না পেয়ে কঙ্কালসার হয়েছে, কবে হয়ত হার্টফেল করবে সে। তুমি তো ওকে সিক হাজরি আর ওর স্ত্রীকে অনায়াসেই নার্সিং হাজরি দিতে পার। কেন, খামোখা অভিশাপ কুড়োচ্ছ ওদের ?

বড়সাহেব বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেন, তুমি এখনো সেই ছোট্ট পপিই আছো ডার্লিং। তোমার মন এখনো নরম, একটুতেই অসম্ভবরকম নুয়ে পড়। ওদের হাড় বড় শক্ত, সহজে মরবার নয়। তারপর ওকে সিক্ হাজরি আর ওর স্ত্রীকে নার্সিং হাজরি দিলে একটা দস্তুর হয়ে যাবে। শেষে ঐ দেখাদেখি প্রত্যেকেই চাইবে। আবার একটু হাসেন বড়সাহেব। বলেন, কমিশনও কমে যাবে এতে।

একটা বাঁশের টুকরো নিপুণভাবে চাঁচেছোলে নেয় ভাওনাথ। আগেই দুটি পুটলি বেঁধেছে রুকমিন। সেই দুটোকে বাঁশের টুকরোটার দুপাশে বাঁধে সে।

সুকুরমণির মনটা মোটেই ভাল নেই তা বুঝতে পারে সখিনা। কিন্তু কি জন্য তা জানে না সে। দুহাতে সুকুরমণির গলা জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করে, তোকের কা ভলেক, জান ঠিক নখে ?

সুকুরমণি কথা বলতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চায় তার দিকে। চোখ দুটো চারপাশে বুলিয়ে নেয় একবার। জোড়া ঠোঁট দুটোর বাঁধন খুলে যায়। কিছু বলবে মনে হয়। শেষে ঝাঁ করে সখিনার গলা জড়িয়ে তার বুকে মুখ লুকোয়।

এ কি তুই কাঁদছিস সুকু? কাঁদিস নে। কি হয়েছে বল না। সখিনার কণ্ঠও রোধ হয়ে আসে।

ওরা দুই বন্ধুতে রাস্তার যে জায়গাতে কথাবার্তা বলছিল সেখান দিয়ে আর একটা রাস্তা কেটে গেছে। ঐ রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলে একটা বড় লামপতির গাছ। সেই লামপতি গাছের তলাতে বসে ওরা খেলা করে রোজ, সুখদুঃখের গল্প করে।

সুকুরমণি বলে, চল ঐ গাছতলায় যাই, একটু খেলা করিগে। খেলা করতে করতে বলে ওঠে সে, এই গাছটিকে কি তুই ভুলতে পারবি কোনদিন?

সখিনা বুঝতে পারে না কেন সুকুরমণি এরকম আবোলতাবোল বকছে। সে বলে, খেলাতে কি জানি মোটেই মন নেই তোর। এক চাল দিতে অন্য চাল দিচ্ছিস?

সুকুরমণি বলে, এই গাছটিও আমাদের বন্ধু। আমরা তিনবন্ধু। আমরা খেলা করি আর গাছটি তা দেখে। পাতায় পাতায় ফিস্‌ফিস্ করে হাওয়ায় হাওয়ায় কথা বলে। আমরা ছাড়াছাড়ি হলেও যদি কখনও এই গাছের নিকটে আসি কতো কথা মনে হবে আমাদের। নয় কি?

সখিনার মুখখানা শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। সে সুকুরমণিকে আবেগভরে জাপটে ধরে বলে, তুই ছাড়াছাড়ির কথা বলছিস কেন সুকু?

সুকুরমণি আর গোপন রাখতে পারছে না মনের কথা। তার চোখেমুখে একটা বলি বলি ভাবের ইংগিত।

এদিকে পাহাড় ডিঙিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। কুয়াশার মত অন্ধকার সমস্ত দিগদিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে।

তোকের মাই বোলাখে বললে সখিনা।

সুকুরমণির চোখে জল। আর চেপে রাখতে পারেনি সে

কাঁদো কাঁদো সুরে বললে, আমরা বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছি আজ রাতে। কে জানে কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে আবার। কাউকে বলিসনে এ-কথা।

আলকাতরার মত নিকষ কালো অন্ধকারে শালবনের রাস্তাগুলো ডুবে গেছে। উপরে গাছের পাতাগুলো ঝিকমিক করছিল এতক্ষণ, এবারে সেখানেও অন্ধকার।

ছোট্ট একটা ঘর। দ্বিতীয় ঘর নেই বাড়িতে। ছাউনি দেওয়াল খড়ের। ছয় ইঞ্চি উঁচু মেটে পোতা। একপাশে বাঁশখড়ের তৈরি একটা খুদে দরজা। মাথা পেটে ঢুকিয়ে ঘরবার করতে হয়। জানালার বালাই নেই, দিনের বেলাতেই অমানিশা।

ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী। মুখোমুখি চেয়ে। দু'জনেরই এক ভাব, এক চিন্তাধারা, এক মন, এক রক্ত। অনেক বনজঙ্গল পার হয়ে তবে মাঝেরডাবরি বাগান। অনেক দূরের পথ। কমপক্ষে চব্বিশ পঁচিশ মাইল হবে। সুকুরমণিকে নিয়ে যত ভাবনা।

এরমধ্যে সুকুরমণি এসে লম্ফটা জ্বালে।

একটুক্ষণ বাদে ভাওনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে রাস্তার দিকে তাকায় তারপর পাড়াপড়শির বাড়িগুলোর দিকে কান পেতে থাকে। রাস্তাতে লোকজন নেই। পাড়াপড়শিদের বাড়িও নিঝুম।

সারা বাড়িটাতে ঝড়ের পরের একটা নিস্তব্ধতা এটা কাটা ওটা ছেঁড়া সর্বত্রই একটা বিত্রস্ত এলোমেলো ভাব।

পুটলি দু'টো সমেত বাঁশের টুকরোটা কাঁধে চাপায় ভাওনাথ। মাদলটা নিয়ে আসে রুকমিন। নীরবে বিষণ্ণ চোখ চারটের পাতা নড়ে। মাদলটাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারে না ওরা। ঐ সঙ্গে তীর ধনুকও নেয়।

সুখনীর বেতের পেটারা থেকে তিন টুকরো শুকনো শিকড় বার করে রুকমিন। তার এক টুকরো ভাওনাথকে দেয় সে। সেটাকে কোমরে বেঁধে নেয় ভাওনাথ। বাকি দুটো থেকে একটা সুকুরমণির মাজার লাল তাগির সঙ্গে বেঁধে দেয় রুকমিন আর অন্যটা

নিজের কোমরে বাঁধে। এ যে কিসের শিকড় তা ওরা জানে না কেউ। সুখনীও জানতো না। এই শিকড় ক'টি নাকি একটা সাঁওতাল মেয়ে দিয়েছিল তাকে। এটা কোমরে থাকলে নাকি সাপপোকে কাটে না।

যাত্রা শুরু হয়। বনের হিংস্র স্তব্ধতার বুকে রাত্রির ভয়াল জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে বিন্দুমাত্র আলোর চিহ্ন নেই শুধু দু'চারটে জোনাকী জলছে আর নিভছে। তাদের সেই আলোতে চারপাশ ভাল করে দেখে নেয় ভাওনাথ। মনের ত্রাস অল্পমাত্র দুর হয়, দেহে বল পায় খানিকটে। আকাশ দেখা যায় না, বনের গাছপালা তাকে ঢেকে রেখেছে তবু উপরের দিকে তাকায়। অনেক তারা জলছে। সেখানে অন্ধকার নেই, আলো আছে। সেই আলোতে নিচের সবই দেখতে পাচ্ছে আকাশ। উপরের ঐ আকাশ আর এই গভীর অরণ্যই তাদের যাত্রাপথের সাক্ষী রইছে, আর কেউ নেই তাদের।

অন্ধকারে পাথরের বনজঙ্গলের কাঠখড়ির, শাল পানিসাজ, খাঁকড় খয়েরের হোঁচট খেয়ে পড়ে বার বার। পায়ের ছাল উঠে যায়। মরা ঝরা পাতায় ভরতি পথ। সাপ পোকা মাকড়ের নিরাপদ বাসস্থান। পাতার শপ্‌শপ্‌ শব্দে নড়ে চড়ে ওঠে সেগুলো। পায়ে একটা হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করে। চমকে ওঠে। পা ঝাড়ি দিয়ে চলতে থাকে আবার।

বনের বুকচিরে শীতের নিস্তেজ বিশীর্ণ নদী দুরুদুরু কম্পিতবক্ষে বয়ে চলেছে। তার বুকে কুয়াসার বিস্মৃত আস্তরণ। কত জল ঠাওর করা যায় না। অতি সাবধানে পা ফেলে নদী পার হয় তারা। একে বরফগলা ঠাণ্ডা জল তার ওপর বনের কদর্য হিম হাওয়া তাদের সমস্ত দেহে যেন সুঁচ কুঁড়ে কুঁড়ে বরফের কুচি পুরে দিচ্ছে। ঠাণ্ডা বরফজল হয়ে গেছে রক্ত। সমস্ত শরীর বিবর্ণ ফ্যাকাশে।

নির্জন বনপথে চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকায় ভাওনাথ। ঐ কি সেই ঘরবাড়ি? ঐ যে দেখা যাচ্ছে গুদোমঘর, তার আকাশ ছোঁওয়া কালো চিমণি ওগুলো কি সেইসব যার বাঁশী বাজলে

প্রাণে একটা অপূর্ব স্পন্দন দিত, মনে জলতো সোনার প্রদীপ আর উদ্দাম উন্মত্তে পতঙ্গের মত ছুটে যেত ওরা। আর আজ ওগুলোকে মনে হচ্ছে এক একটা কববখানা। এর হিমশীতল হাওয়া লেগে সমস্ত দেহও মন অসাড়, অবশ হয়ে পড়ছে। চারিদিকে শুধু ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপ।

অশ্রু ভার ভার কণ্ঠে জিগ্যেস করে রুকমিন, আমাদের এই যে মর্মান্তিক বেদনা একি এই মাটিকে স্পর্শ করবে না কোনদিন? সকলকেই বুঝি আমাদের মত নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ভীরু কাপুরুষের মত?

ভাওনাথ বলে, সকলকেই চলে যেতে হবে একদিন। যতদিন কাজ ততদিন নাচ।

জানি, সবই বুঝি। কোম্পানী তাদের স্বার্থের জন্যই এই ঘরবাড়ি দেয় তবু যেন কেন মনে আসে এ-কথা।

ভাওনাথ বললো, আমাদের জীবন যে এখানেই শুরু, এর মূল পত্তনটাও যে এই মাটিতে তাই এই মাটির মায়া তার গন্ধ, বাতাস ভুলতে পারিনে কিছুতেই। মানুষ মরে এ কথা সত্য কিন্তু আশারা মরে না। তার বীজ রয়ে যায়, স্বাক্ষর, থাকে মাটিতে। এমন দিন হয়ত একদিন আসবে তখন আমাদের আর এমনি করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে না।

হঠাৎ বিলাসীর কথা মনে পড়ে রুকমিনের। তার কি হবে তার তো আপন বলতে বাগানে রইলো না কেউ। অসুখবিসুখ হলে কে দেখবে তাকে?

রুকমিন অনেকসময় কথা কইছে না দেখে ভাওনাথ জিগ্যেস করে, কা ভাবোথিছ?

রুকমিন জবাব দেয়, মাইকা লাগি দিলঠো ঠিক নেই লাগোথে।

ভাওনাথও গম্ভীর হয়ে পড়ে। এতক্ষণ সত্যিই বিলাসীর কথা মনে পড়েনি তার। সে বললো—ভাগ্যিস, ও বাগানে ছিল না, ভাইয়ের বাড়ি গিয়েছে, তা না হলে তাকে ছেড়ে আসা অসম্ভব হতো।

সুকুরমণি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। তার সারাদেহে বিছুটি

লেগে চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠেছে। চুলকোচ্ছে আর কাঁদছে সে। সান্ত্বনা দেয় রুকমিন। দুঃখের পর সুখ। দিন আসবে আবার, কাঁদিসনে।

ভাওনাথ ও রুকমিনের ভয় যদি কাঁদার শব্দ পেয়ে কেউ এসে ধরে ফেলে তাদের? এতক্ষণে হয়ত খবর পেয়ে ম্যানেজার লোক পাঠিয়েছেন।

এরমধ্যে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে তারা। পথক্লান্ত দেহ অলস, অবশ। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ। ঢলে পড়ে বারেবারে। আবার কেঁদে ওঠে সুকুরমণি। বলে, আউর নেই স্যাকবো মুই।

রুকমিন ম্লান চোখে পুবের দিকে তাকায়। মনটা একটা খুশিতে হেসে ওঠে। সুকুরমণির পানে ফিরে বলে, আউর দেরম নখে মাইয়া। ঐ তো প্রভাতী তারা উঠেছে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

ভাওনাথও আকাশের দিকে চেয়ে দেখে রাত আর কত বাকি। একটা তারা খসে পড়ে আকাশ থেকে। তারাটা মনে হলো বনের মধ্যে এসেই পড়েছে। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে ভাওনাথের। হঠাৎ সরষে ফুলের গন্ধ পায় নাকে। এই ঘনবনের মধ্যে সরষে এলো কোথা থেকে তাহলে নিশ্চয়ই লোকালয়ের অতি নিকটে এসে পড়েছে ওরা। মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। কাছেই মাঝেরডাবরি বাগান। সোমরা থাকে সেখানে। সে দূর আত্মীয় ওদের। ভাওনাথের মামার শালা। এ পনর ষোল বছর আগের কথা। সে দেশে থাকতো তখন। তার মামার সঙ্গে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যেত। ভাওনাথও দু'চার বার ওদের বাড়িতে গিয়েছে। জানাচেনা ভালোই আছে তবে অনেকদিনের অদর্শন।

এদিকে ভোর হয়েছে। পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। তখনও আবছা আঁধার দূরের কিছুই দেখা যায় না সুস্পষ্ট। রাস্তার ধারে লোকের ভিড়। ক্যাঁচ ক্যাঁচ খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজ আর লোকগুলোর গুঞ্জন শুনতে পায় ওরা। ওদের বুঝতে দেরি হয় না ওটা টিউব অয়েলের শব্দ আর ঐ লোকগুলো এসেছে জল

নিতে। ওদেরও তো এই একই হাল ছিল দলমালনগরে। একটা লাইনে কেবল মাত্র একটা জলের কল। তা থেকে জল নেয় কমপক্ষে একশো পরিবারের লোক। একবার এক ঘইলা জল নিতে আধা ঘণ্টার ফের।

ওরা দেখতে পায় একটু দূরে কলসী কাঁখে একজন স্ত্রীলোক হনহনিয়ে জলের কলের দিকে ছুটে আসছে। ঐ একই পথ। এক্ষুনি ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আতঙ্কে প্রাণ দুরুদুরু কেঁপে ওঠে ওদের। অন্য উপায় নেই। স্ত্রীলোকটি নিকটে এলে নিতান্ত অসহায় চোখে তার পানে চেয়ে ভাওনাথ জিগ্যেস করে, সোমরা দফাদারকা ডেরা কোনে আহে ?

স্ত্রীলোকটি তো অবাক ? অচেনা অজানা এই লোকগুলো কারা ? এর আগে এদের কাউকে তো দেখেনি সে।

এই স্ত্রীলোকটি অন্য কেউ নয়, সোমরার স্ত্রী ডুভন।

এরপর ডুভন ঘরে নিয়ে আসে ওদের।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচে ভাওনাথ। কারো সঙ্গে পথে দেখা হয়নি আর কাউকে জিগ্যেস করতে ও হয়নি কিছু। তা না হলে হয়ত এতক্ষণের মধ্যে বাগানের চৌকীদার এসে হাজির হতো।

সেই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন একটা আলো বাতাসহীন বদ্ধ ঘরে আটক থাকা কী দুঃসহ। হাঁফিয়ে ওঠে ওরা। বিকেলে এক ফাঁকে একটু উঠোনে বেরিয়েছিল সুকুরমণি ওরা ওদের সুখদুঃখের গল্প করছিল তাই তার ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া লক্ষ্য করতে পারেনি। রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। সে সুকুরমনিকে দেখতে পায়। একটা কথা বলেনি সুকুরমণির সঙ্গে। একটু হেসে এক দৌড়ে তাদের ঘরে চলে যায়।

মুখখানি কাচুমাচু করে ঘরে আসে সুকুরমনি।

এরমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কর্মক্লান্ত সমস্ত লাইন নিঝুম, ঘরবাড়ি অন্ধকার। মাটির প্রদীপ বা টিনের লম্ফ একটাও জ্বলছে না।

সোমরা ও ডুভন উভয়েই খুব খুশি হয়েছিল ওদের আসাতে। ঘরে দুই ঘইলা হাঁড়িয়া ছিল। ডুভনই তৈরি করেছিল তা। এবারে ব্যবহার হবে তার।

সবাই মিলে বেশ গোল হয়ে বসে ওরা। মাঝখানে একটা হাঁড়িয়ার ঘইলা আর একটা পিতলেবাটি। ঘইলা থেকে সেই পিতলে বাটিটা ভরে হাঁড়িয়া ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করছে ভুভন। নিজেও মাঝে মাঝে পান করছে। একটুক্ষণ বাদেই বেশ জমে ওঠে আসর। প্রাণ রঙীন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও। সোমরা ভাওনাথের মাদলটি টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খুব জোরে জোরে কয়েকটা চাটি মারে।

হঠাৎ একটা গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ শুনতে পায় ওরা—সোমরা, এই সোমরা!

এই ডাকে চমকে ওঠে সোমরা। নেশা ছুটে যায় সেই মুহূর্তে। চোখ দুটো বড় বড় করে কাঁপাগলায় ভয়ে ভয়ে বললো, হাবিলদারজী!

এতনা রাতমে কা হল্লা হোতা সোমরা?

সোমরা কাঁপছে।

ভাওনাথ এগিয়ে যায় তার দিকে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ডর নখে জুন। নিজের জন্য তোমাদের অমঙ্গল ডেকে আনবো না।

এরমধ্যে হাবিলদার পুরণসিং ঘরের মধ্যে ঢোকে। হাতে ছয়ফুটে লম্বা একটা তেলপাকানো বাঁশের লাঠি। তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে জিগ্যেস করে, কোন হায় এ-লোক?

মোকার মইমান আহে হাল্‌দার সাব্। সোমরার স্বর মিনতিমাখা, চোখ দুটো ছলছলে। শুধু আজকার রাতটা আর কাল থাকবে, পরশু ওদের বাগানে চলে যাবে আবার।

হাবিলদার জোরগলায় একটা ধমক দিয়ে বললো, থাম শালা। হামকো গউয়ু মালুম করতা হায়? মইমান হনেছে কাহে এতনা ঝিটিমিটি লিয়কে আয়েগা? বল্ জলদি বল্ কাহা ভাগ যাতা হায়? কোন বাগান থেকে এসেছে এরা?

সোমরার সমস্ত দেহ তখনও ভীরু খরগোসের মত কাঁপছে। কথার উত্তর নেই মুখে।

হাবিলদার তার শক্ত নাগরা জুতোপরা ডান পা'টা দিয়ে একটা ধাক্কা মারে, সোমরা টাল সামলাতে পারেনি, দুম্ করে মাটিতে পড়ে যায়।

হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে ভুভন।

হাবিলদারের সেই যমদুতের মত চেহারা দেখে একটুও ভয় খায়নি ভাওনাথ। তার সমস্ত দেহে একটা আগুনে বিক্ষোপ। চোখ মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে রাগ, ঘৃণা ও ধীক্কার।

রুকমিনের চোখের মণি চঞ্চল। জলের ঢেউ খেলছে তাতে।

ভাওনাথ এগিয়ে আসে হাবিলদারের কাছে। একেবারে সামনে। মুখোমুখি হয়ে নির্ভয়ে বলে, যে শাস্তি হয় আমাকে দেও হাল্‌দার সাব্‌। ওর কোন কসুর নেই।

রুকমিন মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। তার বড় ভয় কি জানি ভাওনাথকেও মারবে এই পাষণ্ডটা। সে মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সুকুরমনি। হল্লাহল্লি শুনে ঘুম থেকে চমকে ওঠে সে। দুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ করে কাঁপতে থাকে।

হাবিলদার রেগেছিল খুব। জলন্ত আগুনের টগবগে জলের মত টগবগিয়ে ওঠে সে কিন্তু হঠাৎ তার উগ্যত যষ্টি আস্তে করে মাথা নুয়ে পড়ে মাটিতে আর রাগত রক্ত চক্ষুর কোণে ভেসে ওঠে •একটা স্নিগ্ধ শান্ত চাওয়া ও পাওয়ার আভাষ। পিপাসাভরা চোখের পলক পড়ছে না তার। রুকিমিনের ফুটন্ত যৌবনের কল্লোল যেন তার প্রাণের স্তরে স্তরে সমুদ্রের ফেনায়িত তরঙ্গের মত বিচিত্র ভঙ্গিতে খেলতে থাকে।

হাবিলদারের ইচ্ছা হয় ওদের এই আসরে সেও মিশে যায়, মদ খায়। এমন অনেকদিন করেছে, মনস্কাম ও সিদ্ধ হয়েছে তার। সোমরাকে জিগ্যেস করে, আউর হাঁড়িয়া হায় ?

সোমরার প্রাণে জল আসে। সে কাঁপতে কাঁপতে শান্তগলায় জবাব দেয়—হায়, খায়েগা ?

আবার সুরু হয় মদখাওয়া।

ঘরের পশ্চিম শেষ প্রান্তে বসে রুকমিন। হাবিলদারের ভাবভঙ্গি আদৌ ভাল লাগেনি তার। কটমটিয়ে দু'একবার এ-কথা সে ইসারা করে জানিয়েছে ভাওনাথকে।

বেশ মাতন লেগেছে আসরে।

একটু একটু করে সরে আসে হাবিলদার। রুকমিনও সরে। একবার ঝাঁ করে রুকমিনের গায়ের ওপর ঢলে পড়ে সে। রুকমিন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

ভাওনাথ মাতেনি তেমন। রুকমিনের ইসারায় গা ঝাঁড়ি দিয়ে ওঠে। সিংহবিক্রমে আক্রমন করে হাবিলদারকে।

হাবিলদার তো অবাক। জীবনে কোনদিন কোন কুলির এ-রকম সাহস ও শক্তির পরিচয় পায়নি সে। রাগে গজগজ করতে করতে স্থানত্যাগ করে হাবিলদার। একটা নিস্তব্ধ মুহূর্তে। সকলেই স্ব স্ব ভাগ্যগণণায় ব্যস্ত।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটা নক্ষত্রপাত হয়। আতকে ওঠে সবাই। লণ্ঠন হাতে কে যেন আসছে। নিশ্চয়ই লোহরা, অনুমান করে সোমরা।

কাছে এলে দেখতে পায় সত্যিই লোহরা। সে তার কালো তেল কুঁচকুঁচে দেহটিতে একটা দোল খেলিয়ে বলে, তোকের ডেরামে মুই পাহারা দিবু আব্।

ভাওনাথের কাছে তাদের বাগান ছেড়ে পালাবার কাহিনী আগেই শুনেছে সোমরা।

লোহরা জাতিতে লোহার। তার পর সোমরাদের দেশের লোক। ইচ্ছা হয় নিসঙ্কোচে সব কথা খুলে বলে তাকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনস্থির করে, না, তা হয় না। মাঝখানে থেকে হিতে বিপরীত হবে। সব শিয়ালের এক ডাক। এতে কোন লাভ হবে না তার বরং লোহরার হয়ত পদোন্নতি হবে অথবা বকশিস্ পাবে সে।

নিরঞ্জনবাবুর কথাগুলো মনে পড়ে ভাওনাথের। বড়বাবু পিনাকবাবু তাঁকে বলেছিলেন, পেটের দায় বড় দায় নিরঞ্জন। সত্যি, পেটটা নিয়েই যত জ্বালা তাই অনেক সৎ হয় অসৎ।

বাগানের চারিদিকে রক্তচোষা। নিঃসংশয়ে পা ফেলবার উপায় নেই। এক ফাড়া কাটালে মনে হয় বাঁচলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা এসে হাজির হয়। স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দেয় না।

ভাওনাথের মনে হয় নিশ্চয়ই তার জন্ম হয়েছিল শনির দশাতে

তাই তার সারা জীবনটা যেন তেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ নয়। এত লোকজন থাকতেও তার মনে হয় এই পৃথিবীতে একান্তই একা, নিঃসহায় সে। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল আসে। ফুঁক ছেড়ে কাঁদলে পাষাণচাপা বুকটা অনেক হালকা হতো কিন্তু তা পারে কই সে? এই পৃথিবীর সব কিছু যেন তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে চলেছে, একটার পর আর একটা ফ্যাসাদ। ফ্যাসাদের অন্ত নেই। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবসর পায় না সে। বুকটা দপ্‌দপ্‌ করে ওঠে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে।

সকাল আটটা। অফিস প্রাঙ্গন। কৃষ্ণচূড়া গাছটাতে লাল আগুন জ্বলছে। ফুল ভরতি গাছ। লাল ফুলের আভা পড়েছে সারা অফিস প্রাঙ্গন ও অফিস ঘরের দেয়ালগুলোতে। ঘরের মধ্যেও ঢুকেছে জানালা দরজা দিয়ে। কী শীতল ছায়া আর মৃদু শান্ত হিম হাওয়া। গুদোমটা নিঃসাড়ে ঝিমুচ্ছে। কলকব্জা স্থবির, নিমীলিত। অল্প পাতি তাই মলাই শুরু হয়নি তখনো। আয়োজন চলছে, দু'একজন লোক আসছে কাজে।

ভাওনাথের খুব ভাল লাগে এই পরিবেশ। হৈচৈ নেই, নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশ। চুপ করে কি ভাবছিল সে। গাছ থেকে একটা লাল ফুল ঝরে পড়ে তার মাথার ওপর। চমকে ওঠে। নিমিষের মধ্যে ঠাণ্ডা চোখ দু'টো আগুনে রঙে রাঙিয়ে ওঠে তার।

অফিসের বারান্দার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাবিলদার পুরণসিং, আর ঘরের ভেতরে ম্যানেজার টেরিং।

ও কি ম্যানেজারের চোখ দুটো অমন কেন? কার দিকে চেয়ে আছেন তিনি? ভাওনাথের দিকে তো নয়, মনে হয় রুকমিনের দিকে। হয়ত টেরা হবেন সাহেব। সন্দেহ হয়, কই টেরা সাহেব তো নজরে পড়েনি তার কোনদিন। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। মনে মনে খুশি হয় ভাওনাথ।

টেরিং জিগ্যেস করেন—কা, হেঁয়াপর কাম করেগা?

টেরিং যে টেরা নন এবারে তা বুঝতে পারে ভাওনাথ।

কৃত্রিমভাবে তাকিয়েছিলেন রুকমিনের দিকে এবং প্রশ্নও করেছেন তাকে।

রুকমিন কোন জবাব দেয়নি, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

টেরিং হাসতে হাসতে জিগ্যেস করেন আবার, হালকা কাম। হামারা মালী বাড়িমে। তাঁর এ-হাসিতে একটা গোপন আবেদন ফুটে ওঠে।

ভাওনাথ উত্তর দেয়, হামিলোক হেঁয়াপর কাম না করবু।

হাবিলদার নীরব ছিল এতক্ষণ। এবারে বলে ওঠে, বহুৎ ফুটানিঅলা হুজুর।

দুর্বাসার মত লালচোখ করে বললেন টেরিং ফুটানি ভেঙে দিচ্ছি এক্ষুনি।

ম্যানেজারের টেবিলের ওপর একটা চিঠি। সেখানি কি জানি আগেই লিখে রেখেছিলেন টেরিং। সেটা হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেয়ারখানি রাগের মাথায় উঁচু করে এমনিভাবে ছুঁড়ে ফেলেন যে সেটা হাত পা ছেড়ে চিৎ হয়ে পড়ে মেঝেতে। চেয়ারটার একটা পায়ের আঘাত লাগে সাহেবের পায়ে। পা'টি লেংড়িয়ে ড্যাম বলে—লোহরাকে বললেন, যা, আভি এলোককা লে যা দলমাননগরমে। শেষে কি একটু ভেবে বললেন—ওয়েট। এরপর হাবিলদারের দিকে চেয়ে বলেন, ভক্তোবাহাদুর তামাংকেও লোহরার সাথে দিয়ে দেও। লোহরাকে বিশ্বাস কি, মদেসিয়া মদেসিয়াতে নিশ্চয় ভাব আছে, রাস্তায় গিয়ে হয়ত ছেড়ে দিতে পারে। একজন নেপালী সঙ্গে থাকা ভাল।

ভাওনাথ দেখতে পায় অফিস ঘর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে বাবুরা। তাদের কৌতুহলি চোখের পলক নেই।

ক্ষণিক বিদ্যুতের আলোর পর জমাট অন্ধকার। শুধু বিক্ষোপ আর বিদ্রোহ। মনটা একটা আগুনের চুলো। হয় নিজে পুড়বে নতুবা অপরকে পোড়াবে।

দলমাননগরের পথে কিছুদুর যেতেই ওদের দেখা হয় দেওয়াল সিং

ও আরো তিনজন লোকের সঙ্গে। দেওয়াল সিং, চৌ[illegible] আর এই তিনজন দফাদার। এদের সকলকেই চেনে ভাওনাথ। এরা সবাই দলমাননগরে কাজ করে।

বনের বুকের ওপর দিয়ে হিংস্র রাস্তা। বাঘ ভালুকগুলো যেন হা করে চেয়ে আছে। গাছগুলো প্রেতাত্মার হাসি হাসছে হি হি করে। একটু যদি দয়ামায়া থাকে এদের। মুখে বাঁকা ঠোঁটের চাপা হাসি। ঠাট্টা বিদ্রূপাত্মক হাসি, আনন্দেরও অঙ্কুরণ উৎস আছে এতে। মনের খোরাক পেয়েছে, পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়েছে ওদের।

দেওয়ালসিং জিগ্যেস করে, কা কাম থিয়ো ভাগনেকো? কি হয়রানিটা হোলি বলতো। ভোগের তো শেষ হয়নি, কে জানে বাগানে গিয়ে কি বক্‌শিস পাবি আবার?

ভাওনাথের মন চায়না এ-সব কথার উত্তর দিতে, সে ভাবে, তোমাদের মত দালাল থাকতে বকশিস্ না পাওয়াটাই তো আশ্চর্যের কথা। জবাবটা কণ্ঠ পর্যন্ত এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, রুকমিন ও সুকুরমণির কথা ভেবে।

বাগানে আসার পর ভাওনাথ দেখতে পায়, যতটা আশা করেছিল সে ততটা হয়নি শেষ পর্যন্ত। শুধু একটুখানি ধুলোঝাড়া। ধুলোঝাড়া বৈ কি? হাতের লাঠিটার একটা মোলায়েম স্পর্শ মাত্র।

সেদিন ছিল মিসেস মক্কের জন্মদিন। অনেক বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন তাঁদের। সকাল থেকেই বাংলোতে প্রচুর ধুমধাম, নাচ গান হল্লা চলে।

বিকেল বেলা। সূর্য তখন পশ্চিমে ডুবুডুবু। মক্ক অনেকগুলো বন্ধুবান্ধব নিয়ে অফিসে আসেন।

দেওয়ালসিং গিয়ে একটা সেলাম ঠুকে বলে, হুজুর, ভাওনাথদের রাস্তাতেই পেয়েছি আমরা। ওরা গিয়েছিল মাঝেরডাবরি বাগানে। এই বলেই টেরিংএর চিঠিটা এগিয়ে দেয় সে।

গুদোম ও অফিস থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে অনেক লোক।

আরো অনেকে চেয়ে আছে জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে। সকলেই অবাক। মঙ্কের ইতিহাসে এ নাকি একটা বিস্ময়।

মঙ্ক একটু মৃদু হেসে আস্তে করে হাতের লাঠিটা ভাওনাথের গায়ে ছুঁইয়ে বললেন, আউর ঐছা নেই করেগা। কাদিছে কামসে যায়েগা।

আর আর সাহেব মেমগুলো হো হো করে হেসে ওঠেন। মঙ্কও হাসেন একটু।

চৌদ্দ

সুকুরমণি ফিরে এসেছে জানতে পেরে সখিনা এক দৌড়ে ছুটে আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। ছোট লাল টুকটুকে শাড়ির মধ্যে একটা পাকা কলা লুকিয়ে আনে সে। কাজ থেকে ফিরলে তার মা তাকে খেতে দিয়েছিল সেটা। সুকুরমণি এসেছে এ-খবর পেয়ে একা একা কলাটা খেতে মন সরেনি তার। এসেই আস্ত কলাটা সুকুরমণির হাতে দিয়ে বলে, লে-খা।

দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তাদের সাক্ষাৎ যেন আকস্মিক, বহুদিনের পর। কলাটা হাতে নিয়ে সখিনার দিকে চেয়ে থাকে সুকুরমণি। ওদের চোখের সামনে কত অতীত ও ভবিষ্যতের ছবি।

সখিনা আবার বলে, লে-খা।

এতক্ষণ কোন কথা কয়নি সুকুরমণি। এবারে জবাব দেয়, তোয় লে আউর মোকে থোড়া এইছে দে। কলা সমেত হাতটা সখিনার দিকে এগিয়ে ধরে সুকুরমণি।

সখিনা কলাটা নেয়। খোসা ছাড়িয়ে দু'ভাগ করে সেটাকে। ভাগ দুটো সমান নয়। হয়ত এটা তার নিজেরই অভিপ্রায়। বড় ভাগটা সুকুরমণিকে দেয়।

এরপর কলা খেতে খেতে সেই গাছটার ধারে যায় ওরা। গাছটা হাসছে, পাতা নড়ছে। ওরা উভয়ে হাসে—গাছটার ছায়াতে পাশাপাশি বসে গল্প করে। সখিনা বিস্ময়ের চোখে চেয়ে চেয়ে সুকুরমণির কথা শুনছে। অফুরন্ত কথা। বনজঙ্গল, নদীনালার কথা, মাঝেরডাবরি বাগানের কথা। সেখানকার সেই মেয়েটির কথা। শেষে ওদের চমক ভাঙে রুকমিনের ডাকে।

এরমধ্যে দুটো ভাত রান্না করেছে রুকমিন। সুকুরমণি যেতেই ছোট একটা পিতলের বাটিতে চারটে ভাত, খানিকটা নুন আর একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রুকমিন বললো, আব্ খায় লেবে মাইয়া।

সখিনাও এসেছে সুকুরমণির সঙ্গে। একবার সখিনার পানে চায় সে, পরক্ষণেই রুকমিনের দিকে। সখিনা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলে, লে তোয় খা আব্, মোয় ঘর যাবু।

সুকুরমণি তখনো সখিনার দিকে তাকিয়ে আছে। সখিনা বললো, আমি একটু আগে খেয়েছি।

এর কিছুদিন বাদে উত্তরের হিম হাওয়া বইতে থাকে। কাত্তিকের প্রথম। এরমধ্যে বিলাসী তার ঘরে ফিরে এসেছে আবার। ওদের পলায়নের গোটা কাহিনীটা শুনে হেসে বলে, মোকের ছোড়কে কাহা যাব ?

এরপর হঠাৎ সুকুরমণির জ্বর হয় একদিন। কাজ থেকে জ্বর গায়ে ঘরে ফেরে সন্ধ্যায়। সকালে গা মিসমিস করেছিল, বমিও করেছিল একবার। রুকমিনকে বলে, গ্নানঠো ঠিক নেই লাগোথে আজ, কামমে নেই যাবু।

রুকমিন রেগে বলে, কাজে না গেলে খাওয়া আসবে কোথথেকে ?

ভাওনাথের ভাল লাগেনি রুকমিনের কথা। সে বলে—থাক না, কাজে নাইবা গেল আজ—বমি করছে ?

রূঢ়স্বরে রুকমিন বলে, অতো দরদ দেখিয়ে মেয়েটার মাথা খেয় না বলছি। পান্তা ভাত আছে হাঁড়িতে। ঘরের কোণের লঙ্কা গাছ থেকে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দুটো ভাত খেলে বমি সেরে যাবে।

কচি মেয়ে, কিই বা বয়স ওর যে কাজ করে খাবে। ওর তো এখন পুতুল নিয়ে খেলা করবার সময়। জীবনকে ধীক্কার দেয় ভাওনাথ। বাপ হয়ে এই কচি মেয়েটিকে খেতে পরতে দিতে পারে না সে। তার খরচ সে নিজে রোজগার করে। গায়ে খেটে অমানুষিক পরিশ্রম করে পায়ের ঘাম মাথায় তুলে। কয়েক কোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে তার।

পুরো দু'দিনের মধ্যে একবারও জ্বর রেমিশন হয় না সুকুরমণির। কমেওনি একটু, একভাবে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে ভুল বকতে থাকে।

ভাওনাথ রুকমিনকে বলে, ডাক্তারবাবুঠান্ দাবাই লানবু।

রুকমিন প্রতিবাদ করে, ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেই সুকুরমণিকে দাওইখানায় নিয়ে রাখবে। হাসপাতালের কথা তো অজানা নেই তোমার। সেই অন্তরে সারকির কথা। তেমন কি হয়েছিল তার? দু'দিন বাহ্যপ্রস্রাব করেনি, এই তো? এ-রকম তো হামেশাই হয় সকলের তাতে কি মরেছে কেউ? আর তাকে দাওইখানায় নিয়ে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটলো? তারা মানুষটাকে মেরে ফেললো ওরা, পেটের মধ্যে গরম জল সমেত নল চালিয়ে দিয়ে। না, না, তা হবে না, সুকুরমণিকে কিছুতেই যেতে দেব না হাসপাতালে।

রুকমিনের কথার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না ভাওনাথ। আবার অনুযোগ করে বলে, ওকের দাবাইখানামে না ভেজবু, দাবাই লান্‌বু আব্।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমের আকাশটার লাল আভাটুকু অনেক আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। তখন বিক্ষিপ্ত দু'চারটে তারা জলছে মিটমিট করে সেখানে। রাস্তার দুধারের বাসক-গাছগুলোর অন্ধকার ছায়া এসে পড়েছে সমস্ত রাস্তাটার ওপর। বাসকের উগ্র গন্ধ থৈ থৈ করছে। সেই রাস্তা ধরে উগ্র গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ডাক্তারবাবুর বাসায় গিয়ে ওঠে ভাওনাথ। তখন খোলা বারান্দায় বসে আর কয়েকজন বাবুর সঙ্গে তাস খেলছিলেন তিনি। ভাওনাথ দূর থেকেই শুনতে পায়—টু নোট্রাম্পস, থ্রি ডায়মণ্ডস, থ্রি স্পেড্‌স, নো বিড। ফোর স্পেড্‌স।

রমেশবাবুর হাত টেনে ধরেন ডাক্তারবাবু। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ফিস্‌ফিস্ করে বললেন তারপর একটা তাসে আঙুল দিয়ে কি ইসারা করেন।

অশান্ত মন কিছুতেই মানতে চায় না। অনেকবার ডাকতে ডাকতে শেষে জবাব পায় ভাওনাথ—দাঁড়া বাপু, একটু দাঁড়া।

এরপর মিনিট মিনিট করে ঘণ্টা কেটে যায় তবু আসন ছেড়ে ওঠার নাম নেই ডাক্তারবাবুর। অধৈর্য্য হয়ে ওঠে ভাওনাথ।

একটু অপেক্ষাকৃত চড়া গলায় বলে—ডাক্তারবাবু, হামারা লেড়কিকা....।

ডাক্তারবাবু একটা ঝংকার দিয়ে বলে ওঠেন, অসভ্য জানোয়ার কোথাকার, ভুত। ঘোড়ায় চড়ে এসেছিস বুঝি? এই বলে ঘরে ঢুকে একটা পিল এনে ভাওনাথের হাতে দিয়ে বলেন—যা, এইটে খাইয়ে দিস গিয়ে। কাল সকালে হাসপাতালে এসে খবর দিস কেমন থাকে।

ভাওনাথ অবাক হয়, সন্দেহ জাগে মনে, রাগও হয় আবার। একি ব্যাপার—রোগীর কথা শুনলেন না কিছু, পরীক্ষা করলেন না তাকে তবে কেমন করে ওবুধ দিলেন ডাক্তারবাবু। এলোমেলো কি একটু ভেবে কাকুতিমাখা স্বরে জিগ্যেস করে—একবার গিয়ে দেখবেন না ডাক্তারবাবু?

এ-কথায় তেলেবেগুনে জলে ওঠেন ডাক্তার। বলেন—শালা, শুয়োর কোথাকার, আমি বুঝি তোর চোদ্দপুরুষের চাকর যে 'ভু' বললেই কুকুরের মত যখন খুশি দৌড়ে যাবো?

ম্লান মুখে ঘরে ফিরে আসে ভাওনাথ। ডাক্তারবাবুর কথার জবাব সে দিতে জানে, সময় এলে দেবে একদিন। তুমি কুকুর কি মানুষ সে-কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সাহেব ডেকে পাঠান তোমাকে। তখন তো তোমার কাছা এঁটে পরার কথাও মনে থাকে না।

চারদিন কেটে গেল। একদিনের জন্যও জ্বর পড়লো না একটু। ওরা স্বামীস্ত্রী উভয়েই খুব বিচলিত হয়ে ওঠে। সুকুরমণির সেই জল টলটলে নধর চেহারা শুকিয়ে চিপসে মেরে গেছে। তার স্তিমিতপ্রায় বিবর্ণ চোখের দিকে আর তাকাতে পারে না ওরা। [illegible] বলে, হলদিবাড়ির চামরু মতিকে দেখালে হয় একবারটা? সেদিন তো সর্দারের বাড়িতে এসে[illegible]ল তার ছেলের ঝাঁকরি করতে। একদিনে ভাল হয়ে যায় ছেলেটি। চামরুকে আমার খুব বিশ্বাস হয়, ভাল ওঝাঁ।

ভাওনাথ ভাবলে, [illegible] তো বংশগত, জাতিগত সংস্কার ও বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে বৈকি? এই ঝাঁকরি করতে হলেও

বেশ কিছু টাকার দরকার। দক্ষিণা দিতে হবে নাওক, তারপর ধুপধুনা, ফলফলারি, ফুলো, সিঁদুর আরো কত কি? একটা কানাকড়িও নেই ঘরে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে টাকা কর্জের জন্য সর্দারের কাছে ধন্না দেয় সে।

সর্দার একটা কৃত্রিম মুখভঙ্গি করে সমবেদনামাখা সুরে বলে, তাই তো ভাওনাথ, তোর বেটীর বেমারী হয়েছে এতে সাহায্য করা উচিত কিন্তু উপায় নেই যে। জানিস তো সেদিন ছোট বেটাটার অসুখে চাষরু ওঝাকে এনেছিলাম। বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে ঝাঁকরি করতে তারপর আর যা অল্প কিছু হাতে ছিল তা দিয়ে গতকাল একটা গলার হাঁসুলি কিনেছে সর্দারণী।

হাঁসুলির কথা শুনে মুহূর্তে ভাওনাথের ম্লান মুখখানি চকমকিয়ে ওঠে। সত্যিই তো আজ একহপ্তা আগে সুকুরমণির জন্য মাড়োয়াড়ীর দোকান থেকে পায়ের মল কিনেছে সে। এখনও নতুন আছে সেটা। শুধু একবারটা পায়ে দিয়েছিল বাড়িতে। সবসময় পায়ে পরে থাকতে চেয়েছিল সুকুরমণি কিন্তু তা করতে দেয়নি রুকমিন। সে বলেছিল, পুজো সাদিমে পরবে মাইয়া।

মল জোড়া মাড়োয়ারীর দোকানে বন্ধক রেখে পাঁচ টাকা নিয়ে আসে ভাওনাথ। ঝাঁকরি করার উপকরণ কিনতেই খরচ হয়ে যায় চারটাকার কাছাকাছি, হাতে থাকে শুধু একটাকা কয় আনা।

ঝাঁকরি করার পর দু'জনে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। সুকুরমণির অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে এবারে। কাল সকালেই হয়ত দেখতে পাবে যে সুকুরমণি আবার আগের মত বাড়িটাকে জমিয়ে তুলেছে। এ-সব ভুতপ্রেতের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে পিটাতে পিটাতে না তাড়ালে কি ওষুধে যায় এরা।

একটু আলো তারপর আবার মেঘ, ছায়া, অন্ধকার, রাত্রি। দিনেরাতে অবিরত বারিপাত। সূর্যের উদয় অস্ত নেই, সুরের পরিবর্তন নেই। একটানা এক সুরো।

জ্বর কমলো না সুকুরমণির। ডাক্তারবাবুকে আবার একদিন ডেকে আনে ভাওনাথ। তিনি রোগী পরীক্ষা করে রাগতগলায়

বললেন, আগে যে ওবুধটা দিয়েছিলাম তা নিশ্চয়ই খাওয়াসনি, ফেলে দিয়েছিস? এখন যেরকম জটিল হয়েছে তাতে শুধু আমার হাসপাতালের ওবুধে কাজ দেবে না। কিছু ওবুধ কিনে আনতে হবে তোকে। আর নিজে কিছু খরচপত্তর না করলে কি অসুখ সারে?

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ভাওনাথ। তার চোখের জলে জুতো ভিজে যায় ডাক্তারবাবুর। জুতোর ওপর মাথা রেখেই কাঁপা কাঁপা কাঁদো কাঁদো সুরে বলে, আপ্ বাপমাই আছে ডাক্তারবাবু। মেয়েটিকে বাঁচান। পয়সাকড়ি তো কিছু নেই আমার—শুধু আছে দেহ, মন। সারা জীবন এই দেহ আর মন আপনার হুকুমের প্রতীক্ষা করবে। মনের পাতায় আজ থেকেই লিখে রাখছি আপনার দান।

এতেও ডাক্তারবাবুর চোখেমুখে কোন করুণার ছায়াপাত হয়নি।

রুকমিন বললো, হাঁস দুটো আর আটটি ডিম যা ঘরে আছে ডাক্তারবাবুকে তা দিয়ে কাল ওবুধ নিয়ে এস।

ভাওনাথ চমকে ওঠে রুকমিনের কথা শুনে! অসহ্য বেদনা অনুভব করে বুকে। দম আটকে আসে তার। সুকুরমণির অসুখের মধ্যে এই আটটা ডিম দিয়েছে হাঁসটা। আটদিনে আটটা ডিম। সুকুরমণি ডিমের কথা জানে। মুখে কথা সরে না তবু রোজ সকালে রুকমিনকে ডিমের কথা জিগ্যেস করে। ডিমগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। মুখে একঝলক হাসি ফুটে ওঠে। রুকমিন বলে, সব আণ্ডা ঠিকছে রাখ দেবো মুই। অসুখ সারলে তুই খাবি। আর এই হাঁস দুটো কত আদরের সুকুরমণির। নিজে কম খেয়ে ওদের খাইয়েছে সে। এছাড়া তারই রোজগারের পয়সা দিয়ে এই হাঁস দুটো কিনেছে সে।

ভাওনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করে রুকমিন। তার চোখে জল, গলা ভিজে, আর্দ্রস্বরে বলে, কা ভাবোতিস্? পরে কিনে দিও আবার। সামনাসামনি চোখ মেলে তাকাতে পারে না রুকমিন। ঝাঁ করে পিছন ফিরে দাঁড়ায় সে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। হাঁস দুটো আর ডিম আটটি কোচড়

কাপড়ে ঢেকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর বাসায় যায় ভাওনাথ। ডাক্তার গিন্নী তখন তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে ধুপধুনা দিয়ে আঁচলে গলা ঘিরে জোড় হাত করে হরিঠাকুরকে প্রণাম করছিলেন। ভাওনাথের হাতে হাঁস দুটো দেখতে পেয়ে সংক্ষেপে প্রণাম সেরে মৃদু মঞ্জুল হাসিমাখা ঠোঁট দুটো নেড়ে বললেন, ডাক্তারবাবুকা অন্তে লানা হায় ?

ভাওনাথ মাথা নেড়ে বলে, হাঁ।

ডাক্তারগিন্নী হাঁক দিলেন, এই বুধু, এধারমে আও জলদি। এরপর ভাওনাথের দিকে চেয়ে বললেন, পা বাঁধা আছে তো হাঁসের ? রেখে দে ওখানটায়।

ডাক্তারবাবু ঘরের মধ্যে ছিলেন। স্ত্রীর গলা শুনতে পেয়ে বাইরে এসে ভাওনাথকে বলেন, ঠিক হায়, আভি ঘরমে যা। কাল ফজরমে ভেট করেগা হাসপাতালমে, বড়িয়া দাবাই দেয়েগা।

একদিকে যম আর অন্য দিকে মানুষ। এই যমে আর মানুষে লড়াই চলে আরো পাঁচদিন। লড়াইএ যম জেতে, মানুষ হারলো।

ভাওনাথের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। রুকমিনের কি অবস্থা তা দেখার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না তার। তারপর লোকের চেঁচামেচিতে সম্বিৎ ফেরে। চেয়ে দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে রুকমিন। সখিনার মা আর বিলাসী মাথায় জল দিচ্ছে আর হাওয়া করছে। সখিনাও সেখানে দাঁড়িয়ে। সে নির্বাক। চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ছে টপ্‌টপ্‌ করে। চেয়ে আছে সুকুরমণির নিষ্পন্দ দেহ ও বিবর্ণ মুখের দিকে।

দু'হপ্তা পরের কথা। ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছ দিয়েই বাগানে কাজে যাওয়ার রাস্তা। বাড়ির লাগোয়া তার কাঁটা ঘেরা ফল ফুলের বাগান। বেড়ার পাশ দিয়েই জল নিকাশের নালা। নালাটি গিয়ে মিশেছে চা চাষের মধ্যে আর একটা বড় নালাতে। বর্ষাকালে নালাতে সব সময়ই অল্প অল্প জল চিক চিক করে। এতে বাবুদের হাঁস চরে সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ।

সকাল। ভাল করে রোদ ওঠেনি তখনো, ভাওনাথ কাজে যায়। ওর বড় ভাল লাগে ঐ হাঁসগুলো। ছলছল চোখে নালার পানে চায়। একটু হাসি, একটু অলক্ষ্য ক্রন্দন। হাতের কাড়ুয়া, কলমছুরি অথবা পাত্তির টুকরি যা যখন সঙ্গে থাকে সেটা নাবিয়ে হাঁস ধরতে যায় সে। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন কখন হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে। চিঁচিঁ শব্দ করে ছুটে পালায় ওরা। থমকে দাঁড়ায় ভাওনাথ। ভদ্[illegible] চেয়ে থাকে। কখনও বা অজ্ঞাত ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে দু'একটা কথা। বলে, মোকের ঠান্ নেই আবে ? গোসা ভেলেক ?

প্রতিদিনের মত সেদিনও কাজে যাচ্ছে ভাওনাথ। সকাল বেলা। দেখতে পায় কতকগুলো উচ্ছিষ্ট কলার পাতা, মাছের কাঁটা-কুটি, মাংসের হাড়গোড় আর দু'চারটে ঝোলমাখা ভাত। হাঁসগুলো কিলবিল করে ছিঁড়ে তছনছ করছে কলার ঐ পাতাগুলো। দু'চারটে ভাত খাচ্ছে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে। ভাওনাথের মনে একটা কান্নার সুর বেজে ওঠে হঠাৎ। কই, সেই ময়ূরপঙ্খী রঙের পাখাঅলা হাঁস দুটো কোথায় ? ছাড়া পায়নি বুঝি এখনো ? বেলা তো হয়েছে অনেক। মুহূর্তের মধ্যে চোখেমুখে একটা চকিত হাসি খেলে তার। ঐ তো হাঁস দুটো নালার ধারে একপায়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে উর্দ্ধপানে চেয়ে সূর্যদেবের স্তব করছে। এগিয়ে যায় সেদিকে। আবার বিষাদ। না, এতো সেই হাঁস দুটো নয়, এ দুটোর গলায় সাদাকালো ডোরা দাগ নেই।

একটা হা হতাশ মুহূর্ত।

একটু দূরে ডাক্তারবাবুর বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে বুধু। ভাওনাথকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে যায় সে।

বুধু নিকটে যেতেই বেশ চড়া গলায় বলে ওঠে ভাওনাথ—গেড়ে দুগোকা তোয়লোক মরাইকে দেবে। এত বেলা হয়েছে হাঁস দুটোকে ছাড়িসনি এখনো। বাক্সের মধ্যে থেকে কি জানি গুমরে মরছে, চিঁ চিঁ করে কাঁদছে, [illegible]। একটু যদি দয়ামায়া থাকে তোদের ?

অবাক [illegible] ভাওনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাকে বুধু। কি বলে ভাওনাথ, ও কি ক্ষেপেছে ?

ভাওনাথ বুধুকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতে দেখে বলে, সেই বোঝলেক ? হাঁস দুটো কোথায় ? যে দুটো ডাক্তারবাবুকে দিয়েছিলাম আমি।

এবারে বিস্ময় ভাঙে বুধুর। ও, তুই ঐ হাঁস দুটো খুঁজছিস ? তোর হাঁস দুটো কিন্তু খুব ভাল ছিল। বেশ তেলো। অনেকটা মাংস হয়েছিল। কাল ডাক্তারবাবুর জন্মদিনে ঐ দুটো কেটে তাঁর বন্ধুবান্ধবকে খাইয়েছেন।

ভাওনাথের মাথায় যেন বজ্র পড়ে। নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে বুধুর পানে চেয়ে। অল্পক্ষণ বাদে ভয় পাওয়ার মত চমকে ওঠে সে। সমস্ত দেহটা নড়ে ওঠে। দুচোখ ছেপে জল আসে মনের পাড় ভেঙে ভেঙে। এরপর কাজে না গিয়ে সোজা ঘরে ফিরে আসে ভাওনাথ। একটা ঘইলাতে খানিকটে হাঁড়িয়া ছিল, চক্ চক্ করে খেয়ে নেয় সেটা। গত পরশু সুকুরমনির কাজ ছিল। সেই উপলক্ষে চার ঘইলা হাঁড়িয়া এনে জাতভাই ও মইমানদের খাইয়ে দিয়ে এই টুকুই অবশিষ্ট ছিল।

আগেই অন্য দিক দিয়ে কাজে চলে গিয়েছিল রুকমিন। কাজ থেকে ফেরে ঠিক সন্ধ্যায়।

সারাদিন একটানা ঘুমিয়েছে ভাওনাথ। গায়ের ওপর দিয়ে দুপুরের কড় কড়ে রোদ খই ফুটিয়ে গেছে তবু ঘুম ভাঙেনি তার। ভাওনাথকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে রুকমিনের প্রাণটা স্যাঁৎ করে ওঠে। একটার পর আর একটা দশা লেগেই আছে। কপালে আরো কি আছে ভগবান জানেন। অসুখ বিসুখ করেছে কি ভাওনাথের ? গায়ে হাত দেয়। গা ঠাণ্ডা। চোখ বুজেই একটা হাই তোলে ভাওনাথ। হাঁড়িয়ার গন্ধ পায় রুকমিন। বিশ্বাস করতে পারেনা যে হাঁড়িয়া খেয়েছে ভাওনাথ কারণ সে তো অনেকদিন আগেই হাঁড়িয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এই হাঁড়িয়া খাওয়া ছেড়ে দেওয়াতে অনেক বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে তাকে তবু হাঁড়িয়া খায়নি সে। অনেকেই তির্যক হেসে বলতো, ভকত হোলেক ভাওনাথ। যত সব ভণ্ডামী আর কি। কি হয়েছে ওর ? এতদিন বাদে কেন হাঁড়িয়া খেয়েছে সে ? তবে কি মাথা ধরেছে খুব ?

গায়ে ধাক্কা দেয় একটা। ভাওনাথ উঠে বসে। মুখে কথা নেই, রুকমিনের দিকে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে।

অমন করে কাঠের পুতুলের মত ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে চেয়ে আছে কেন ভাওনাথ? রুকমিনের চোখেমুখে বিস্ময় ও ভয়। কথা বলতে গলা কেঁপে ওঠে। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করে, কা ভেলেক?

ঝরঝর করে জল পড়ে ভাওনাথের চোখ দিয়ে। ছেঁড়াকাটা অস্পষ্ট আধো আধো ভাষায় বলে, গেড়ে দু'গো নখে।

পাতালপুরীর এক ঝাঁক হিম হাওয়া বয়ে যায় ওদের ওপর দিয়ে। একটা অস্বাভাবিক বিমূঢ় নীরব মুহূর্ত।

সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ঘরে ফিরে আগেই এক এক মগ চা খায় ওরা। দুধ চিনি থাকে না তাতে। রঙ চা, তার মধ্যে শুধু একটু লবণ আর দু'চারটে গোলমরিচ। সেই লবণ গোলমরিচ দিয়ে তৈরি করা চা খেয়ে সারাদিনের অবসাদক্লিষ্ট দেহ সতেজ ও সবল করে তোলে।

ঝড় বইছে। সমস্ত আকাশে বাতাসে বিষ। গা জ্বালা করছে, সারা দেহে আগুন জ্বলছে। দাঁড়াতে পারেনা রুকমিন। কে যেন ঝাপটা মেরে ফেলে দিচ্ছে তাকে। চা খাওয়া আর হয়না কারো। রাতে বেশি করে ভাত রেঁধে জলে ভিজিয়ে রেখে দেয় সকালের জন্যে, তাই খেয়ে কাজে যাবে বলে। তাও হলো না আর। দুপুরেই বা তেমন কি খায় ওরা? একটা ভুট্টাপোড়া অথবা কতকগুলো ছোলা-কলাই ভাজা। পাত্তি তোলার সময়ে তো ঘরে ফিরতে পারেনা দুপুরে।

সুকুরমণির মৃত্যুতে অসম্ভবরকম মুষড়ে পড়ে রুকমিন। হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে সে। নির্বিকার, আশা আকাঙ্ক্ষা নেই। সুঠাম দেহটা একটা শুকনো বাঁশের কঞ্চির মত নিরস হয়ে গেছে। কাজে কর্মে কোন উৎসাহ বা উচ্ছ্বাস নেই। জড়ভরতের মত বসে বসে কি ভাবে, কোন তাতেই হুঁস নেই। তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার চোখের তারা দুটো কেমন যেন স্তিমিত, উদাস। তার চোখের সামনে কি এক অপার্থিব বস্তু, সে শুধু তাকেই দেখছে খুঁটে খুঁটে। তার দেখা আর ফুরোয় না, কি জানি ফুরোবেও না কোনদিন। ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম সবই করতে হয় ভাওনাথকে। সময় পেলে প্রায়ই বিলাসী এসে রান্নাবান্না করে দেয়। আবার সেই সঙ্গে করে কাজে নিয়ে যায় তাকে। তাগিদ দিয়ে কাজে না নিয়ে গেলে হয়ত কোনদিনই কাজে যেত না সে। মেলাতে গিয়েও হাত সরতো না তার, কাজ সেরে সকলেই ঘরে চলে যেত কিন্তু সে থেকেই যেত সেখানে। কামদারা চাপরাসীরা ধমক দিত। বিলাসী তার নিজের কাজ সেরে এসে রুকমিনের বাকি কাজটুকু করে দিয়ে ঘরে ফিরতো তাকে নিয়ে।

সময় মত কাজে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও বেরুতে পারে না ভাওনাথ। ঘরের কাজ নিয়েই থাকতে হয় তাকে। তার নিজের যে কি মনের অবস্থা তা ভাববার ফুরসৎ পায় না সে। কখন কখন সুকুরমণির কথা মনে পড়ে, তার ভাঙাচুরো খেলার জিনিস-পত্তরগুলোর দিকে নজর পড়ে, কাঠের রংচটা নাকভাঙা পুতুলটা কাঁদছে, হাঁড়িকুড়ি ভাঙা খাপরাগুলো ধুলোয় ধুলোয় ভরতি। ভাদরের নদীর মত ছুটে আসতো অবাধ জলের স্রোত। হাওয়া বইতে শুরু হতো। জলগুলো আরো উদ্দামে মেতে উঠতো—হু হু, সাঁই সাঁই করে ধেয়ে আসতো। পরক্ষণেই রুকমিনের দিকে দৃষ্টি পড়ে সমস্ত জল বাধা পেয়ে কূলে এসে বাড়ি খেয়ে থমকে

দাঁড়াতো তখন আর সুকুরমণির কথা মনে থাকতো না তার, রুকমিনকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। সান্ত্বনা দিত তাকে। তবু সে নির্বিকার, একটা কথা পর্যন্ত কইতো না। মনে মনে অনেক কথা ভাবতে, রুকমিনের কোলে যদি আর কেউ আসে তাহলে সুকুরমণির শূন্যস্থানটির পুরণ হয় রুকমিনও ভাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আট বছরের মধ্যে যখন সেই বাতাস, গন্ধ আসেনি তখন এখন কি আর তা সম্ভব? নিজেকে নিতান্ত অসহায় ভাবে ভাওনাথ। মনটাকে কে যেন চিবিয়ে খায়, চোখমুখ বিষণ্ণ, বিবর্ণ হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। হঠাৎ দু'একটা দৃষ্টান্ত মনে জাগে, অন্তরাত্মাটা নেচে ওঠে, চোখেমুখে তার আলো ঝলমল করে ওঠে—কেন, এতো আট বছর মাত্র, প্রেমপ্রকাশের ভাই হয় তার জন্মের চোদ্দ বছর পরে আরো ছয় ছয়টি বছর বাদে। কত দীর্ঘদিন পরে? কাঁদরার বউয়ের মেয়ে হয় এগারো বছর বাদে।

এরপর সত্যিই একটা নতুন আলো দেখতে পায় ভাওনাথ। কিন্তু রুকনিনকে এ-সমস্ত নানা ভাবে বুঝিয়েও শান্ত করতে পারে না সে।

এইভাবে ছয়মাস কেটে যায়। নতুন করে নতুন বেশে জিতিয়া পুজো আসে আবার। ভাওনাথ রুকমিনকে বললো, জিতিয়াকা দিন আলেক, কা কা চিজবিজ কিনবু?

জিতিয়ার কথা শুনে অনেকদিন বাদে একটু নড়েচড়ে বসে রুকমিন।

ভাওনাথের মনে অতীতের অনেক ছবি। সেই বাঁশবাড়ি, গভীর অরণ্য, ভুরষা নদী। কি জানি রুকমিনও ভাবছে সেইসব কথা। খানিকক্ষণ বাদে বলে ওঠে রুকমিন, কে কার লাগি জিতিয়া করবু? রুকমিনের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ তার নজর পড়ে সেই রংচটা, নাকভাঙা কাঠের পুতুলটির দিকে। কি ভেবে উঠে গিয়ে পুতুলটি নিয়ে এসে কোলে করে বসে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে কত কি ভাবছে, কখনো বিষণ্ণ হয়ে পড়ে আবার কখনও বা একটু মুচকে হাসে। মনে মনে সুকুরমণির ছবি

আঁকে ভাওনাথ। তাকে যেন দেখতে পাচ্ছে সে, হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘুর ঘুর করে কত কি বকছে নিজের মনে।

এক কাঁকে ভাওনাথের দিকে তাকায় রুকমিন। মুখে মৃদু হাসি, চোখে আশা আনন্দের উদ্দাম নৃত্য। উঠে গিয়ে সুকুরমণির ছেঁড়া কাপড়টা নিয়ে আসে সে। পুরো কাপড়খানা দিয়ে পুতুলটাকে বারেবারে পরাতে চেষ্টা করে কিন্তু তাকি হয় অত বড় একখানা কাপড় আর অত ছোট্ট একটা পুতুল ?

ভাওনাথ বলে, ছিঁড়কে লেবে।

ছিঁড়তে হাত সরে না রুকমিনের। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, বহুৎদিন নেই আলেক সখিনা, ওকার লে আব্ জুন। শেষে কি ভেবে ভাওনাথের অপেক্ষা না করে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। ভাওনাথও সঙ্গে সঙ্গে যায়। সখিনাকে নিয়ে আসে বাড়িতে, নিজে হাতে কাপড়টা পরিয়ে দেয় তাকে। কোলে করে আদর করতে থাকে। সখিনার চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। সখিনার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় রুকমিন, ঘর তন্নতন্ন করে কি যেন খোঁজে। একটা বাটিতে কতকগুলো চানা ভাজা। সেগুলো ভেজে রেখেছিল ভাওনাথ দুপুরবেলায়—মেলাতে খাওয়ার জন্যে। বাটিসমেত সেই চানাগুলো এনে সখিনাকে বলে—লে, খা আব্।

সখিনা ইতস্তত: করে, একবার রুকমিনের দিকে আবার ভাওনাথের পানে চায়।

রুকমিন আবার বলে, লে, খায় লে মাইয়া।

এমনি করে চার পাঁচমাস বেশ ভালভাবে কাটে সখিনাকে নিয়ে। এরমধ্যে রুকমিনও সেরে উঠেছে অনেকটা, কাজেকর্মে মন দিয়েছে। হঠাৎ এক অঘটন ঘটে একদিন। সখিনা আর আসে না। আনতে গেলে ড্যাবড্যাব চোখে চেয়ে থাকে, বাপমার দিকে মিনতিমাখা দৃষ্টি মেলে ধরে বার বার। সেদিন তার কারণ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। রুকমিন ও বিলাসী ফিরছে কাজ থেকে। পথের মধ্যে রুকমিনকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে সখিনা।

রুকমিন জিগ্যেস করে, কা ভেলেক মাইয়া ? মাই মারলেক ?

সে তার আঁচল দিয়ে জলেভেজা চোখমুখ মুছতে থাকে। সখিনা কাঁদতে কাঁদতে বলে, মোকার দিল যাওথে তোকার পাছ যানে লাগি যাই না দেবে। বলোথে ওকারঠান্ নেই যাবে, ওকার নজরমে বিষ আছে।

রুকমিনের মধ্যে অন্য এক বোধ কাজ করতে থাকে। সখিনাকে ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ায় সে। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি চলে যায় সখিনা। তার পথের দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে রুকমিন। শেষে সে চোখের আড়াল হলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বিলাসী বললো, কা করবে মাইয়া, দোসরাকো ছোওয়া কা দেবে তোকের?

সেদিন বাড়ি ফিরে কেমন যেন অবসন্ন মর্মাহত হয়ে বসে পড়ে রুকমিন। ভাওনাথ জিগ্যেস করায় সব কথা খুলে বলে তাকে। প্রবোধ দেয় ভাওনাথ, ওলোককা ছোওয়া কা দেবে। মোকের ছোওয়া হোবে, রাখবু। প্রেমপ্রকাশের ভাই আর কাঁদরার বউয়ের মেয়ের জন্ম কথার পুনরোক্তি করে। রুকমিনের চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে জলে। খানিকক্ষণ ভাওনাথের দিকে চেয়ে থেকে তার বুকে মুখ লুকোয়।

ধীরে ধীরে একমাসের মধ্যে বেশ শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে রুকমিন। সে যে মনটাকে নিজের বশে আনতে পেরেছে তা অনুভব করতে পারে ভাওনাথ। আবার নতুন উদ্যোমে ঘর বাঁধতে সুরু করেছে। বলাবলি করে, হাঁস মুরগী পায়রা কিনবে, একটা ছাগলও কিনবে। দুধ দেবে সেটা। ছাগলের দুধ খুব পুষ্টিকর। সুকুরমণির জন্ম হওয়ার পর কাপড় নিয়ে বড় খ্যাচম্যাচ করেছিল দুখনি ধাই এবারে ভাল একখানা কাপড় দিতে হবে তাকে।

একদিন সেই পুতুলটার ধুলোবালি ঝেড়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে খেলার আর আর টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলোও ঝেড়েপুছে ঠিকঠাক করে রুকমিন। কি ভেবে শেষে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়িকুড়ি, খাপরা বাইরে ফেলে দেয়। পুতুলটা হাতে নিয়ে নানাভাবে নেড়েচেড়ে দেখে।

ভাওনাথ জিগ্যেস করে, কা দেখোথিস্?

রুকমিন ভাওনাথের পানে চেয়ে মুখটা বিকৃত করে বলে—না, এটাকে রেখে কি হবে আর ? একটা বিশ্রী কুলক্ষণে পুতুল। আর একটা কিনলেই হবে নতুন ভাল দেখে। মনে করে—ওটাকে পুড়িয়ে ফেলবে কিন্তু করতে পারেনি তা শেষ পর্যন্ত। যেখানকার পুতুল সেখানেই রেখে দেয় আবার।

বিলাসীকে কিছু জানতে দিতে চায় না রুকমিন।

একদিন হাসতে হাসতে জিগ্যেস করে বিলাসী, তোকের পেটমে ছোওয়া আছে বেটী ?

রুকমিন চেপে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু পারেনি। তার চোখেমুখে খুশির আবির ছড়িয়ে পড়ে। বিলাসীকে আড়াল করে পেটটার দিকে একবার তাকায় তারপর অলক্ষ্যে ডান হাতটা বুলিয়ে নেয় তার ওপর দিয়ে।

দেখতে দেখতে কয়মাস কেটে যায়। বাসন্তী গন্ধ আসে নাকে। চারিদিক ফুলে ভরতি। লতায়পাতায় ঘাসে শিশির বিন্দুগুলো মুক্তার মত ফলে আছে। আগেই বাগান থেকে অনেক চইলি সংগ্রহ করে রেখেছে ভাওনাথ। এছাড়া আরো দু'গাড়ি এনেছে ফরেষ্ট থেকে আট আনার একটা পাট্টা করে। কিছুদিন বাদে তো আর সময় করতে পারবে না সে।

এরপর আকাশ রঙ বদলায়। নীলরঙের আকাশ আগুনে লাল হয়ে ওঠে। নেমে আসে কাল-বৈশাখী। ঝড় বইতে থাকে। বাড়ি-ঘর আসবাবপত্তর সব ধুলোবালি ছাই-এ ভরে যায়। ভাওনাথের চোখের সামনে মড় মড় শব্দ করে ভেঙে পড়ে গাছটা। একটা আর্তনাদ। তারপর সব শেষ। শূন্য ঘর, শূন্য মন। চারিদিকে ঘুরঘুটে অন্ধকার।

রুকমিন মারা যাওয়ার পর ভাওনাথের খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিকঠিকানা ছিল না কিছুদিন। জীবনে কোনদিন যা করেনি আজ তাই করছে সে। লাইনে কোথাও হাঁড়িয়ার গন্ধ পেলে ছুটে যায় সেখানে, তাদের নিকট থেকে হাঁড়িয়া চেয়ে খায়। পেটে ভাত পড়েনি অনেকদিন শুধু হাঁড়িয়া বা রকসি খেয়েই দিন কাটিয়েছে। বিলাসী অনেকবার বলেছে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্যে কিন্তু কোন ফল হয়নি তাতে। কারণ সে জানতো এতে নানা কথা উঠবে সমাজে। রাত হলে অন্ধকারে কোথায় যে গা ঢাকা দিত তা জানতে পারতো না কেউ। নির্জন ভুতুড়ে খোলা মাঠে গিয়ে রুকমিনের কবরের ওপর বসতো। কবরের হিমহাওয়া তার চোখেমুখে মনে লাগতো, কানে শুনতে পেত হি হি রিরি রব। এতে ভয় পেত না সে বরং উল্লাসে এদিক সেদিক তাকাতো। একবারটা সে দেখতে চায় রুকমিনকে, দুটো কথা বলবে। এরপর যখন বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরতো তখন রাত অনেক।

একদিন বিলাসী বলে, তোকের তো উমের জেয়াদা নেই হোলেক, ফিন সাদি কর বেটা। অনেক বন্ধুবান্ধবেরাও একথা বলেছে তাকে। নিরঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রীও। কিন্তু ভাওনাথের মন সায় দেয় না তাতে। বিয়ের কথা মনে হলেই সে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়ে। অনেক হারানো কথা মনের মধ্যে জট পাকিয়ে মড়জালে বন্দী করে তাকে।

কিছুদিন বাদে একদিন প্রেমপ্রকাশ জোরজবরদস্তি করে মাদারী-হাটের হাটে নিয়ে যায় তাকে। হাটে নানারকমের জিনিসপত্তর দেখতে দেখতে হঠাৎ ভাওনাথের নজরে পড়ে কতকগুলো রঙ বেরঙের কাঠের পুতুল আর সরু কাঁচের চুড়ি। এর কাছেই একটা কড়াই, [illegible] হাতা খুন্তির দোকান। সেখানে একটা বালতি কিনছে প্রেমপ্রকাশ। এই ফাঁকে পুতুল ও চুড়িওলার দোকানে

এগিয়ে আসে ভাওনাথ। হলুদ, নীল ও লাল রঙের একটা পুতুল হাতে নিয়ে বেশ সূক্ষ্মভাবে [illegible] করে। বেশ চড়া লাল রঙ। ছোট ছেলেমেয়ে এইরকম চড়া লাল রঙই পছন্দ করে। পুতুলটা কোলের কাছে রেখে কাঁচের রঙ পছন্দ করতে থাকে। নীলরঙের চুড়িগুলোই তার কাছে ভাল লাগে। পুতুল ও চুড়িওলাকে পুতুল আর আটটা চুড়ির দাম জিগ্যেস করে। চুড়িওলা বলে, পুতুল ছ'আনা আর আটটি চুড়ি আট আনা মোট দাম চোদ্দ আনা। পকেটে হাত ঢুকোয় ভাওনাথ। একটাকা আর একআনা আছে। রূপোর টাকাটা দোকানীর হাতে দেয়, সে তার চোদ্দ আনা কেটে রেখে একটা দু'আনি ফেরত দেয় ভাওনাথকে। এরমধ্যে একটা বালতি হাতে এসে প্রেমপ্রকাশ জিগ্যেস করে, কা লেবে ?

ভওনাথ একটু হেসে পুতুল আর চুড়ি আটটা দেখায় তাকে।

অনেকক্ষণ বিস্ময়ের চোখে ভাওনাথের দিকে চেয়ে থাকে প্রেমপ্রকাশ তারপর বললে, কে-কারকা দেবে ?

প্রেমপ্রকাশের কথায় বাস্তব জগতে ফিরে আসে ভাওনাথ। রুকমিন যে নেই সে-কথা সে ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে। নির্বাক চেয়ে থাকে মাটির দিকে।

প্রেমপ্রকাশের তাগিদে আবার হাট ঘুরতে শুরু করে ওরা। মরদ আওরাত জোড় বেঁধে হাট করছে, এটা সেটা দেখছে, হাসছে, কথা কইছে। বিমূঢ়ের মত তাদের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে, তাদের কথা শোনে। বেশ ভাল লাগে ভাওনাথের আবার পরক্ষণেই কে যেন তার হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। অনেক জানাচেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। একটা মুদিদোকানের কাছে একটা লোককে দেখতে পায় সে। পরিচিত বলে মনে হয় তার অথচ স্মরণ করতে পারছে না কোথায় দেখেছে তাকে। নিটোল বলিষ্ঠ দেহ, দাড়িগোঁফ কামানো, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। লোকটা সেখান থেকে মোড় ফিরতেই দু'জনের চোখাচোখি হয়। থমকে দাঁড়ায় লোকটা। বলে, তোর লোক ভাওনাথ আউর প্রেমপ্রকাশ আছে ?

এবাঁরে গলার স্বরে চিনতে পারে লোকটাকে। হাত দু'টো এক করে মাটিতে নুইয়ে প্রণাম করে ভাওনাথ। প্রেমপ্রকাশও।

সাধু ওদের আশীর্বাদ করে, বাগানের হালচাল জিগ্যেস করে। ভাওনাথ সর্বস্ব হারিয়েছে জেনে আপসোস করে। সাধু কোথায় থাকে সে-কথা ওদের কাছে বলেনি তখনো। বলেছিল, কোথায় আর থাকবো, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই।

এরমধ্যে প্রেমপ্রকাশ বলে ওঠে, চল্ আব্। ঘর ডের দুরমে আহে, যানেমে রাত পড় যাই। বাড়ির রাস্তা ধরে ওরা। এক ফাঁকে ভাওনাথকে ইসারা করে আসছে হাটের দিন আসতে বলে সাধু।

একেই তো রাতে ঘুম হয় না ভাওনাথের তার ওপর সাধুর সঙ্গে দেখা হয়ে অনিদ্রা আরো বেড়ে যায়। সাধুর চেহারা, তার কথা মনে জাগে বারেবারে। মাথা, শরীর সমস্ত কেমন গরম হয়ে ওঠে। তবু সাধুর বিষয় ভাবতে খুব ভাল লাগে তার। তার মধ্যে যে কি আছে খুটে খুঁটে বের করতে চেষ্টা করে তা। অনেক লোকই তো আছে, প্রতিদিন অজস্র লোকের সঙ্গে তার দেখা হয় কিন্তু এই লোকটিকে দেখলে কেন এমন হয় তার। আর কতকটা হয় নিরঞ্জনবাবুকে দেখলে। এরা যেন যাদুমন্ত্র জানে। সত্যিই সাধুকে দেখলে প্রাণে একরকম নতুন শক্তি পায় সে। সে শক্তির উৎস কোথায় টের পায় না তা তবে অনুভব করে দেহে মনে। মনটা সকল সময়েই উসখুস করে জানার জন্য কোথায় থাকে সাধু। সেখানে হয়ত একটি নাইট স্কুল বসিয়েছে আবার। অনেক পড়ুয়া জমা হয়েছে। লোকটার ক্ষমতা আছে, অসাধারণ মনের বল আছে। ওর কি নেই কেউ? আগে বাগানে থাকাকালীন অনেকবার তাকে জিগ্যেস করেছে ভাওনাথ তার কোন জবাব দেয়নি সাধু। শুধু একটা ম্লান হাসি হেসে বলেছে, সব আহে মোকের। ভোয়লোক আহে, আকাশ আহে, বাতাস আহে। এক একটা দিন যেন এক একটা অনন্ত আকাশ। কিছুতেই শেষ হতে চায় না। উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ভাওনাথ। আসছে হাটের দিনের জন্য অপেক্ষা করে।

নানা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে এক হপ্তা কেটে যায়। হাটের দিন এলো। এ কয়েকদিনে সাধুর বিষয় ভাবতে ভাবতে নিজের জীবনটাকে যেন নতুনভাবে দেখতে পায় সে। তবু উপলব্ধি করতে পারেনা তবে সে যে একটা মানুষ, তাকে যে বেঁচে থাকতে হবে সে জ্ঞান সাধুকে দেখে, তার বিষয় ভেবে ভেবে জানতে পেরেছে। আজ দু'দিন একটু একটু ঘুম হচ্ছে। কোমল কুড়ির মত নানাপ্রকার ভাবভঙ্গি নিয়ে একটা প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে সেদিন। অনেক ভাঙা হাঁড়ি খাপরা খুঁজে খুঁজে শেষে ছোট একটা মেটে ঘটের মধ্যে সোডা পায় খানিকটে। উনুন ধরিয়ে সোডাজল দিয়ে কাপড়জামা সিদ্ধ করে, কলে গিয়ে কেচে পরিষ্কার করে সেগুলো। সেই ধোওয়া কাপড় জামা পরে মাদারীহাট হাটে যায়। কাউকে বলেনি আগে, সঙ্গেও নেয়নি কাউকে, একা একাই যায় সে।

হাটে গিয়ে সাধুর সঙ্গে দেখা হয় ভাওনাথের। আগের দিন যেখানটায় তাদের পরস্পরের দেখা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়েছিল সাধু। কি জানি, তার অপেক্ষা করছিল সে। দু'জনে সারা হাটটা ঘোরে তারা। দেখতে পায় একটু দূরে একজায়গায় অনেকগুলো লোক জমা হয়েছে। এগিয়ে যায় সেদিকে। প্রথমে মনে করেছিল হয়ত রাগারাগি, ঝগড়াঝগড়ি হচ্ছে সেখানে কিন্তু তা নয়। টি একস্প্যানসন্ বোর্ড থেকে লোক এসেছে তারা চা পানের উপকারীতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছে আর দুটি লোক চা তৈরি কেমন করে করতে হয় তা সমবেত লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং তাদিগকে বিনাব্যয়ে চা খেতে দিচ্ছে। চা কেমন করে তৈরি করতে হয় সে-সব ভাওনাথদের ভালোই জানা আছে তবে মাদারীহাটের আশপাশের বস্তির লোকগুলো শিখে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনে ওরা। লোকগুলো বলে ভাল, মুখে তুবড়ি ফোটে। এরপর বড় একটা শিশু গাছের তলায় নিরিবিলি বসে অনেক সুখদুঃখের কথাবার্তা বলে।

ভাওনাথের মনে হয়, সাধু হয়ত আজকাল বিয়েথা করে সংসার

পেতেছে। দাড়িমোচ চুল তো কেটেছেই, গলাতে রুদ্রাক্ষের সেই মালাটি নেই, কপালেও সিঁদুরের কোঁটা নেই। এক ফাঁকে জিগ্যেস করে, তোর কি সাদি করলেক ?

সাধু বুঝতে পারে যে তার নতুন বেশ দেখে ভাওনাথের এই সন্দেহ হয়েছে। সে একটু চারিদিকে চেয়ে দেখে নিকটে কেউ কোথাও আছে কিনা তারপর ঠোঁটচাপা হাসি হেসে বলে, ঘর নেই বাঁধলেক মোয়। এরপর তার নতুন বেশের কারণ বিশ্লেষণ করে। দলমাননগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজাভাতখাওয়া আসে সে। সেখান থেকে গাড়িতে সোজা লালমণিরহাট। তখন রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলন চলছিল সেখানে। তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সুযোগ খোঁজে। জীবনে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করাই ছিল তার অভিপ্রায়। সুযোগ এসে যায় একদিন। দশদিন রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকদের ডেরার আনাচে কানাচে ও স্টেশনের প্লাটফর্মে ঘুরে ঘুরে তাদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা শোনে সে। এজন্য অনেক গালিগালাজও শুনতে হয়েছে তাকে। বহুবার গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা, পিঠেও দু'এক ঘা বসিয়েছে তবু ও ক্ষান্ত হয়নি। তাদের পিছু ছাড়তো না, পরক্ষণেই তাদের কাছে এসে হাজির হতো আবার। অনেক শপথ করে, মিনতি জানিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছে তথাপি তার কথা বিশ্বাস করতো না তারা বরং গালাগালি মারধরের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিত। তারা বলতো—শালা, বদমায়েস হায়। দালাল। ভেতরের খবর নিতে আসে। তাদের মগজে তখন এমন একটা ধারনা জন্মেছে যে অপরকে আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না তারা। সমস্ত নির্যাতনই নির্বাকে সহ্য করে সে। কারণ সে জানতো এবং এখনও বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা সত্তা আছে, তার বোধ ও উপলব্ধির শক্তি আছে। সেই বোধ ও উপলব্ধিই তাকে জ্ঞান এবং মানুষ চেনবার ক্ষমতা দেয়, সত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে। এরপর সত্যিই সুযোগ আসে একদিন। তবে এই সুযোগ আসে একটা মারাত্মক অপবাদ ও মারপিঠের মধ্য দিয়ে। প্রতিদিনের মত সেদিনও সে শ্রমিক

বস্তির আনাচে কানাচে পাত্তি মেয়ে শোনে মেয়েপুরুষের আলোচনা। হঠাৎ দশবারজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘেরোয়া করে তাকে। এদের মধ্যে তিনজন স্ত্রীলোকও ছিল। একজন জোয়ান বলিষ্ঠ মেয়েলোক হাতে এক আঁটি ঝাঁটা, এসেই পুরুষ লোকগুলোকে উদ্দেশ করে বলে, তোমরা কিছু করো না কেউ, মেয়েদের বেইজ্জত করতে এসেছে ও, ওর শাস্তি আমরা মেয়েরাই দেব। এই বলে একটুও দেরি না করে ধমাধম দশ এগারোটা বাড়ি মারে হাতের ঐ ঝাঁটাআঁটি দিয়ে। হাত পিঠ পায়ের অনেক জায়গায় ঝাঁটার কাঠির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। রক্তক্ষরণ হতে থাকে অল্প অল্প করে। সেই অবস্থায় পিঠমোড়া করে একজন বাবুর কাছে নিয়ে তার তাকে। তার কাছে ওর নামে মেয়েছেলে সংক্রান্ত অপবাদ দেয়। এছাড়া রেল কোম্পানীর দালাল উপাখ্যানও দেয় তারা। বাবুটির কি জানি করুণা হয় তার ঐরকম রক্তাক্ত দেহ দেখতে পেয়ে। তিনি মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে বলেন, তোমরা মারলে কেন ওকে? ধরে আনলেই পারতে?

সাধু নীরব ছিল এতক্ষণ। বাবুটি জিগ্যেস করেন, ওলোক যো বোলতা হায়, ওসব বাদ সাচ্চা হায়?

এবারে কথা বলে সাধু। সে বলে, শ্রমিকদের ওপর যে-সব অত্যাচার, অবিচার করেন মালিকরা তা সহ্য করতে পারেনা সে। তার একার শক্তি তাঁদের শক্তির তুলনায় নগণ্য তাই একটা দল চায় সে যেখানে কাজ করবে, জীবনপাত করবে তার মাবাপ ভাই-বোনদের জন্য।

বাবুটির নাম সুরথবাবু। ওরা বলতো ছোরোদবাবু।

বিচক্ষণ, জ্ঞানী লোক এই সুরথবাবু। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, অনেক ঘাত প্রতিঘাত সঙ্ঘর্ষ সহ্য করেছেন বহু লোকের সংস্পর্শে গিয়ে। এর ফলে লোকের হাবভাব চলাফেরা, আচার দেখেশুনে লোক চেনবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছিল তাঁর। হয়ত তিনি সাধুর মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন জানতে পেরেছিলেন তার আবেদন। জিগ্যেস করেন, তোম হামারা সাত রহেগা?

সুরথবাবুর কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে সাধু বলে, জরুর রহেগা।

লোকগুলো বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে সুরথবাবুর পানে।

এরপর তাদের ঘরে ফিরে যেতে বলেন সুরথবাবু। সেই থেকে আরো সাত বছর তাঁর সঙ্গে থাকে সে। অনেক শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, অনেক কিছু আইন কানুন, রীতি নীতি, ঘাঁটঘাট জানতে পারে তার কাছ থেকে। রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনের দরুণ হঠাৎ সুরথবাবু আর তার নামে পুলিশের পরয়না বের হয় একদিন। সুরথবাবুকে নজরবন্দী করে রাখে সরকার। তাকেও। কয়েকজন শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায় পুলিশে। এর দু'একজন ছাড়া পায় হপ্তাখানেক বাদে আর বাকি সকলকে জেলে যেতে হয়। এরমাঝে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কলেরা হয়ে মারা যান সুরথবাবু আর কাজের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ে তার ওপর। পুলিশের নজর আরো দৃঢ়তর হলো তার ওপরে, কোথাও বেরুবার, কারো সঙ্গে কথা বলবার উপায় নেই। এজন্য আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়ে আন্দোলন। সকলেই জেলের নামে ভয় পায়। শ্রমিকদের মধ্যে মাথা বলতে দু'একজন যারা ছিল তারা কোম্পানী থেকে পরবস্তি পেয়ে খুশি মনে তিল তুলসী হাতে নেয়। পুলিশ তার ওপরে নিষেদাজ্ঞা জারি করে, রংপুর জেলার মধ্যে কোথাও থাকতে পারবে না সে। নিরুপায় হয়ে দিনাজপুরে যায়। সেখানেও পুলিশের কড়া নজর। বাধ্য হয়ে একটা উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করতে থাকে। এর আগে থেকেই জোরতালে চলছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। তার ঢেউ ভারতের আকাশ বাতাস মথিত করছে, ধড়পাকড় শুরু হয়। অনেককেই কারাবরণ করতে হয় আর বিদ্রোহীদের মধ্যে কয়েকজন আণ্ডার গ্রাউণ্ড কাজ করতে থাকে। অনেক ভাবে সে, তবে কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেবে শেষ পর্যন্ত। এই আন্দোলনে যোগদান করা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয় কারণ এর অনেক আগেই সুরথবাবুর সঙ্গে থাকাকালীন এর নেতাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে এবং তাঁদের কথাবার্তা, নীতি সবই জানা আছে তার।

শেষে ভাবলো, এতে যোগদান করলে কোনই লাভ হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে জেলে পুরবে তাকে। এরপর অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করে, দাঁড়িগোঁফ চুল কামিয়ে, সিঁদুরের টিপ মুছে ফেলে, রুদ্রাক্ষের মালা ছেড়ে একজন সাধারণ শ্রমিকের বেশ ধরে চা বাগানে ফিরে আসবে আবার। এ সুযোগ পেত না সে, এটা পায় এই আন্দোলনের জন্যে। সমস্ত পুলিশ, সরকারী চাকুরেরা ঐ আন্দোলনকারীদের নিয়েই ব্যস্ত তখন। তার উপরের নজর অনেকটা শিথিল হয়েছে তাদের। এরপরে এখানে আসে সে। এই জাননগর চা বাগানে। এই বলেই বললো, চল মোকের ডেরামে যাবে আব্ ?

সাধুর সঙ্গে জাননগর কামানে যায় ভাওনাথ। সেই রাতটা সেখানেই থাকে সে। দেখতে পায় সাধুর ঘরটা তাদেরই মত একটা আঁস্তাকুড়। আস্তাবলও এরচেয়ে অনেক ভাল। তুলনা-মূলকভাবে মনে পড়ে মক্সাহেবের টমটমের ঘোড়া থাকার আস্তাবলটার কথা। সেটাও তাদের ঘরের চেয়ে অনেক উন্নত, হাওয়াবাতাস আছে। যতক্ষণ খুশি শান্ত মনে বসে মনের সঙ্গে কথা বলা যায়। ঘরের চারিপাশ তকতকে, একটু আবর্জনা নেই কোথাও, ভ্যাপসা গন্ধ নেই ; তাজা দূর্বাঘাস আর ভিজে ছোলার গন্ধে ভরপুর। রাত হলেও আলোর অভাব নেই, সাহেবের বাংলোর নীল সবুজ আলোর রোশনি আসে। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরামে ঘাস ছোলা খায়। মনের সুস্থির ভাব তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে, ভুলে যায় চাবুকখাওয়ার কথা। পেটে খেলে পিঠে সয়। মোটর আনার পর ঘোড়াটা বিক্রী করে দেন বড়সাহেব। সেই আস্তাবলটাতেই তাঁর বেয়ারা থাকে এখন।

সাধুর ঘরের ভেতরটা কেমন এলোমেলো, ঝুলকালি, ধুলোবালিতে ভরতি। ঠিক ভাওনাথেরই ঘরের মত। ঘরটির মধ্যে এক কোনে এনেকগুলো ছাপা কাগজপত্তর স্তূপ দেওয়া রয়েছে। নানা ভাষার নানা রকম কাগজপত্তর। কোনটা হিন্দি, কোনটা বাংলা আবার কোনটা ইংরাজী। হিন্দি একটা কাগজের দিকে লক্ষ্য পড়ে ভাওনাথের। তাতে বড় হরফে ছাপা আছে 'বিশ্বামিত্র'। কাগজটা

হাতে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে ভাওনাথ। নানা দেশের নানা খবর। খুব ভাল লাগে ভাওনাথের। অসহযোগী, সত্যাগ্রহীদের সংবাদ। অনশনে মরছে কতোজন। নিজের জন্ত নয়, দেশের ও দশের জন্ত। কী অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ। এই স্বার্থের জন্ত কত জন মাথা কোটে, লোককে ফাঁকি দেয়, মারামারি কাটাকাটি করে এমন কি খুন করে আর এরা স্বার্থত্যাগ করে, জীবন বিসর্জন দেয় অপরের জন্ত। মনের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, কোনটা ঠিক। মনে মনে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, চোখের সামনে জল জল করে ভেসে ওঠে অগুণতি লোক, ছেলে মেয়ে পুরুষ, এই মাটি, গাছপালা, নদীনালা। কতজন মরছে, ঠিক সেই সময়েই কতজন জন্ম নিচ্ছে আবার। একদিকে হাসি, অন্ত দিকে কান্না। এই হাসিকান্নার ভেতর দিয়েই সকলকে চলতে হচ্ছে জন্মের পর জন্ম নিয়ে নিয়ে। যারা মরছে তারাই ফিরে আসছে আবার। যে হাসিকান্না মানুষের যন্ত্রে নির্ধারিত হয় সেটাকে তো মানুষে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নিশ্চয়। একদিনে না হয় দু'দিনে, দু'দিনে না হয় দশদিনে অবশ্যই হবে। ভাওনাথের সমস্ত শরীরটা স্ফীত হয়ে ওঠে, প্রতি লোমকূপের রোমগুলো খাঁড়া হয়।

ভাওনাথের চটকা ভাঙে সাধুর কথায়। সাধু বললো, কালে ভাবোথিস্? এছাই দুনিয়াকো হালৎ। আব্ আহে, থোড়া খাদমে নখে।

ভাওনাথ মনে করে, সাধু হয়ত ভেবেছে যে সে তার নিঃস্ব নিসঙ্গ জীবনের কথাই ভাবছে। ভাওনাথ জানতো কি সে ভাবছে, তবু গুছিয়ে বলতে পারেনা সে। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে পাক খেয়ে ভাবের অভিব্যক্তি তালগোল পাকিয়ে যায় তার।

সাধু বলে, লে ভানিক চাপানি পিয়লেবে আব্। হাট থেকে অনেকগুলো চিনেবাদাম কিনে এনেছিল সাধু। চা আর সেগুলো চর্বন করে ওরা। চায়ের প্রতি চুমুকে অনেক ভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তলিয়ে যায় উভয়ে। একটা নিঝুম রাতের নিস্তব্ধ মুহূর্ত। সাধুই নিস্তব্ধতা ভাঙে, বলে, তোয় ত বলেক মুই সাদি করলেক। হো হো করে হেসে ওঠে সাধু।

ভাওনাথও অপ্রতিভ হয়ে নির্বাক ছায়াচিত্রের মত একটু হাসে। লজ্জা অনুভব করে মনে মনে। সাধুর দিকে চেয়ে দেখতে পায়, তার চেহারার একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। কি যেন ভাবছে সে। চোখ দুটো ছল ছল করছে, মুখ বিবর্ণ। এক ঝাঁক এলোপাথাড়ি বাতাস যেন তাকে মুষড়ে মুচড়ে একটা অকর্মণ্য, নিষ্ক্রীয় জড়পদার্থ করে ফেলেছে। ভাওনাথ ভাষা খুঁজে পায়না। অত বিদ্যাবুদ্ধি নেই তার। অনুভব করতে পারে যে একটা আকস্মিক ঝড়ে তার সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে কিন্তু কি সেই ঝড় বারে বারে সেই প্রশ্ন জাগে মনে। প্রশ্ন অনেক, জবাব শুধু একটা। এত দুঃখ কষ্ট ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছে তবু কিছু করতে পারছেনা এই অভাগা শ্রমিকদের জন্য যে কারণে ঘর বাঁধেনি সে, লুকিয়ে বেড়াচ্ছে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে।

ভাওনাথের মনে হয়, জিগ্যেস করে তাকে, কি করে এখানে? ঘরের এককোণে একটা ফাড়ুয়া আর বাইরে ছোট উঠোনটার ওপরে একটা টুকরি দেখতে পায় সে। বিস্ময় জাগে মনে, এগুলো কেন? ফাড়ুয়া টুকরি দিয়ে কি করে সাধু? ভাওনাথ ধারনা করতে পারে যে বাগানে কুলির কাজ করে সে।

কিছুক্ষণ বাদে ঝড় থেমে যায়। থমথমে আকাশ হেসে ওঠে আবার। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত ঘন হয়ে আসছে অল্প অল্প করে। সাধু লণ্ঠনটা জ্বালে। সেই আলোতে ভাওনাথ দেখতে পায় আবার আগের মত স্বাভাবিক, সতেজ ও সহাস্য হয়ে উঠেছে সাধু। মনে সাহস পায় ভাওনাথ, জিগ্যেস করে, ফাড়ুয়া টুকরি কে কার আছে?

সাধু বলে, মোকের। কুলির কাজ করি বাগানে।

ভাওনাথ নির্বাক দুটো অবাক চোখ মেলে সাধুর দিকে চেয়ে থাকে।

ভাওনাথের মনের ভাব বুঝতে পারে সাধু। বলে, মোকের বাদ বিছাস্ নেই করোথিস? এরপর নিজে থেকেই বলে চলে তার পুর্ব ইতিহাস। সেও এসেছিল আসামে গুলমারি চা বাগানে ভাওনাথেরই মত অল্প বয়সে তার বাপমায়ের সঙ্গে। অল্প অল্প

কুলির মত সেও কাজ করতো বাগানে, দিনে সঙ্গী সাথীর সঙ্গে সুস্থমনে কাটিয়ে দিত, রাতে হাঁড়িয়া খেত কোনদিন নিজের ঘরে আবার কোনদিন বন্ধুবান্ধবের ঘরে। সে যে কি, জীবনটাই বা কি, এ বোধ তার ছিল না তখন। সে জানতো সকলের জীবনই তার মত। বাগানের সিটির সুরে সুরে বাঁধা। সিটি বা ঘণ্টার শব্দই তাদের ওঠানামা করায়। নতুন কোন ভাবের বিকাশ নেই মনে, চিন্তা নেই, আশাও নেই।

অপরিণত বয়সেই কুলি ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়, নানারকম খিস্তি করতে শেখে। সামাজিক আবহাওয়া তো আছেই তাছাড়া পারিবারিক আবহাওয়াই এর জন্য বেশি দায়ী। সাধুও নষ্ট হয় অল্প বয়সে আর আর সকলের মত, মাবাপের খিস্তি শুনে আর তাদের নির্লজ্জ কীর্তিকলাপ দেখে। শরত আসতে না আসতেই জীবনে বসন্ত দেখা যায়। শরতেই বসন্তের ফুল ফুটে ওঠে। একই ঘরে থেকে সে দেখতে পায় তার মাবাপে অনেকরকম খিস্তি করে করে গোপনীয় কাজ সমাধা করে। রাতের অন্ধকার ঘরেও তার চোখ দুটো সাপের মণির মত জ্বলতো। সে চেয়ে চেয়ে দেখতো সব, অতৃপ্তি হতো না কখনও। মনে নতুন এক অনুভূতি ও উত্তেজনার সাড়া পেত। এর ফলে একদিন যে বাঁশবাড়ির মধ্যেই তার গোপন দুষ্ট ইচ্ছা পুর্ণ করে। গতিয়ারীকে সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। গতিয়ারী তখন সতরো বছরের আর তার চোদ্দ বছর। সমাজে একটা হুলুস্থূল বেঁধে যায়। গতিয়ারী লোহারের মেয়ে আর সে চিক্‌বরাইক। লোহারের চেয়েতে চিকবরাইক জাতিতে বড়। অন্য জাতের ছোট ঘরের মেয়ে আনার জন্য জাত যায় তার। যে জন্য পঞ্চায়তের বিচারে তাকে জাতভাইদের হাঁড়িয়া গোস্‌ খাইয়ে জাতে উঠতে হয় আবার। এছাড়া গতিয়ারীর বাবাকে দিতে হয় নগদ অনেকগুলো টাকা। একটা চোদ্দ বছর বালকের তাকদ আর কতদিন থাকে? কিন্তু ছয় মাস পার না হতেই দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলে সাধু। গতিয়ারী যৌবন পিপাসায় উন্মত্ত তখন ফলে একদিন একটা জোয়ান মরদ নিয়ে ভেগে যায় সে। এতে মনে খুব দাগা পায় সে কিন্তু তবুও কেমন যেন স্বস্তি বোধও করে অনেকটা।

প্রতিদিন রাতের সেই খিস্তি, খিঁচুনি কামড়া কামড়ির যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে। সতরোতে পা দিতে না দিতেই শুরু হয় আবার। মেয়েগুলো বাঁশাবাড়ি চা বাগানের মধ্যে গিয়ে পায়খানা করে, মরদগুলোও ঐ একই কাজে যায় সেখানে। মেয়ে পুরুষে সাক্ষাৎ হয়। মেয়েগুলো মুখনিচু করে কাজ সারে আর মরদগুলো তাকিয়ে থাকে তাদের নগ্ন নিতম্বের দিকে। উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে মরদগুলো। এই হাওয়ায় মেয়েদেরও মন স্পর্শ করে। অনেকদিন অনেকবার সাধুও দেখেছে মেয়েগুলোকে সেই অবস্থায়, উত্তেজনাও জেগেছে প্রচুর আগের কথা স্মরণ করে প্রাণপণে দমন করে নিজেকে। না, আর নয়, ওপথে আর নয়। বড় জ্বালা, বড় গ্লানি ওপথে। কিন্তু সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেল একদিন। একটা ষোল বছরের মেয়ের সঙ্গে আবার ঘর বাঁধল সে। তাকে নিয়েই সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল ছয় বছর। এরমধ্যে একটা ছেলেও হয় ওদের। পাঁচ বছর বয়স হতেই মারা যায় সেই ছেলেটি। তার মাও ছেলের পিছু নেয় তিনমাস বাদে।

সাধুর চোখ দিয়ে কোঁটা কোঁটা জল পড়ছে। তবু তার চোখের সামনে অনেক ছবি। খুঁটে খুঁটে দেখছে সেগুলো। ভাওনাথ বুঝতে পারে সাধুর বুকটা কে যেন যাঁতায় পিষে গুড়ো গুড়ো করে দিচ্ছে। তার মুখের বিকৃত ভাব একটা মৃত্যুযন্ত্রণার ইংগিত করছে। ভাওনাথের চোখ দুটোও জলে ভরে ওঠে, বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে।

একফাঁকে চোখ দুটো মুছে নেয় সাধু। দেহে ও মনে নতুন শক্তি সঞ্চার হয়েছে আবার। সে বললো, এরপর এক বছর কেটে যায় তার মধ্যে অনেক মেয়ে তার সঙ্গ লাভ করার জন্য নানা ফাঁদ পাতে, এমন কি অনেক অপবাদও রটায় তার নামে। একটি মেয়ে তো সারা বাগানে রটিয়ে দেয় যে তার পেট ভারি করে দিয়েছে সাধু। প্রচুর মদ খাইয়ে কাজ হাসিল করতে অনেক চেষ্টা করেছিল মেয়েটি কিন্তু পারেনি। পঞ্চায়েত বসে। এতে সাধু প্রমাণ করে যে মেয়েটি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার পেট ভারি হয়নি এবং তার সঙ্গ ভোগও করেনি সে। এই প্রমাণ করতে

দশ টাকা খরচ হয় সাধুর। পঞ্চায়েত একজন কুলিকামিন ধাইকে দিয়ে পরীক্ষা করায় মেয়েটিকে। সেই ধাইকে দিতে হয় দশ টাকা।

এই ঘটনার পর দশ মাসের মধ্যে তার বাপমা মারা যায়। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও অমানুষিক কায়িক পরিশ্রমে বাপের যক্ষা হয় তাতেই তার শেষ। এরপর মা মরে নিউমনিয়া হয়ে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে।

বাপ মা মরার পর চার মাস যে কি অবস্থায় কাটিয়েছে সে তা মনে নেই তার। মাঝে মাঝে দেহের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মত জমাট বাঁধতো আবার মাঝে মাঝে সেই রক্ত গরম হয়ে টগবগ করে ফুটতে থাকতো। মনটা হিংস্র পশুর মত গর্জন করে উঠতো। এরপর হঠাৎ একদিন জীবনটার একটা নতুন রূপ দেখতে পায় সে। অনুভব করে, জীবনটা শুধু সিটির সুরে বাঁধা নয়, এ একটা বিশাল বিস্তৃত অসীম আকাশ। এখানে সব আছে। এই আকাশে এসে মিলেছে অনেক ছোট ছোট আকাশ। এই অনুভূতির পরেই শুরু হয় তার সত্যিকার জীবন।

সাধু হেসে বলে, কা হারালেক মুই? কি হারিয়েছি? কতটুকু হারিয়েছি। যা হারিয়েছি সে তুলনায় অনেক অনেক বেশি পেয়েছি

পরদিন সকালে একটা ভাবাবিষ্ট মন নিয়ে বাগানে ফেরে ভাওনাথ। মন কিছুতেই কাজে যেতে চাইছেনা। কিন্তু উপায় নেই। কাজে না গেলে একটুক্ষণের মধ্যেই হাবিলদার তার তেল-পাকানো বাঁশের বড় লাঠিটা হাতে এসে হাজির হবে। বড় সাহেবের কড়া হুকুম যত রাতই হোক ফরেষ্টের চইলি তোলাই শেষ করতে হবে আজ নতুবা সমস্ত চইলি জ্বালিয়ে দেবে ফরেষ্টের লোকগুলো কারণ ঐ জায়গায় নতুন করে গাছ রোপাই করবে আবার। রাত আটটা পর্যন্ত চলে এই চইলি তোলাই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাধুর কথাগুলো ভাওনাথের মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। নিজের জীবনের ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু সেই ফুরসৎ কোথায় তার? কামদারী চাপরাশীর হুমকি শুনতে পায় কানে, লে জলদি করবে, ছিটো করনে হোস্।

জ্ঞাননগর থেকে আসার সময় জোর করে তার হাতের মধ্যে কয়টা টাকা গুঁজে দেয় সাধু। বাগানে গিয়েই তো কাজে যেতে হবে, রাতে তার কাছে ছিল তাই পান্তা ভাত কি অন্ত কোন খাবার নেই যা খেয়ে কাজে যাবে সে এই কথা ভেবেই সাধু টাকা ক'টা দেয় তাকে। বলে, পুরি মিঠাই কিনকে খায় লেবে। এরপর রাতে কাজ থেকে ঘরে ফিরে চিন্তা ও কর্মক্লান্ত মন ও দেহ আর রান্নাবান্না করতে সাড়া দেয় না। দোকান থেকে ক'পয়সার মুড়ি আর ছোলাভাজা কিনে এনে খেয়ে শুয়ে পড়ে সেই দু'দিন আগের বাসি বোরাপাতা বিছানার ওপর। কিছুতেই ঘুম আসে না ভাওনাথের। বদ্ধঘরের অসহ্য গুমোটে দম আটকে আসে। বাঁশেরবাতা আর খড়কুটোর তৈরি দরজাটা একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে উঠোনে এসে বসে। একটু হাওয়া লাগে গায়ে। মন মেজাজ কতকটা ঠাণ্ডা হয়। নিজের জীবনের সঙ্গে সাধুর জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখে আবার। হুবহু এক। এতদিনে সে বুঝতে পারে, এই শূন্যতা ও নিঃস্বতার মধ্যে কোন জীবন নেই, জীবনে উপলব্ধি ও অনুভূতির প্রয়োজন। এই উপলব্ধি আছে জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে। উপরে আকাশের দিকে তাকায় ভাওনাথ। অনন্ত আকাশ। থমথম করছে, আলো নেই, বাতাস নেই। দেখতে দেখতে বাতাস বয় মৃদু মন্দ ছন্দে। আকাশ দুলে ওঠে। এরপর ঝড় আসে। মেঘ হারিয়ে যায়। সমস্ত আকাশটা পরিস্ফুট হয়ে ভেসে ওঠে মুহূর্তের মধ্যে। কী এক নতুন অনুভূতি? ভেসে ওঠে চাঁদ, অসংখ্য তারা। আলোয় আলোয় ভরে যায় আকাশটা। এই পৃথিবীটাও। আকাশ ও পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে, লাল নীল সাদা কালো রঙের সমাবেশ সেখানে। রঙগুলোর কী অপূর্ব মিশ্রণ, মিল। সাধুর কথাগুলো মনে জাগে। তখন ততটা উপলব্ধি করতে পারেনি সে। এখন বুঝতে পারে তার কথা, বুঝতে পারে—মানুষের জীবনও এক একটা অনন্ত আকাশ। এখানেও মেঘ আর রঙের খেলা হয়। মেঘ জীবনটাকে ঢেকে রাখে। তাই জীবনে ঝড় আনতে হবে, মেঘ সরিয়ে দিয়ে আলো জ্বালতে হবে। তবেই

তো জীবনের রঙ ফুটে উঠবে। মনে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে আদর্শবাদীতা। ফুঁসে ওঠে অসন্তোষের সাগর। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে—কেন, কি জন্য এই মুষ্টিমেয় লোকগুলো জুতো দিয়ে পিষে ফেলবে এই দরিদ্র শ্রমিকগুলোকে? এরা কি ধনী হওয়ার তকমা নিয়ে জন্ম নেয়নি? সে জানে—মানুষ, মানুষ; সকলেই সমান আর একই অধিকার নিয়ে জন্মেছে এই পৃথিবীতে।

আজ দার্শনিকের মন দিয়ে দেখতে পায় সে—খালি হাতে আসতে হয়েছিল এই মাটিতে, পৃথিবীতে আবার শূন্য হাতেই যেতে হবে তাকে। একটা ছাতুকুড়োর দানাও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না সে। তবু সে বুঝতে পারে, সে যা রেখে যাবে তা অবিনশ্বর। আজ তার মধ্যে দেখতে পায় সে অগুণতি লোক, ছেলেমেয়ে, বুড়োগুড়ো, অনেক বাপমা, ভাইবোন। শুনতে পায় তাদের কথাবার্তা। সেখানে সে দেখতে পায় তার বাপমা, রুকমিন ও সুকুরমণিকে। তারা হাসছে।

ঐ যে নীল শান্ত সমুদ্র, ওখানে অথৈ জল। এরমধ্যে ঝিনুক শামুক, মণিমানিক্য সেখানেও কল্লোল শোনা যাচ্ছে। ফেনায়িত জলের সঙ্গে দল বেঁধে আসছে তারা। একটা নতুন রূপ ধারণ করেছে সমুদ্র। জীবনটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে আজ। তার মধ্যে অনেক ছোট ছোট জীবনের বিকাশ। এই তো জীবন, একের মধ্যে দশের প্রকাশ।

আজ দৃঢ় সঙ্কল্প সে। জীবনে ঝড় চায়, তুফান চায়। ঝড়, ঝড় তুফান, তুফান। আসুক ঝড়, আসুক তুফান।